হরিভক্তি

অর্থাৎ

বক্তৃতার উপযোগিনী হরিভক্তি-সঞ্চারিণী
বিবিধ প্রবন্ধাবলী।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী
বা গুরুদাস লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"
শ্রীরাধাশ্যাম দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২২ সাল।

সূচীপত্র।

পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

হরিভক্তি পূর্ব্বে "বাজে-শিবপুর সংকীর্ত্তনসমিতি" হইতে মাসিক পত্রিকাকারে প্রকাশিত হইত। পরে উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু হইলে সমিতিটিও উঠিয়া যায় এবং নানাকারণে পত্রিকার প্রচারও বন্ধ হয়। যাঁহারা ইহার গ্রাহক ছিলেন, তাঁহারা তাহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। আজি পর্য্যন্ত অনেকেই ইহার গ্রাহক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, এবং তদ্বিষয়ে হতাশ হইয়া শেষে পূর্ব্বপ্রকাশিত খণ্ডগুলি পাইবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত হইতেছেন। সেইজন্য ইহা পুনর্ম্মুদ্রিত হইল।

এবার ইহাতে কোনও প্রবন্ধেরই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই; তবে যে সকল প্রবন্ধ তৎকালে সাময়িক ঘটনাবিশেষের উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল, এবং যেগুলি অসম্পূর্ণ ছিল, সেইগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং দুইটি গীত ও একটি প্রবন্ধ অন্যের লিখিত ছিল বলিয়া এবারে সে তিনটিও দেওয়া হইল না।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

হরিভক্তি সম্বন্ধে সাধারণকে উপদেশ দিবার ইচ্ছায় আমরা হরিভক্তি-প্রচারে প্রবৃত্ত হই নাই। কারণ, অস্মাদৃশ অজ্ঞজনের তাদৃশ অভিলাষ বামনের চন্দ্র-ধারণাভিলাষের ন্যায় উপহাসাস্পদ সন্দেহ নাই। তবে ঘোর সংসারী আমরা সাংসারিক কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিয়াও যাহাতে ক্ষণকালের জন্য হরিকথার আলোচনা করিতে পারি, মাসের মধ্যে মুহূর্ত্তকালও যাহাতে হরিকথায় অতিবাহিত করিতে সমর্থ হই, সেই অভি-

প্রায়েই এই পত্রিকা-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যেহেতু ভগবান্ শুকদেব বলিয়া গিয়াছেন—

সংসারসিন্ধু-মতিদুস্তর-মুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথা-রস-নিষেবণ-মন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধ-দুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥

যে ব্যক্তি বিবিধ-দুঃখদাবানলে পীড়িত হইয়া অতি দুস্তর এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলা-কথামৃত-পান ভিন্ন আর অন্য তরণী নাই।

কিন্তু ইহাতে সেই হরিকথা যে সবিস্তর বর্ণিত হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করাও অনুচিত। যেহেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মাই বলিয়াছিলেন—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূ-পাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥

হে ভগবন্, তুমি সকল গুণের অধিষ্ঠাতা হইয়াও এই জগতের হিত-চিকীর্ষায় অবতীর্ণ হইয়া যে সকল গুণ আবিষ্কার করিয়াছ, তৎসমুদায় কে পরিমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? কালক্রমে যদি এমন কেহ সুনিপুণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, যে পৃথিবীর ধূলি, আকাশের হিমকণা ও নক্ষত্রমণ্ডল গণনা করিতে সমর্থ হয়, সেও তোমার গুণ গণনা করিতে পারিবে না।

যাঁহার রূপ অনন্ত, নাম অনন্ত, গুণ অনন্ত, সকলই অনন্ত, সেই অনন্তের অনন্তলীলা বর্ণন করিতে যখন অনন্তেরও শক্তি নাই, তখন অস্মাদৃশ

কীটাণুকীটের কি ক্ষমতা যে, তাহার পরার্দ্ধভাগের অর্দ্ধভাগও বর্ণন করিতে সমর্থ হইব? তথাপি আমাদের এ ধৃষ্টতা সাধারণের নিকট মার্জ্জনীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে। যেহেতু সুত গোস্বামী বলিয়াছিলেন—

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-
স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥

পক্ষীরা যেমন আপন আপন গতিশক্তি অনুসারে আকাশে উড্ডীন হয়, সেইরূপ পণ্ডিতেরা স্বস্ব বুদ্ধি-শক্তি অনুসারে ভগবত্তত্ত্ববর্ণনে প্রবৃত্ত হন।

ভাস-প্রভৃতি পক্ষিগণ অধিক উচ্চে উঠিতে পারে; কোকিলাদি পক্ষি-কুল অপেক্ষাকৃত অল্প উচ্চে উঠে; পিপীলিকাও পক্ষ লাভ করিয়া কিয়দ্দূর উত্থিত হয়। কিন্তু অনন্ত আকাশের সীমায় পৌঁছিতে কাহারও শক্তি নাই। তথাপি সকলকেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে উড্ডীন হইতে ভগবান্ অধিকার দিয়াছেন। সেইরূপ যে হরিলীলারূপ আকাশে বেদব্যাসাদি ভাস-পক্ষিগণ, জয়দেবাদি কোকিলকুল উড্ডীন হইয়াছিলেন তাহাতে অস্মাদৃশ সঞ্জাতপক্ষ পিপীলিকার উড্ডয়ন বিচিত্র নহে।

আর এক কথা—হরিকথামৃত যখন স্বতই মধুর, এবং "স্বাদুস্বাদু পদে পদে", তখন ভক্তগণ লেখকের পাণ্ডিত্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, লেখার বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, ভ্রমরের ন্যায় কেবল যে সার গ্রহণই করিবেন, ইহাও আমাদের বিশ্বাস আছে।

শিবপুর,
হাওড়া।

শ্রীশ্যামাচরণশর্ম্মা।

কতিপয় প্রশংসাপত্র।

কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক অগাধ-পাণ্ডিত্যসম্পন্ন
বিবিধগ্রন্থপ্রণেতা খ্যাতনামা ঋষিকল্প প্রাচীন পণ্ডিত
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—

পরম কল্যাণ ভাজন, কবিবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন,

তোমার হরিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া, চক্ষুষ্মত্তার ব্যাঘাত হেতু ছাত্রের দ্বারা পাঠ করাইয়া, একে একে সমুদায় শ্রবণ করিলাম। উহাতে হরিভক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে। যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছ, নানা-প্রকার কৌশলে তাহাতে কেবল হরিভক্তিই প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে হরির নিকট প্রার্থনা করি, হরিভক্তি চিরস্থায়িনী হইয়া হরিভক্ত ব্যক্তি-দিগের চিরকাল আনন্দ বিধান করে। ইতি—

২৪, গিরিশ বিদ্যারত্নের লেন, কলিকাতা, ৩০শে ফাল্গুন, ১৩০৬

আশীর্ব্বাদক
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস সুবিখ্যাত বাগ্মিশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতপ্রবর
শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

সম্মানার্হ মহাশয়, আপনার উপহৃত "হরিভক্তি" পাইয়াছি। 'হরি-ভক্তি' নামটি এতই মধুর যে শুনিলেই প্রাণের ভিতরে যেন কি এক ভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে। আপনার সম্পাদিত 'হরিভক্তি' পাঠ করিয়া যে বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা অন্বেষণ করিয়াও পাওয়া যায় না। মাসিক পত্রের এরূপ সুমিষ্ট নাম,—এরূপ নামের অনুরূপ বিষয়-নির্ব্বাচন-প্রণালী,—এরূপ সুন্দর সুললিত ভাব ও ভাষা,—এরূপ বিশুদ্ধ মুদ্রাঙ্কণ আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। হরিভক্তির সাধন—হরিভক্তি, এ কথা শাস্ত্রকার গণের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আপনার সম্পাদিত 'হরিভক্তি' অনুশীলন করিলে যে, সকলেই সেই সু-দুর্লভা হরিভক্তি লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জগদীশ্বরের সমীপে

প্রার্থনা—আপনার এই হরিভক্তির প্রবাহ সর্ব্বত্র প্রবাহিত হউক, এবং সেই প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করিতে থাকুন ইতি।

পুনশ্চ—সে দিন আমার পূজ্যপাদ পিতা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং পূজ্যপাদ অগ্রজ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় আপনার 'হরের্নামৈব কেবলং' এর ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিলেন যে কবিরত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রকৃতই প্রশংসার্হ; এরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নূতন। ইতি—তাং ১৮ই ফাল্গুন, চৈতন্যাব্দ ৪১৪। ভবদীয়

শ্রীঅতুলকৃষ্ণশর্ম্মণঃ।

প্রতিকার ৬ই মাঘ, ১৩০৬ সাল।

আমরা ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই তিন মাসের তিন খণ্ড "হরিভক্তি" নামক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রিকায় যেরূপ ধর্ম্মমূলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলে পাঠকের মনে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন হইবে সন্দেহ নাই। ভাদ্রের সংখ্যায় "হরের্নামৈব কেবলং" ও "ভোলানাথের ফাঁকি," আশ্বিনের সংখ্যায় "নামে মুক্তি" ও "এক রাজার গল্প" নামক প্রবন্ধসমূহ অতি উপাদেয় ও পবিত্র-ভাবোদ্দীপক। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহোদয় উক্ত পত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণ করায় তাহা স্থায়ী হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। কবিরত্ন মহাশয় শিক্ষা-জগতে বিশেষ পরিচিত। পত্রিকার মূল্য মায় ডাক মাশুল এক টাকা মাত্র।

সম্বলপুর-হিতৈষিণীর সম্পাদক।

সম্মানাস্পদ মহোদয়,****হরিভক্তি পাঠে উপকৃত হইয়াছি। "নামের গুণ" প্রবন্ধটির উৎকলানুবাদ এবার হিতৈষিণীতে দেওয়া যাইতেছে। ২২।১।১৯০০।

জ্ঞানবিকাশিনী সভা।

আপনার "হরিভক্তি"র প্রেমবাত্যায় আলোড়িত হইয়া আমাদের

নিৰ্জ্জীব সভা হরিভক্তিলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছে।*** ইতি তাং ২৭শে ফাল্গুন ১৩০৬। ৺শুক্রেশ্বর মন্দির, পানবাজার, গৌহাটী।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, ১৩০৬ সাল, ৯ই চৈত্র।

হরিভক্তি—মাসিকপত্রিকা। শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা ২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। নামেই ইহার পরিচয়। "হরিভক্তি" বাস্তবিকই হরিভক্তির উত্তেজক। আমরা ইহার কয়েক খণ্ড পড়িয়া প্রীতিলাভ করিলাম।

মেদিনীবান্ধব ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ সাল।

"হরিভক্তি" হরিভক্তদিগের আদরের জিনিষ, কেবল হরিকথায় পরিপূর্ণ সুন্দর মাসিক পত্র।

এডুকেশন গেজেট, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩০৬।

হরিভক্তির লেখা আমাদের বেশ সুমিষ্ট লাগে বলিয়া গ্রাহকবর্গকে দুই একটি প্রবন্ধের নমুনা দেখাইতেছি।***

মাঘ১৩০৭—**"রাধাকৃষ্ণ একই" প্রবন্ধটি সুলিখিত ও ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইতেছে। উহার এক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এইরূপ সুকৌশলেই কৌতূহল উদ্রেক করিয়া সুন্দর ভাবগুলি সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে পরিস্ফুট করা হইতেছে। **হরিভক্তির বহুলপ্রচার প্রার্থনীয়।

সংবাদপত্রে উদ্ধৃত প্রবন্ধাবলী।

এডুকেশন গেজেটে···রাধাকৃষ্ণ একই। গবু-বাবু-সংবাদ।
ঐ রোগেই ঘোড়া ম'রেছে। রথযাত্রা।

মেদিনীবান্ধবে··· দোনো হাত জোড়া থা।

সম্বলপুরহিতৈষিণীতে···নামের গুণ।

হরিভক্তি

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

স্তুতিঃ ।

'শ্রী'-কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণাময় কেশব ।
শ্যা-'বা'ভ পীতবাসস্তে প্রণমামি পদাম্বুজম্ ॥ ১
মা-ভ'জে' মাধবাহং তে কদাপি কুমতির্ভৃশম্ ।
চ-রণং 'শি'বদং সর্ব্ব-সুরারাধ্যং ক্ষমস্ব মাম্ ॥ ২
র-ক্ষ মাং দে'ব'দেবেশ প্রপন্নার্ত্তিহর প্রভো ।
ণ-স্বরূপ কু'পু'ত্রোঽহং ত্বং কৃপাসাগরঃ পিতা ॥ ৩
বি-ষমে বিষয়া'র'ণ্যে রোগাদিকণ্টকাকুলে ।
প্র-বিষ্টমধমং দা'সং' পাহি মাং মধুসূদন ॥ ৪
বি-শেষং তে ন জানামি 'কী'দৃশোঽসি জগৎপতে ।
র-হঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ব'র্ত্ত'সে কবয়ো বিদুঃ ॥ ৫
চি-ন্তয়াম্যহমীশ ত্বাং নন্দ'ন'ন্দনমদ্ভুতম্ ।
ত-মালশ্যামলং শান্তং পীতবা'স'সমুজ্জ্বলম্ ॥ ৬
স্তু-তং ব্রহ্মাদিভির্দে'ব-সমূহৈর'মি'তৌজসম্ ।
তি-রশ্চীনশিরঃশোভি-বর্হমাম্বর'তি'স্থিতম্ ॥ ৭
গা-শ্চারয়ন্তং বিপিনে গোপালবালসং'হি'তম্ ।
নং-নমো ব্রহ্ম গোপাল-বেশং ত্বাং কৃষ্ণসংজ্ঞি'ত'ম্ ॥ ৮

অনুবাদ।

হে কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণাসাগর।
কটিতটে তব পরিহিত পীতাম্বর॥
কৃষ্ণ-পীত-বিমিশ্রিত আভা তাই তব।
পাদপদ্মে প্রণিপাত করি হে কেশব॥ ১
অশেষ-মঙ্গলপ্রদ তোমার চরণ।
আরাধনা করে যাহা সর্ব্বদেবগণ॥
এমতি কুমতি আমি, সে চরণ তব।
কভু না ভজিনু, ক্ষমা কর হে মাধব॥ ২
হে দেবাদিদেব প্রভো, মোরে রক্ষা কর।
শরণাগতের তুমি সর্ব্বদুঃখ-হর॥
যদিও কুপুত্র আমি ওহে জ্ঞানময়।
দয়ার সাগর পিতা তুমি ত নিশ্চয়॥ ৩
ঢুকিয়াছি যে বিষম বিষয়-কাননে।
রোগ-শোক-আদি কত কণ্টক সেখানে॥
নরাধম দাস আমি, করিয়া স্মরণ।
এ বিপদে রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন॥
ওহে বিশ্বপতি, আমি জানি না তোমার।
কিরূপ আকার আর কিরূপ প্রকার॥
বিজ্ঞ জনে জানে মনে, সদা সর্ব্বভূতে।
অবস্থান করিতেছ তুমি অলক্ষিতে॥ ৫
হে ঈশ্বর, সেইরূপ করি হে চিন্তন।
নন্দসুত হ'য়ে কৈলে যে রূপ ধারণ॥

তমালসদৃশ শ্যামবর্ণ কলেবর।
আশ্চর্য্য উজ্জ্বল শান্ত, পরা পীতাম্বর ॥ ৬
স্তব করে ব্রহ্মা-আদি অমর-নিকরে।
ময়ূরের পুচ্ছ শোভে হেলা চূড়া'পরে ॥
এ হেন বিক্রম ধর নাহি তার ওর।
আপন ভাবেতে হও আপনি বিভোর ॥ ৭
বিপিনে চরাও গাভী গোপশিশুসনে।
আপনি গোপাল-বেশ ধরিয়া যতনে ॥
তুমি সে পরমব্রহ্ম কৃষ্ণনাম-ধারী।
পুনঃপুনঃ তোমারে প্রণাম করি হরি ॥ ৮

সংকীর্ত্তন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম কেবলং।
কলৌ নাস্তি কলৌ নাস্তি অন্যদপি সম্বলং ॥
সত্যযুগে ছিল ধ্যান, ত্রেতাতে যজ্ঞবিধান,
দ্বাপরে সেবানুষ্ঠান, কলৌ সংকীর্ত্তনং বলং ॥
নামে নারদাদি ঋষি পেয়েছেন তত্ত্বজ্ঞান।
ধ্রুব নিয়ে নাম, হ'ল পূর্ণকাম, গেল পুণ্যধাম দিব্যস্থান ;
(এমন নাম কি আর আছে হে)
(হরিনামের মত নাম কি আর আছে হে)
ধ্রুব নিয়ে নাম, হ'ল পূর্ণকাম, গেল পুণ্যধাম দিব্যস্থান ॥
নামেরি ফলে, প্রহ্লাদকে নিলেন কোলে, দয়াল হরি।

নামে ভক্তি, নামে মুক্তি, নামই ভবের তরি ;
(নামের গুণ আর কইব কত—নামে ভক্তি)
(নামের ফল আর ব'ল্‌ব কিবা—নামে মুক্তি)
নামে ভক্তি, নামে মুক্তি নামই ভবের তরি ॥
মিলি আজি সর্ব্বজন, কর নাম সংকীর্ত্তন,
নাহি হয় যতক্ষণ, দেহ মন দুর্ব্বলং ॥

নামের গুণ ।

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানা-দুত্তমশ্লোকনাম যৎ ।
সংকীর্ত্তিত-মঘং পুংসাং দহেদেধো যথানলঃ ॥
যথাগদং বীর্য্যতম-মুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া ।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত)

অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ নিঃশেষে দগ্ধ করে, সেইরূপ শ্রীহরির যে নাম, তাহা জ্ঞানতঃই হউক আর অজ্ঞানতঃই হউক, উচ্চারণ করিলে মানবের পাপ নিঃশেষে নষ্ট করিয়া থাকে। আবার, অতিশয় বীর্য্যবৎ ঔষধ যেমন অশ্রদ্ধায় ও অজ্ঞানে সেবন করিলেও, উহা আরোগ্যবিধানরূপ নিজগুণ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ হরিনামরূপ মহামন্ত্র অশ্রদ্ধায় ও অজ্ঞানে শ্রবণ করিলেও পাপক্ষয়রূপ নিজ গুণ প্রকাশ করিবেই করিবে। ইহা কেবল মুখের কথা নহে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ও প্রমাণসিদ্ধ বাক্য।

পদার্থমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ গুণ বা শক্তি আছে। যেমন জলের গুণ শীতল করা, অগ্নির গুণ দগ্ধ করা, বিষের গুণ প্রাণনাশ করা,

অমৃতের গুণ জীবনরক্ষা করা ইত্যাদি, সেইরূপ হরিনামের গুণ পাপক্ষয় করা। পাপহরণকারী বলিয়াই 'হরি' নাম হইয়াছে। হরি শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত অর্থ এই যে—হরতি সর্ব্বাণি অশুভানি ইতি। এ সকল গুণ প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ। জলের যে শৈত্যগুণ আছে, তাহা স্নানপানাদি দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে কি না—সন্দেহ হইলে আগুনে হাত দিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। সেইরূপ হরিনামেরও পাপক্ষয়কারিণী শক্তি জানিতে হইলে হরিনাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে হইবে। কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিয়া রাখিলে, অগ্নি যেমন সেই কাষ্ঠকে ক্রমে ক্রমে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ বদনে বা শ্রবণে অবিরত হরিনাম লাগাইয়া রাখিলে, তাহাতে দেহের সকল পাপ নষ্ট হইবেই হইবে। যে বস্তুর যে শক্তি আছে, তাহা সে প্রকাশ করিবেই করিবে; তজ্জন্য সে কাহারও জ্ঞান বা শ্রদ্ধার অপেক্ষাও করিবে না। তুমি জ্ঞানপূর্ব্বক ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলে, আগুন যেমন ঘরকে পুড়াইবে, কোনও শিশু অজ্ঞানবশতঃ ঘরে আগুন দিলেও সেইরূপ পুড়াইবে। ছেলে মানুষ, অজ্ঞানে দিয়াছে ভাবিয়া আগুন তাহাতে একটুও দয়া করিবে না।

আবার দেখ, রোগী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, সে সময় সুচিকিৎসক তাহাকে বীর্য্যবৎ ঔষধ খাওয়াইলেন। সে তখন ঔষধ খাইল কি না নিজে কিছুই জানিতে পারিল না—অজ্ঞান অবস্থাতেই ঔষধ খাইল বটে, কিন্তু ঔষধ নিজগুণ প্রকাশ করিতে ছাড়িল না—তাহার বিকারের ঘোর কাটাইয়া দিল।

আরও, তুমি যেমন জ্বরের যন্ত্রণায় বহুকাল ভুগিতেছ বলিয়া, সদ্বৈদ্যের উপদেশে, কটুতিক্ত ঔষধ শ্রদ্ধাসহকারে ভক্ষণ করিবে এবং তাহাতেই সে যন্ত্রণা হইতে মুক্তও হইবে, সেইমত একটি বালক অনিচ্ছায় অশ্রদ্ধায় সেই কটুতিক্ত ঔষধ খাইলেও তাহারও রোগশান্তি হইবে।

সেইরূপ, হরিনামের যখন স্বাভাবিক শক্তিই হইতেছে পাপক্ষয় করা,

তখন সে লোকের জ্ঞান অজ্ঞান মানিবে কেন? ভক্তি অভক্তি চাহিবে কেন? সে নিজগুণ নিজেই প্রকাশ করিবে। সজ্ঞানে হউক আর অজ্ঞানেই হউক, হরিনাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে সে তাহার পাপক্ষয় করিবেই করিবে। আমরা ভবরোগে আক্রান্ত, মোহবিকারে অভিভূত, মায়াঘোরে আচ্ছন্ন। সেই রোগের সুচিকিৎসক বেদব্যাসাদি মহর্ষিগণ আমাদিগকে বীর্য্যবৎ হরিনাম-মহৌষধ সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছেন! তাঁহাদের উপদেশে আমরা সজ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক—হেলায় হউক, শ্রদ্ধায় হউক—ভক্তিতে হউক, অভক্তিতে হউক—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক —হরিনাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, নিশ্চয়ই আমাদের ভবরোগ বিদূরিত হইবে, মোহবিকার কাটিয়া যাইবে, মায়াঘোর ঘুচিয়া যাইবে, মৃত্যুভয় অপনীত হইবে।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন—পদার্থের বিশেষ বিশেষ গুণ আছে সত্য; কিন্তু জল, আগুন, ঔষধ—এ সকল যেরূপ "পদার্থ," হরিনাম কি সেরূপ "পদার্থ"? হরিনাম ত একটা শব্দ; হরি ত কয়েকটা বর্ণমাত্র; শব্দের ও বর্ণের কি সেরূপ কোনও শক্তি আছে?

এ কথার উত্তর এই যে, হরিনাম শব্দই বটে; কিন্তু শব্দকেও পণ্ডিতেরা পদার্থমধ্যে গণ্য করিয়াছেন। নৈয়ায়িকদিগের মতে পদার্থ সাতপ্রকার—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। শব্দ ঐ গুণেরই অন্তর্গত; সুতরাং উহাও পদার্থ বা বস্তু। আবার শব্দের যে অসাধারণ শক্তি আছে, তাহাও শাস্ত্রকারগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। আমরা এখানে সে সকল শাস্ত্র-বচন উত্থাপন করিব না, লৌকিক দৃষ্টান্তেই তাহা সাধারণকে বুঝাইয়া দিব। বিশেষ বিশেষ শব্দের যে বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দেখ—কাকের 'কা কা' শব্দ শুনিলে কাণ জ্বলিয়া যায়, কোকিলের 'কুহু কুহু' শব্দে প্রাণ মাতিয়া উঠে, ঢাকের 'চড়্ চড়্' শব্দ যেন উল্কা বৃষ্টি করে, বীণার 'কুন্‌কুন্' শব্দে অমৃত বর্ষে, ভ্রমরের

'গুন্ গুন্' শব্দে বিরহীর মন উদাস হয়, মেঘের 'গুড়্ গুড়্' শব্দে হৃদয়ের উল্লাস জন্মে, বজ্রের 'কড়্ কড়্' শব্দে প্রাণ চমকিয়া উঠে। অতএব শব্দবিশেষেরও যে শক্তিবিশেষ আছে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বর্ণেরও শক্তি আছে। অ আ ক খ প্রভৃতি যে পঞ্চাশটি বর্ণ, তাহাদের প্রত্যেকেতেই এক একটি শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ হইলেও, যাঁহারা যোগাভ্যাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যথাপ্রকরণে 'য' বর্ণ জপ করিলে বায়ুর আবির্ভাব হয়, 'র' বর্ণ জপ করিলে অগ্নির আবির্ভাব হয়, 'ব' বর্ণ জপ করিলে জলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রে 'য' বর্ণকে বায়ুবীজ, 'র' বর্ণকে অগ্নিবীজ, 'ব' বর্ণকে বরুণবীজ বলা হইয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক বর্ণ স্বতন্ত্র বা মিলিত হইয়া এক একটি অসাধারণ শক্তি ধারণ করে। সেইরূপ, হরি শব্দের প্রকাশক যে চারিটি বর্ণ—হ-অ-র-ই, ইহারাও মিলিত হইয়া এই অসাধারণ শক্তি ধারণ করিয়াছে যে, যে ইহা নিরন্তর শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, তাহারই পাপ ক্ষয় করিয়া থাকে।

আবার, যে বস্তুর যে শক্তি, তাহার স্মরণেও সেই শক্তি প্রকাশ পায়। যেমন ব্যাধির শক্তি যন্ত্রণা প্রদান করা, দেহ ক্ষয় করা ইত্যাদি। এখন কেহ যদি কোনও ব্যাধির বিষয় নিরন্তর চিন্তা করে, তাহা হইলে কালক্রমে তাহাকেও সেই ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই কারণেই কোনও গ্রামে বা নগরে বিসূচিকা প্রভৃতি মারীভয় উপস্থিত হইলে সেই গ্রাম বা নগরবাসী সকলেই প্রায় ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। অতএব হেলায় শ্রদ্ধায় নিরন্তর হরি-স্মরণেও পাপক্ষয় হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥

(বিষ্ণুধর্ম্ম)

অতএব পাপক্ষয় দ্বারা যদি দেহমন পবিত্র করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে হরিনাম উচ্চারণ কর। যদি জিহ্বা অবশ হয়, হরিনাম উচ্চারণের ক্ষমতা না থাকে, তবে হরিনাম শ্রবণ কর। তাহাও যদি না পার,—শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল হইয়া থাকে, তবে হরিনাম স্মরণ কর অর্থাৎ মানসে জপ কর। তদ্ভিন্ন পাপক্ষয়ের আর অন্য উপায় নাই। তাই শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥
(ভাগবত)

অতএব হে মহারাজ, সকল স্থানে, সকল সময়ে, সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবান্ হরিকে শ্রবণ করা, কীর্ত্তন করা ও স্মরণ করা মানবগণের কর্ত্তব্য।

হরের্নামৈব কেবলম্।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

অর্থ।—কলিতে কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই; কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই; কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ওরূপ তিনবার বলিবার কারণ কি? একই কথা দুই তিনবার বলাকে পুনরুক্তি বলে; পুনরুক্তি, দোষের মধ্যে গণ্য; তবে শাস্ত্রবচনে এরূপ পুনরুক্তি কেন?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রবচনে কোনও দোষ থাকিতে পারে না। অকারণে যে পুনরুক্তি, তাহাই দোষ। এখানে ঐ কথা তিনবার বলিবার ১০টি কারণ আছে; সুতরাং এরূপ স্থলে পুনরুক্তি দোষাবহ নহে।

(১ম কারণ)—কোনও বাক্যের অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চিততা জানাইবার জন্য ত্রিসত্য করার—তিনবার বলার প্রথা আছে। কলিতে হরিনাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত—ইহাই অবধারণ করিয়া জানাইবার জন্য তিনবার বলা হইয়াছে। অবধারণার্থ এক কথা দুই তিন বার বলিলে যে দোষ হয় না, তাহার প্রমাণ—

বিবাদে বিস্ময়ে হর্ষে কোপে দৈন্যেঽবধারণে।
প্রসাদনেঽনুকম্পায়াং দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দুষ্যতি ॥

(২য়) জগতের প্রত্যেক পদার্থ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণে নির্ম্মিত; সুতরাং প্রত্যেক পদার্থে অল্পাধিক পরিমাণে ঐ ত্রিগুণ বর্ত্তমান আছে। ত্রিগুণের তারতম্য অনুসারে প্রত্যেক পদার্থই তিনপ্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; বা উত্তম, মধ্যম ও অধম। জীব যখন কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, তখন তাহাকে অবস্থা-বিশেষে ত্রিবিধ কর্ম্ম করিতে হয়। কর্ম্ম করিলে তাহার ফলও অবশ্যভোগ্য। সেই ফলে জীবকে স্বর্গনরকাদি ভোগ করিয়া এই সংসারচক্রেই চিরদিন ঘুরিতে হয়; সুতরাং তাহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। তাই শাস্ত্র তিনবার বলিতেছেন—কলিতে যে জীব সাত্ত্বিক কর্ম্মে লিপ্ত, তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই; যে জীব রাজসিক কর্ম্মে লিপ্ত, তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই; এবং যে জীব তামসিক কর্ম্মে লিপ্ত, তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই।

(৩য়) পাপ তিনপ্রকার—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। হস্তপদাদি কায় দ্বারা যে পাপ করা যায়, তাহা কায়িক পাপ; যথা প্রহারকরণ, পরস্বাপহরণ, অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যাগমন ইত্যাদি; বাক্য দ্বারা যে পাপ

করা যায়, তাহা বাচিক পাপ; যথা কটুবচন, অসদালাপ ইত্যাদি। মন দ্বারা যে পাপ করা যায়, তাহা মানসিক পাপ; যথা পরানিষ্টচিন্তা ইত্যাদি। তাই শাস্ত্র তিনবার বলিতেছেন—কলিতে যে জীব কায়িক পাপ করিয়াছে, তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই; যে জীব বাচিক পাপ করিয়াছে, তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই; এবং যে জীব মানসিক পাপ করিয়াছে, তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই।

(৪র্থ) জীবকে আবার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপও ভোগ করিতে হয়। এই দেহে আধি ব্যাধি প্রভৃতি যে সকল ক্লেশ ঘটে, সেগুলি আধ্যাত্মিক তাপ; ব্যাঘ্র সর্প দস্যু প্রভৃতি হইতে যে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহা আধিভৌতিক তাপ; এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতি জন্য ক্লেশকে আধিদৈবিক তাপ বলে। তাই শাস্ত্র তিনবার বলিতেছেন—যে জীব আধ্যাত্মিক তাপে তাপিত, তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই; যে জীব আধিভৌতিক তাপে তাপিত, তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই; এবং যে জীব আধিদৈবিক তাপে তাপিত, তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই।

(৫ম) সত্যযুগে সাধনা ছিল—ধ্যান; একাগ্রচিত্তে ভগবানের রূপ চিন্তা করিলেই জীবের নিস্তার হইত। ত্রেতাযুগের সাধনা—যজ্ঞ; বেদবিহিত যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরির আরাধনা করিলেই জীব পরিত্রাণ পাইত। দ্বাপরের সাধনা—পরিচর্য্যা (সেবা); উৎকৃষ্ট পুষ্প-নৈবেদ্যাদি উপচারে ভগবানের পূজা করিলেই জীবের উদ্ধার হইত। কিন্তু কলিযুগে উক্ত ত্রিবিধ সাধনাই অসম্ভব। কলির জীব আমরা অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত; সুতরাং আমাদের একাগ্রচিত্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যদি কোনওদিন কখনও চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতে বসি, তখন আগে স্ত্রীপুত্রাদির মুখই মনে পড়ে, চাউল ডাইল তেল লুণের ভাবনা

আসিয়া জোটে, কেহ বা কর্ম্মস্থানে যাইতে বেলা হইল মনে করিয়া প্রভুর দন্তবিকাশ-রঞ্জিত বদনভঙ্গীই ভাবিতে থাকি, কেহ হয় ত কি কৌশলে পরস্বাপহরণ করিব তাহার চিন্তাতেই নিরত হই ; ভগবানের রূপ-চিন্তা আর আমাদের হইয়া উঠে না ; সুতরাং ধ্যানযোগে আমাদের অধিকারই নাই। যজ্ঞ করাও আমাদের পক্ষে দুর্ঘট ; যেহেতু বিশুদ্ধ ঘৃত নাই, শুদ্ধাচার পুরোহিত নাই, বিশুদ্ধ মন্ত্র নাই, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ নাই, নিজেরও যম-নিয়মে সামর্থ্য নাই—সুতরাং যজ্ঞেতেও আমরা অধিকারী নহি। আর পূজাতেই বা আমাদের প্রবৃত্তি কোথায় ? সুগন্ধি পুষ্প পাইলে আগেই মনে হয় প্রেয়সীর খোঁপায় গুঁজিয়া দিই, সুমিষ্ট ফল পাইলে মনে হয় পুত্রকন্যাকে খাওয়াই, পূজার বস্ত্র কিনিতে গেলে "জেলে গামচা" খুঁজিয়া বেড়াই। সুতরাং পরিচর্য্যাও আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই শাস্ত্র তিনবার বলিতেছেন—কলিতে জীব যখন ধ্যানে অপারক, তখন তাহাদের কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই ; তাহারা যখন যজ্ঞে অশক্ত, তখন তাহাদের কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই ; এবং তাহারা যখন পরিচর্য্যাতেও পরাঙ্মুখ, তখন তাহাদের কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই।

(৬ষ্ঠ) সংসারে তিনপ্রকার লোক আছেন—মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী। যাঁহাদের চিত্ত সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, সেই মহাপুরুষগণ মুক্ত ; যাঁহারা মুক্তির জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা মুমুক্ষু ; এবং যাঁহারা সংসারে সম্পূর্ণ আসক্ত, তাঁহারা বিষয়ী। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—কলিতে যাঁহারা মুক্ত, (পাছে সংসারের আকর্ষণে আবার আকৃষ্ট হন, সেইজন্য) তাঁহাদের কেবল হরিনামই গতি, অন্যগতি নাই ; যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহাদের (অনায়াসে মুক্তি লাভের পক্ষে) কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই ; এবং যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহাদের (সকল পাপ তাপ বিমোচন ও শমনভয় নিবারণের জন্য) কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই।

(৭ম) মনুষ্য লিঙ্গভেদে ত্রিবিধ; যথা পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব। এই ত্রিবিধ মানবেরই কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই; ইহাই জানাইবার জন্য শাস্ত্র তিনবার ঐ কথা বলিয়াছেন।

(৮ম) মনুষ্য বয়সভেদেও তিনপ্রকার;—বালক,, যুবক ও বৃদ্ধ। কলিতে কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ—এই ত্রিবিধ লোকেরই কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই।

(৯ম) মনুষ্য অবস্থাভেদেও তিনপ্রকার;—ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র। কলিতে কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র—ত্রিবিধ জনেরই কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই।

(১০ম) অধিক কি, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—এই ত্রিভুবনের যাবতীয় জীবের কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই। ইহাই জানাইবার জন্য উক্ত বচনে তিনবার ঐ কথার উল্লেখ আছে।

ভোলানাথের ফাঁকি।

কোনও এক ক্ষুদ্র রাজ্যে গোপাল নামে এক ক্ষুদ্র রাজা বাস করিতেন। তাঁহার এমনই প্রতাপ ছিল যে, তাঁহার রাজ্যে সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত; আবার এমনই দয়া ছিল যে, সকলেই নানা-প্রকার উপকার পাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তিও করিত। যে নগরে তাঁহার বাস, সেই নগরের চতুর্দ্দিকে একটি প্রবল নদী পরিখারূপে প্রবাহিত ছিল। যে যে-দিক্ দিয়াই যাউক, ঐ নদী পার না হইয়া সেই নগরে যাইতে পারিত না। ঐ নদীতে পারের একখানিমাত্র নৌকা ছিল। তাহার দাঁড়ী মাঝী ছিল না; নিজে বাহিয়া পার

হইতে হইত। কিন্তু সেই পারঘাট এক জনের জমা করা ছিল। সে সর্ব্বদাই ঘাটের উপর বসিয়া থাকিত এবং যাহারা পারে যাইতে ইচ্ছা করিত, তাহাদের নিকট হইতে দুই পয়সা করিয়া মাশুল লইত। মাশুল না দিলে সে কাহাকেও পারে যাইতে দিত না। কিন্তু যে ঐ রাজার নাম করিত—সত্য করিয়াই হউক আর মিথ্যা করিয়াই হউক, তাঁহার লোক বলিয়া আপনার পরিচয় দিত, তাহার কাছে আর মাশুল চাহিত না; সে বিনা মাশুলেই পার হইয়া যাইত।

ঐ নগরে ভোলানাথ নামে এক ব্যক্তির বাস ছিল। সে বহুকাল বিদেশে গিয়াছিল। এখন নানা কষ্ট ভোগ করায় তার আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই; সে বাটী যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে। সে যখন বিদেশে গিয়াছিল, তখন খেয়া-ঘাট কাহারও জমায় ছিল না। সে যাইবার পর ঐরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। সুতরাং সে এ সকল ব্যাপার কিছুই জানিত না। এখন সে ঐ খেয়া-ঘাটে গিয়া জানিল যে, মাশুল না দিলে পার হওয়া যায় না। কিন্তু তাহার কাছে একটি পয়সাও নাই। যা কিছু টাকা কড়ি ছিল, কতক নিজে অপব্যয় করিয়াছে, অবশিষ্ট দস্যুরা কাড়িয়া লইয়াছে। এখন সে একেবারেই নিঃসম্বল; সুতরাং তাহার পার হইবার আর উপায় নাই। বড়ই ব্যাকুলচিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে, পথে কতকগুলি পথিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহারা তাহার অবস্থা বুঝিয়া বলিয়া দিল, "রাজা গোপালের নাম ক'র্‌গে যা, তা হ'লে মাশুল লাগিবে না।" সে ঐ কথা শুনিয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া আবার খেয়াঘাটে আসিল এবং রাজা গোপালের নাম করিয়া, ঘাট-মাঝীকে ফাঁকি দিয়া বিনা মাশুলে পার হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল।

অতএব নামের গুণ নাই, এ কথা কিরূপে বলিব? নামের গুণ অবশ্যই আছে। নামের গুণ না থাকিলে ভোলানাথ নিঃসম্বল হইয়া কিরূপে নদী পার হইল? সে ত বেশ বদলাইয়া, ছল করিয়া গোপালের

নাম লইয়াও, ঘাট-মাঝীকে ফাঁকি দিয়া, অনায়াসে নদী পার হইয়া গেল।

এখন তুলনা করিয়া দেখ।—আমরা যে রাজ্যে বাস করি, ইহারও একজন রাজা আছেন। কিন্তু এ রাজ্য ক্ষুদ্র নহে, রাজাও ক্ষুদ্র নহেন। এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে—চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যে, "মহতো মহীয়ান্" (সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম) এক রাজাধিরাজ আছেন। তাঁহার গুণ অনন্ত, রূপ অনন্ত, নামও অনন্ত। সেই অনন্ত নামের মধ্যে তাঁহারও একটি নাম 'গোপাল'। তিনি গো অর্থাৎ পৃথিবীকে রক্ষা করিয়া এবং গো-পাল চরাইয়া 'গোপাল' নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান নাম "হরি"। তাঁহার এমনই প্রতাপ যে, দেব অসুর যক্ষ রক্ষ নাগ কিন্নর মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি—ব্রহ্মা মহেশ্বর পর্য্যন্ত—সকলেই তাঁহাকে ভয় করে; আবার এমনই অসীম দয়া যে, আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ই তাঁহার নিকট হইতে জীবনধারণ ও সুখ-স্বচ্ছন্দতাসাধনের উপযোগি বিবিধ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ-নগর তাঁহার রাজধানী। ঐ নগরের প্রান্তে—চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া, বৃহৎ ভবনদী অবস্থান করিতেছে। ইহার কূল-কিনারা নাই বলিয়া ইহাকে ভবসাগরও বলিয়া থাকে। যে দিক্ দিয়াই যাও, এই ভবসাগর পার না হইলে সে নগরে পৌঁছিবার উপায় নাই। ইহাতেও পার হইবার একখানি মাত্র নৌকা আছে—তাহা সেই "শ্রীহরির চরণতরি"। তদ্ভিন্ন ইহা পার হইবার আর উপায় নাই। সে তরিতে দাঁড়ী নাই, মাঝী নাই;—তরি আপনিই চলে। কিন্তু সেই খেয়াঘাটের ঘাটমাঝী আছে—শমন। সে ঐ ঘাট জমা লইয়া অহোরাত্র ঘাটের উপর বসিয়া আছে। সে কাহারও উপরোধ অনুরোধ মানে না। রাজা হও, প্রজা হও, ধনী হও, দরিদ্র হও; বালক হও, বৃদ্ধ হও; স্ত্রী হও,

পুরুষ হও; ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও; বিনা মাশুলে সে কাহাকেও পারে যাইতে দেয় না। দুই পয়সা মাশুল না দিলে—দুই অক্ষর "ভক্তি" না দেখাইলে, সেই চরণতরি পাইবার উপায় নাই।

পূর্ব্বে ঐ বৈকুণ্ঠরাজ্যে আমাদেরও বাস ছিল। কারণ, আমাদের এই জীবাত্মা সেই পরমাত্মা হরিরই অংশ। বহুকাল আমরা এই কর্ম্মভূমিরূপ বিদেশে আসিয়াছি। এখানে বহুকাল কাটাইলাম—চৌরাশী লক্ষ যোনি ঘুরিলাম। এমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব-জন্ম পাইয়াও মায়ার বশেই ঘুরিতেছি; সব ভুলে "ভোলানাথ" হইয়া বসিয়াছি। এখানে শোক দুঃখ আধি ব্যাধি প্রভৃতি নানা কষ্ট ভোগ করিয়া যদি সেই ভোলানাথের মত কখনও আমাদের স্বদেশে—বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেও সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। কারণ, আমাদের আসিবার পর—অর্থাৎ জীবসৃষ্টির পর—শমনের আধিপত্য হইয়াছে; আমরা যখন আসিয়াছিলাম, তখন এরূপ ছিল না। তাই বলিতেছি, আমাদের পার হইবার উপায় নাই; আমাদের পারের সম্বল কিছুই নাই। জ্ঞান বিবেক প্রভৃতি যে সকল সম্পত্তি ছিল, তাহাদের কতক নিজেরাই নষ্ট করিয়াছি—অনিত্য বিষয়ে বিনিয়োগ করিয়া অপব্যয় করিয়াছি। কতক বা ষড়্‌রিপুরূপ দস্যুরা মিলিয়া কাড়িয়া লইয়াছে। এখন সম্পূর্ণ সম্বলহীনই হইয়াছি। কাজেই আবার ফিরিতে হইবে, আবার চৌরাশী লক্ষ যোনি ঘুরিতে হইবে।

কিন্তু নিঃসম্বল হইয়াও যদি সেই নিজস্থানে যাইবার জন্য কেহ ব্যাকুল হইয়া থাক, তবে ঐ পথিকদিগের কথা শুন;—আমাদের অবস্থা বুঝিয়া ভক্তিপথের পথিক ব্যাস-নারদাদি ঋষিগণ বলিয়া দিতেছেন— "পারের ভাবনা কি? এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের অধিপতি, সর্ব্বনিয়ন্তা, অগতির গতি সেই শ্রীহরির নাম শুনিলে শমন তোমাদিগকে আটকাইতে পারিবে না, সে নিজেই সরিয়া দাঁড়াইবে, তোমাদের

পথ ছাড়িয়া দিবে, নামের গুণেই তোমরা অনায়াসে পার হইয়া যাইবে।"

অতএব ভাই সকল! এস, আমরাও সেই ভোলানাথের মত বেশপরিবর্ত্তন করিয়া—গৈরিক বসন, নামাবলী, তুলসীমালা, গোপীচন্দন পরিয়া, শমনকে ফাঁকি দিবার জন্য, সেই হরির নাম করি; মনের কথায় না হউক, মুখের কথায়, বাহিরের বেশভূষায়, তাঁর লোক বলিয়া—তাঁর ভক্ত বলিয়া আত্মপরিচয় দিই; ছল করিয়াও, হেলায় অশ্রদ্ধায়ও, এস সকলে মিলিয়া, বদন ভরিয়া একবার "হরি-হরি-হরি" বলি।

শ্লোক।

সেবে সদৈব বিষয়ান্ পুরুষক্রমেণ,
দাসস্তবাস্মি জগতি প্রতিপাদয়ামি।
হে কৃষ্ণ বঞ্চয়িতু-মন্তক-দূতগোষ্ঠীং,
ঘট্টীং তরন্তি ন শঠা মহদাখ্যয়া কিম্॥

নিয়ত নিমগ্ন আছি বিষয়-চিন্তায়।
ক্ষণেকের তরে কভু না ভাবি তোমায়॥
তবু মুখে ক'রে থাকি এ হেন গরব।
শ্রীহরির দাস আমি—পরম বৈষ্ণব।
সে কেবল ফাঁকি দিতে যমদূতগণে।
মৃত্যুকালে আসিবে না আমার সদনে॥
মহতের নাম করি যথা শঠকুল।
খেয়া-ঘাট পার হয় না দিয়া মাশুল॥

সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য।

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরির্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(ভাগবত)

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করিলে যে ফল হইত, ত্রেতায় তদুদ্দেশে যজ্ঞ করিলে যে ফল হইত, দ্বাপরে তাঁহার পরিচর্য্যায় (সেবায়) যে ফল হইত, কলিতে তাঁহার নাম-সংকীর্ত্তনেই সেই ফল হইয়া থাকে।

মানুষের সকল কার্য্যেই কায়, মন ও বাক্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে অগ্রে মনের শক্তি, পরে কায়ের শক্তি, তৎপরে বাক্যের শক্তি বিকাশিত হইয়া থাকে। ইহা স্বভাবসিদ্ধ। কোনও কার্য্য করিতে আমাদের যখন ইচ্ছা হইল, তখনই মনের শক্তি প্রকাশ পাইল; সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সে কার্য্য যখন হস্তপদাদি দ্বারা সম্পন্ন করিতে লাগিলাম, তখনই কায়ের শক্তি প্রকাশ পাইল; কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যখন পাঁচ জনকে বলিলাম, তখনই বাক্যের শক্তি প্রকাশিত হইল। মানুষের বয়োবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা আরও স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। বয়োবস্থা প্রধানতঃ চারিটি—বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ি ও বৃদ্ধত্ব। বাল্যকালে মনেরই প্রাবল্য; বালকেরা (অতি শিশুরা) কোনও বিষয় মনে মনেই চিন্তা করিতে পারে, কিন্তু তাহা কায় ও বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না। যৌবনে শরীর দৃঢ়, সবল ও কার্য্যক্ষম হয়; সুতরাং যুবারা মানসিক চিন্তা অপেক্ষা কায়িক ব্যাপারেই অধিক লিপ্ত থাকে; অতএব যৌবনে মন অপেক্ষা কায়েরই প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। প্রৌঢ়ি অবস্থাতেও কায়িক কার্য্যে অধিক সময় অতিবাহিত হয় বটে; কিন্তু যৌবনের ক্ষ

তত দৃঢ় ভাবে নহে, কিছু শিথিল ভাবে হইয়া থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় মন ও কায় দুইটি অবসন্ন, সুতরাং তখন বাক্যেরই প্রাবল্য।

যুগাবস্থাতেও সেইরূপ নিয়ম বুঝিতে হইবে। সত্যযুগে মনেরই প্রাবল্য বলিয়া, উপাসনা বিষয়ে ধ্যানের ব্যবস্থা ছিল। ত্রেতায় কায়ের অধিক প্রাবল্য বলিয়া যজ্ঞের ব্যবস্থা ছিল ; দ্বাপরে কায়েরই কিঞ্চিৎ অল্প প্রাবল্য বলিয়া পরিচর্য্যার ব্যবস্থা, এবং কলিতে বাক্যের প্রাবল্য বলিয়া সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইজন্যই—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥

সাধুগণ কলির স্বভাব (অর্থাৎ বিবিধ দোষ) জানিয়াও, সারগ্রাহী বলিয়া, কলিকে আদর করিয়া থাকেন। যেহেতু কলিতে কেবল সংকীর্ত্তনেই সকল পুরুষার্থ প্রত্যক্ষরূপে লাভ করা যায়।

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥

এই কলিযুগে যে সকল মানব সাংসারিক কার্য্যে বৃথা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের সংকীর্ত্তন অপেক্ষা পরম লাভ আর কিছুই নাই। যেহেতু সংকীর্ত্তন দ্বারা পরম শান্তি লাভ হয়, এবং পুনর্জন্মও নিবারিত হইয়া থাকে।

কলির দোষ-গুণের বিষয় ভগবান্ শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—

কলের্দোষনিধে রাজন্ অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

হে মহারাজ, কলিকাল সকল-দোষের আকর হইলেও, তাহার এই একটি মহান্ গুণ আছে যে, মনুষ্য কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিলেই সংসারাসক্তি-শূন্য হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে।

তস্মাৎ সংকীর্ত্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাং।
মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিক-নিষ্কৃতিম্॥

হে পরীক্ষিৎ, সেই হেতু হরিনাম-সংকীর্ত্তনই জগতের মঙ্গলজনক এবং মহাপাপেরও শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে।

সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্র-মিবাতিবাতঃ॥

ভগবান্ অনন্তের নাম সংকীর্ত্তন করিলে অথবা তাঁহার লীলাকথা শ্রবণ করিলে, তিনি চিত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সূর্য্য যেমন অন্ধকার নষ্ট করেন এবং প্রবল বায়ু যেমন মেঘকে নষ্ট করে, সেইরূপ মানবের অশেষ বিপদ্ নষ্ট করিয়া থাকেন।

শ্রীমদানন্দাচার্য্য কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য এইরূপ বলিয়াছেন—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জ্জিত করে, সংসাররূপ মহাদাবানলকে নির্ব্বাণ করে, সুমঙ্গলরূপ কৈরব কুসুমে (শালুক ফুলে) জ্যোৎস্না বিতরণ করে, বিদ্যারূপ (তত্ত্বজ্ঞানরূপ) বধূকে উজ্জীবিত করে, আনন্দরূপ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে, পদে পদে পূর্ণ অমৃতরসে আস্বাদন করায় এবং সর্ব্বশরীরকে আপ্লুত করে। অর্থাৎ কৃষ্ণনাম-সংকী-

র্ত্তনে চিত্তশুদ্ধি হয়, বিষয়-বৈরাগ্য ঘটে, সৌভাগ্য-সঞ্চার হয়, তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তদনন্তর সচ্চিদানন্দানুভূতি ও পূর্ণামৃতাস্বাদন হয়, এবং সর্ব্বাঙ্গ অদ্বৈত-ব্রহ্মরূপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। ফলিতার্থ—নামসংকীর্ত্তনে যথাক্রমে ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও মুক্তি ঘটিয়া থাকে।

যেরূপ ভাবে নামসংকীর্ত্তন করিতে হয়, তাহাও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণ অপেক্ষাও নীচ হইয়া, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া, অভিমান-শূন্য হইয়া এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

স্নেহ নীচগামী, অতএব যদি ভগবানের স্নেহলাভের আশা থাকে, তবে তৃণ অপেক্ষাও নীচ হইতে হইবে। আরও, জলের স্বভাব নিম্নামুখেই প্রবাহিত হওয়া; সেইজন্য তৃণ অপেক্ষাও যে নীচ হইতে পারিবে, শ্রী-হরির কৃপাবারি তাহার দিকেই ধাবিত হইবে।

বৃক্ষ শীত আতপ বাত বৃষ্টি সকলই সহ্য করে; সেই সহিষ্ণুতার পুর-স্কারস্বরূপ চন্দ্রের অমৃতময় কিরণ প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে ফলধারণের শক্তি লাভ করে। অতএব যাঁহারা বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া নামকীর্ত্তন করিবেন, তাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্রের সুধাময় স্নেহরস লাভ করিতে এবং চতুর্ব্বর্গ-ফল রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

অভিমানেই জীবের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। আমি কর্ত্তা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ধন, আমার গৃহ—এই অভিমানেই জীবকে নানাকষ্ট, নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। অতএব মানবের কর্ত্তব্য যে, আত্মা-ভিমান ত্যাগ করিয়া সেই হরিকেই আত্মসমর্পণ করা। হে প্রভো, তুমি যাহা করাইতেছ, আমি তাহাই করিতেছি—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন

যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। সুতরাং যাহা করিলাম, তাহা তোমারই করা হইল, অতএব তুমিই তাহার ফলভোগী হও—'যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতম্। ত্বয়া কৃতস্তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥' আমি মূঢ়, কিসে আমার শ্রেয়ঃ হইবে তাহা আমি জানি না, তাহা জানিবার আমার শক্তিও নাই; তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি পরম পিতা, আমি অকৃতী অধম তনয়; তুমিই আমার শ্রেয়োবিধান কর।" এই বলিয়া তাঁহাকেই সকল ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে—

বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতু-রাদ্যো
যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়-যোগমায়ঃ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-
স্তত্রাস্মদীয়-বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ ॥

যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু, যিনি সকলের আদি, যাঁহার যোগমায়া যোগীন্দ্রগণও অতিক্রম করিতে পারেন না, সেই গুণত্রয়ের নিয়ন্তা ভগবানই,যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় তাহা করিবেন। সে বিষয়ে, আমাদের কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। করিলেও তাহাতে কোনও ফল হইবে না; যেহেতু তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্যই হইতে পারে না।

অন্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করাও কর্ত্তব্য। কেননা, যাঁহার নিজের স্বভাব যেরূপ, তিনি অপর কাহাকেও সেইরূপ স্বভাব-সম্পন্ন দেখিলে তাহার উপর প্রীত হইয়া থাকেন।

ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং জগন্মান্য হইয়াও অপরের যথোচিত মানবর্দ্ধন করিয়াছেন—ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছেন; ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছিল বলিয়া আপন প্রিয় পার্ষদ জয় ও বিজয়কে তিন জন্ম অসুরত্ব ভোগ করাইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি যাহাকে অন্যের প্রতি সম্মান

প্রদর্শন করিতে দেখিবেন, তাহার প্রতি সবিশেষ প্রীত ও প্রসন্ন হই-বেন সন্দেহ নাই। আরও, ভগবান্ আত্মা রূপে সকল পদার্থেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া সকলকেই সম্মান প্রদর্শন করিতে করিতে শেষে আমরা "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" দেখিতে পাইব।

সংকীর্ত্তনে খোল-করতালাদির উপকারিতা।

খোল (মৃদঙ্গ), করতাল, শিঙ্গা (বিষাণ), হাততালী, নৃত্য ও লুণ্ঠন —এই কয়টি সংকীর্ত্তনের অঙ্গ। যে কারণে সংকীর্ত্তনে এইগুলি নিতান্ত আবশ্যক, তাহা ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইতেছে।

মৃদঙ্গ।

মৃদঙ্গের বোল—ধিক্ তান্; ধিক্ তান্; ধিগেতান্। এই বোলে মৃদঙ্গ বলে কি, তাহা পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন—

যেষাং শ্রীমদ্-যশোদা-সুতপদ-কমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাং
যেষা-মাভীরকন্যা-প্রিয়গুণ-কথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-ললিত-গুণকথা-সাদরৌ নৈব কর্ণৌ
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ কথয়তি
নিতরাং কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ॥

শ্রীমান্ যশোদাসুত শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে যাহাদের ভক্তি নাই, "ধিক্ তান্"—তাহাদিগকে ধিক। গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তনে যাহাদের জিহ্বা আসক্ত নহে, "ধিক্ তান্"—তাহাদিগকে ধিক্। যাহাদের

কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণে অনুরক্ত নহে, "ধিক্ এতান্"—ইহাদিগকে ধিক্। কীর্ত্তনকালে মৃদঙ্গ এই কথাই বলিতে থাকে।

মৃদঙ্গের এই বোল শুনিয়া, এই ধিক্কার বুঝিয়া, অপরেও হরিসংকীর্ত্তনে যোগ দিতে পারেন; মৃদঙ্গ দ্বারা এই উপকার পাওয়া যায়।

করতাল।

মৃত্যুং জয়েয়ম্ শমনং জয়েয়ম্
তৎকিঙ্করাংশ্চাপি সুখং জয়েয়ম্।
শ্রুত্বেতি দূরাৎ করতালশব্দং
সঙ্কীর্ত্তকং তে খলু নোপয়ন্তি॥

"মৃত্যুকে জয় করিব, শমনকে জয় করিব, এবং তাহার কিঙ্করগণকেও জয় করিব।" করতালের এই শব্দ দূর হইতে শুনিয়া তাহারা (অর্থাৎ মৃত্যু, শমন ও শমন-কিঙ্করগণ) সংকীর্ত্তনকারীর নিকটে আসিতে সাহস করে না। অতএব করতাল দ্বারা মহোপকার সাধিত হয়।

বিষাণ।

নামসঙ্কীর্ত্তনোদ্ভূত-ভক্তিধ্মাত-মনোমলঃ।
অপসার্য্যেত ফুৎকারৈ-র্বিষাণনলবর্ত্মনা॥

নামসঙ্কীর্ত্তনে যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই অগ্নিস্বরূপ হইয়া মনোরূপ সুবর্ণের ময়লা ছাড়াইয়া দেয়, তাহার পর বিষাণরূপ নলে ফুৎকার দিলে, সেই ময়লা উড়াইয়া বিষাণ বিশেষ উপকার সাধন করে।

করতালি।

দেহাগকৃত-গেহানি পাপপক্ষিকুলান্যহো।
অপসারয়িতুং শশ্বৎ করতালী প্রদীয়তে॥

দেহরূপ বৃক্ষে যে পাপরূপ পক্ষী সকল বাসা বাঁধিয়া আছে, তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্যই মাঝে মাঝে হাততালী দিতে হয়। অতএব হাততালীতেও উপকার আছে জানা যাইতেছে।

নৃত্য ও লুণ্ঠন।

এতাবন্তি দিনানি কর্ম্মনিরতো বুদ্ধ্যা স্বয়াযাপয়ং
দূরে চাস্মি ততো জগৎ-পিতুরহো দুঃখঞ্চ নাপাগমৎ।
নৃত্যাম্যত্র তদুন্নয়ন্ ভুজযুগং বালায়মানঃ পুনঃ
ক্রন্দংশ্চাপি লুঠামি মাং করুণয়া ক্রোড়ে স কুর্য্যান্ন বা॥

নিজের বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া এতদিন যাপন করিলাম, কিন্তু হায়! তাহাতে জগৎপিতা হইতে দূরেই পড়িলাম এবং দুঃখও দূর হইল না। তাই আজ আবার শিশুর ন্যায় আচরণ করিয়া, বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছি এবং শেষে কাঁদিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছি, দেখি তিনি দয়া করিয়া এবার আমায় কোলে করেন কি না।

পুত্র আব্দার করিয়া, হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে, পিতাকে ডাকিতে থাকিলে, পিতা তাহাকে আদর করিয়া কোলে লইয়া থাকেন। তাহাতেও যদি না লন, তবে পুত্র কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিলে পিতা তাহাকে কোলে না করিয়া, আর থাকিতে পারেন না; এই জন্যই সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য ও লুণ্ঠন করিতে হয়। অতএব নৃত্য ও লুণ্ঠনে যে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নামে নারদাদি ঋষি পেয়েছেন তত্ত্বজ্ঞান।

(ব্যাস-নারদ-সংবাদ—ভাগবতে)

নারদ বলিলেন—হে মহর্ষে, আমি পূর্ব্বজন্মে দাসীর পুত্র ছিলাম। আমার মাতা এক ব্রাহ্মণের ভবনে দাস্যবৃত্তি করিতেন। একদা সেই ব্রাহ্মণের আলয়ে কতিপয় যোগী আগমন করিয়া চারি মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আমাকেই তাঁহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। আমি বালক হইয়াও ক্রীড়া ও চপলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম দেখিয়া, তাঁহারা আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। আমি তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে তাঁহাদিগেরই ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভক্তিসহকারে ভোজন করিতাম, তাহাতেই আমার পাপক্ষয় হইল এবং ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিতে লাগিল। তাঁহারা সতত মনোহারিণী হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন, আমি একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ করিতাম, তাহাতে হরিপদে আমার মতি উৎপন্ন হইল। সেই যোগিগণ চারি মাস সেখানে বাস করিয়াছিলেন। এতাবৎকাল হরিকথা শ্রবণ করায় হরির প্রতি আমার একান্ত ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া সেই কৃপালু মুনিগণ গমনকালে আমাকে ভাগবত-ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে আমি শিক্ষা করিলাম যে, যে কোনও কর্ম্ম করা যাউক না কেন, তাহা যদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে—কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যেমন ঘৃত ভক্ষণ করিয়া কোনও রোগ উৎপন্ন হইলে, সেই ঘৃতই দ্রব্যান্তর-সম্পর্কে ঔষধরূপে তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ যে কর্ম্ম দ্বারা সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে, সেই কর্ম্মই হরিতে সমর্পিত হইলে সংসারবন্ধন মোচন করিতে সমর্থ হয়। সংসারে থাকিয়া যাহাতে ভগবানের প্রীতিসাধন হয়, এরূপ কর্ম্ম করিলে, তদ্দ্বারা

সনৎকুমারাদি ঋষিগণ, পিতা কর্তৃক প্রজাসৃষ্টি-করণে আদিষ্ট হইয়াও, সে আদেশ অবহেলা করিয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করত মুক্তিপথের পথিক হইয়াছেন। আমিও ঈশ্বরদত্ত এই বীণাযোগে হরিনাম গান করত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছি। ইহাতে আমার স্বার্থ ও পরার্থ উভয়ই সংসাধিত হইতেছে। কারণ, আমি যখনই ভগবানের গুণগান করি, তখনই তিনি আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া থাকেন, এবং বিষয়াসক্ত মানবগণও সেই হরিনাম শুনিয়া অনায়াসে ভবসিন্ধু পার হইতে পারেন। কামলোভাদি দ্বারা মলিনীভূত যে চিত্ত, তাহা হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে যেরূপ নির্ম্মল হইয়া থাকে,যম-নিয়মাদি-যোগাবলম্বনে সেরূপ হইতে পারে না।

হরিভক্তির এই মাহাত্ম্য আমি গুরুর নিকট শুনিয়াছি, শাস্ত্রে অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি; সুতরাং এ বিষয়ে কাহারও সংশয় করা উচিত নহে।

এই বলিয়া দেবর্ষি, মহর্ষির নিকট বিদায়-গ্রহণপূর্ব্বক, বীণা বাজাইয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাসও সরস্বতীনদীর পশ্চিম তীরে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া, সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, আচমনপূর্ব্বক, নারদের উপদেশানুসারে ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ভক্তিপ্রভাবে তাঁহার মন যখন নির্ম্মল ও নিশ্চল হইল, তখন তিনি জ্ঞাননেত্রে দেখিতে পাইলেন যে— সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর শ্রীহরি বিদ্যাশক্তি দ্বারা অবিদ্যাকে পরিচালিত করিতেছেন, জীবাত্মা স্বয়ং ত্রিগুণাতীত হইয়াও সেই অবিদ্যার বশে বিমোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাশ্রিত কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া বিবেচনা করেন; এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ করিলেই এই অবিদ্যা-জনিত সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। এইরূপে মহর্ষি স্বয়ং এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, অজ্ঞলোকদিগের উপকারার্থে শ্রীমদ্ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। সেই সংহিতা শ্রবণ করিলে পরম-

পুরুষ শ্রীহরির প্রতি লোকের ভক্তি উৎপন্ন হয়। সেই ভক্তির ফলে শোক মোহ ও ভয় বিদূরিত হইয়া যায়। সেই সংহিতা রচনা ও সংশোধন করিয়া, মহর্ষি প্রথমে আপন পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এবং পরে প্রসন্নচিত্তে ও কৃতার্থম্মন্য হইয়া সমধিক হৃদয়োচ্ছ্বাসে জগতের লোককে সাদরে বলিয়া গিয়াছেন—

নিগম-কল্পতরো-র্গলিতং ফলং
শুকমুখা-দমৃতদ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রস-মালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

যাঁহাদের রসবোধ আছে এবং রসের তারতম্য বুঝিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহাদিগকে আমি বলিতেছি যে, তোমরা এই ভাগবতরূপ ফল পান কর। ইহা যে-সে বৃক্ষের ফল নহে; বেদরূপ কল্পতরুর ফল। কল্পতরুর ফল স্বভাবতঃই সুস্বাদুতর, তাহাতে যদি শুকের (টিয়া পাখীর) মুখভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে সুস্বাদুতম হইয়া থাকে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই ভাগবতও একে বেদরূপ কল্পতরু ফল, তাহাতে আবার শুকের মুখ হইতে বিগলিত হইয়াছে। ফল যদি উচ্চ স্থান হইতে একেবারে ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইলে খণ্ডিত হইয়া যায়; রসেরও অধিকাংশ বিনষ্ট হয়। তাই বলিতেছেন, এ ফল একেবারে ভূতলে পতিত হয় নাই। ইহা পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠধামে ছিল, সে স্থান হইতে ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে প্রদান করেন, ব্রহ্মা নারদকে দেন, নারদের নিকট হইতে আমি প্রাপ্ত হই। কিন্তু পিতার স্বধর্ম্ম এই যে, উৎকৃষ্ট খাদ্য বস্তু পাইলে তাহা পুত্রের মুখে তুলিয়া দিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন; তাই আমিও আমার পুত্র শ্রীশুকদেবের মুখে ইহা তুলিয়া দিয়াছিলাম; তাহার পর তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যাদি দ্বারা ক্রমশঃ ভূতলে আসিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং ইহা অখণ্ডই আছে; সমগ্র-রসে পরিপূর্ণই রহিয়াছে।

বিশেষতঃ ইহা যখন আমি আপন একমাত্র পুত্রকে খাইতে দিয়াছিলাম, তখন কুফল ভাবিয়া পান করিতে কেহ সন্দেহ করিও না। কল্পতরুর ফলে যেমন অমৃতময় দ্রব থাকে, এ ফলেও সেইরূপ অমৃতময় অর্থাৎ পরমানন্দরূপ দ্রব আছে। অন্য ফলের ত্বক্ অষ্টি (খোসা-আঁটি) প্রভৃতি অনেক হেয়াংশ থাকে, এ ফলের তাহা নাই; ইহা কেবলই রস। তাই তোমাদিগকে ইহা ('ভক্ষণ' করিতে না বলিয়া) 'পান' করিতে বলিতেছি। তোমরা ইহার সকল অংশই পান কর। রস যদি ভূতলে পতিত হয়, তাহা ধূলি-শোষিত হইয়া যায়; সেই জন্যই ইহাকে ফল বলিতেছি। আবার, কেবল 'ফল' বলিলে তাহাতে ত্বক্ অষ্টি প্রভৃতি হেয় অংশ থাকা সম্ভব; কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও হেয় অংশ নাই বলিয়া ইহাকে 'রস'ও বলিতেছি। অতএব ইহাকে ফলাকার রসমাত্র বলিয়াই জানিবে। ইহা একবার পান করিয়াই অথবা তৃপ্তিলাভ অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াই পরিত্যাগ করিও না। ইহা নিরন্তরই পান করিবে এবং মোক্ষলাভ হইলেও পান করিবে।" এ কথা বলাই বাহুল্য; যে হেতু তাহা না করিয়া তোমরা থাকিতেও পারিবে না। কারণ, হরিকথামৃতের এমনই গুণ যে, তাহা একবার পান করিলে তৃপ্তি হয় না; পুনঃপুনঃ পান করিতেই ইচ্ছা হইয়া থাকে। তাই শৌনকাদি ঋষিগণ সূত গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যৎ শৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥

আমরা উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথায় তৃপ্তিলাভ করিতেছি না, অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছাবিরতি ঘটিতেছে না। যেহেতু সেই হরিকথা রসজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রবণ করিলে পদে পদে স্বাদু বোধ করেন, প্রতিক্ষণে তাঁহারা নূতন নূতন সুস্বাদ অনুভব করিয়া থাকেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ত্রিবিধ কারণে তৃপ্তিবোধ (আহারে অনিচ্ছা)

হইয়া থাকে ; যথা—(১) উদর পরিপূর্ণ হওয়া, (২) রসবোধ না থাকা, (৩) পুনঃপুনঃ একপ্রকার রসেরই স্বাদ গ্রহণ করা। সুতরাং হরিকথামৃত যখন শ্রবণ করিতে অর্থাৎ কর্ণপুটে পান করিতে হয়, তখন শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশাত্মক বলিয়া, তাহা কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না ; 'রসজ্ঞ' বলায় পানকারীদিগের রসবোধেরও অসম্ভাব নাই ; এবং প্রতিক্ষণে নূতন নূতন সুস্বাদ অনুভব করায় একবিধ রসেরও সম্ভাবনা নাই। এইজন্যই হরিকথামৃত-পানে কেহই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না।

আবার মুক্তিলাভ করিয়াও নারদাদি মুনিগণ হরিকথা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, সূতের উক্তি—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

হরির গুণই এইরূপ যে, আত্মজ্ঞান-রত ও দেহাভিমানশূন্য মুনিগণও তাঁহার প্রতি নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন।

অহো! পরম আনন্দের বিষয় যে, ঈদৃশ দুর্লভ ফল আজি ভূমণ্ডলে আমাদের সুলভ হইয়াছে!

ধ্রুবোপাখ্যান।

"ধ্রুব নিয়ে নাম, হ'ল পূর্ণকাম,
গেল পুণ্য ধাম—দিব্য স্থান।"

স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের সুনীতি ও সুরুচি নামে দুই পত্নী ছিলেন। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব, এবং সুরুচির গর্ভে উত্তম জন্মগ্রহণ করেন। রাজা সুরুচির প্রতিই অত্যন্ত আসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; সুনীতিকে ভালবাসিতেন না। একদিন তিনি উত্তমকে

ক্রোড়ে করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সুরুচিও নিকটে ছিলেন, এমন সময় পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব উপস্থিত হইয়া পিতার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য উৎসুক হইলেন। রাজা সুরুচির সাক্ষাতে ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইতে ও আদর করিতেও সমর্থ হইলেন না। পিতার অনাদর দেখিয়া ধ্রুব অভিমানে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন সুরুচি গর্ব্বভরে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন—ধ্রুব! তুমি কি জান না যে, তুমি সুনীতির গর্ভে জন্মিয়াছ? আমার গর্ভে যখন জন্মগ্রহণ কর নাই, তখন তুমি এ আসনে বসিবার অধিকারী নহ। যদি তুমি এই রাজাসনে বসিতে অভিলাষী হও, তবে তপস্যা দ্বারা পরমপুরুষ শ্রীহরিকে প্রীত করিয়া তাঁহার কৃপায় আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর।

ধ্রুব, পিতার সম্মুখে বিমাতার এই দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া, দণ্ডাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, রোদন করত মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। সুনীতি পুত্রের সেই অবস্থা দেখিয়া এবং সকল কথা শুনিয়া, অধীর হইয়া রোদন ও বিলাপ করিলেন। শেষে পুত্রকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কহিলেন—বৎস! পরের উপর ক্রোধ করিও না। লোকে আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। সুরুচি সত্য কথাই বলিয়াছেন;—আমি এমনই দুর্ভাগা যে, রাজা আমাকে ভার্য্যা বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জিত হন; অতএব তুমি যখন আমার গর্ভে জন্মিয়াছ, তখন তোমার রাজাসন-লাভে অধিকার নাই। তোমার বিমাতা তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, এখন তুমি তাহাই কর;—যদি তুমি উত্তম আসন লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে শ্রীহরির পাদপদ্ম আরাধনা কর। তাঁহার পাদপদ্ম আরাধনা করিয়াই ব্রহ্মা সর্ব্বলোক-পূজিত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তোমার পিতামহ মনুও অন্যের সুদুর্লভ পার্থিব সুখ ও মুক্তি লাভ করিয়াছেন। অতএব বৎস, তুমিও সেই ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে একাগ্রমনে ভজনা কর। সেই

পদ্মপলাশলোচন হরি ভিন্ন তোমার দুঃখহারী আর কাহাকেও আমি দেখিতেছি না।

ধ্রুব জননীর এই কথা শুনিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন দ্বারা দুঃখাবেগ প্রশমিত করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ আসিয়া সস্নেহবচনে ধ্রুবকে কহিলেন—বৎস! তুমি বালক; এখন তুমি ক্রীড়াতেই রত আছ। তোমার আবার মান অপমান কি? যাহাদের মান-অপমান-বোধ হইয়াছে, তাহাদেরও অসন্তোষের কারণ কিছুই নাই। যেহেতু সকলে স্বস্ব কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। অতএব আপন কর্ম্ম-ফলে লোকে যখন যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই তাহার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তোমার মাতা তোমাকে যে পুরুষের আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাকে সহজে পাওয়া যায় না, মুনিরা বহুজন্ম তপস্যা করিয়াও তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন না; তুমি বালক হইয়া কিরূপে তাঁহার কৃপা লাভ করিবে? অতএব বৎস, তোমার এ নির্ব্বন্ধ নিতান্তই নিষ্ফল বুঝিতেছি; যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইও; এক্ষণে এ কার্য্য হইতে বিরত হও।

ধ্রুব কহিলেন—ভগবন্, আপনি দয়া করিয়া, আমাকে দর্শন দিয়া, যে, সকল উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, বিমাতার দুর্ব্বাক্য-বাণে আমার হৃদয় এতই জর্জ্জর হইয়াছে যে, আপনার এ সুস্নিগ্ধ বচনামৃত তাহা হইতে বিগলিত হইয়া যাইতেছে। অতএব প্রভো, যাহাতে আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভে অধিকারী হইতে পারি, এক্ষণে দয়া করিয়া, আমাকে সেই উপদেশ প্রদান করুন।

তখন নারদ বলিলেন—বৎস, তোমার মাতা তোমাকে যে উপায় বলিয়া দিয়াছেন, তুমি তাহাই কর। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ কামনা করে, শ্রীহরির চরণারাধনা ভিন্ন তাহার আর অন্য উপায় নাই। অতএব তুমি যমুনাতীরে পবিত্র মধুবনে গমন কর।

সেখানে থাকিয়া প্রত্যহ যমুনা-জলে স্নান করিয়া, সুখাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য পরিহার করিয়া, স্থিরচিত্তে জগদ্-গুরুকে ধ্যান করিবে এবং তাঁহার নাম জপ করিতে থাকিবে। তাহা হইলেই তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমার সকল কামনা পূর্ণ করিবেন।

অনন্তর ধ্রুব, দেবর্ষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, তাঁহার উপদেশানুসারে মধুবনে গমন করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিন দিন অন্তর ফল ভক্ষণ করিয়া প্রথম মাস, ছয় দিন অন্তর গলিত পত্র ভক্ষণ করিয়া দ্বিতীয় মাস, নয় দিন অন্তর জল ভক্ষণ করিয়া তৃতীয় মাস, এবং বার দিন অন্তর বায়ু ভক্ষণ করিয়া চতুর্থ মাস যাপন করিলেন। পঞ্চম মাসে, একেবারেই আহার পরিত্যাগ করিয়া, এক পদে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, মনকে সকল বিষয় হইতে বিরত করিয়া, হৃৎপদ্মে ভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন।

তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না,—ভক্তকে দর্শন দিবার জন্য মধুবনে উপস্থিত হইলেন। ধ্রুব তখন হৃৎপদ্মে তাঁহাকে আর দেখিতে না পাইয়া যেমন নয়ন উন্মীলন করিলেন, অমনি দেখিলেন —শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পীতাম্বর শ্রীহরি গরুড়বাহনে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন! দেখিয়াই ভক্তিভরে ধরাতলে পতিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন এবং উঠিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় ও বাষ্পোদ্গমে কণ্ঠরোধ হওয়ায় স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না, কোনও কথাও বলিতে পারিলেন না; কেবল অবিরল অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ বলিলেন—বৎস, আমি তোমার অভিপ্রায় জানিয়াছি; তুমি যে কামনায় আমার আরাধনা করিতেছ, তাহা অন্যের পক্ষে দুর্লভ হইলেও আমি তোমায় প্রদান করিতেছি। যে স্থানে কেহ কখনও যাইতে পারে নাই, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান—ধ্রুবলোকে গমন করিবে। কিন্তু তাহা

এক্ষণে হইবে না। তোমার পিতা তোমাকে রাজ্য দিয়া বন-প্রস্থান করিলে, তুমি ছত্রিশ হাজার বৎসর রাজ্য পালন করিবে এবং তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ার্থ বনে গিয়া যক্ষহস্তে নিহত হইলে, তাহার মাতা সুরুচি পুত্রান্বেষণার্থ বন-গমন করিয়া দাবানলেপ্রবিষ্ট হইবে। তুমি বিবিধ যজ্ঞে আমার আরাধনা-সহকারে রাজ্যপালন ও সর্ব্ববিধ সুখ ভোগ করিয়া শেষে আমাকে স্মরণ করিও; সেই সময়ে তুমি সর্ব্বোপরি-লোকে গমন করিবে। এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে ধ্রুব পূর্ণকাম হইয়া ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজা পরম সমাদরে প্রত্যুদ্গমন করিয়া মহাসমারোহে পুত্রকে লইয়া আসিলেন। সুরুচি তখন গর্ব্ব পরিহার করিয়া আন্তরিক স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন। উত্তমও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যাহার প্রতি শ্রীহরির কৃপা হয়, তাহার আর শত্রু থাকে না; সকলেই তাহার মিত্র হইয়া উঠে। তখন সুনীতি প্রাণাধিক পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজা, পুত্র ধ্রুবকে যোগ্য, বয়স্থ ও প্রজাগণের অনুরাগ-ভাজন দেখিয়া, সকলের সম্মতিক্রমে তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ধ্রুবও বহুসহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়া, আপন পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক, জগৎকে মায়াময় ভাবিয়া, হরি-পাদপদ্মেই মন সমর্পণ করিলেন, এবং ভক্তিভরে পুলকিত-শরীরে প্রেমাশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে বদনে অবিরত হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণুরূপধারী দুইজন বিষ্ণুদূত দিব্য বিমান লইয়া উপস্থিত হইলেন। ধ্রুব তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—মহারাজ! আপনি পঞ্চবর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে কঠোর

তপস্যা দ্বারা যে দেবাধিদেবকে প্রীত করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহারই অনুচর। তাঁহার আদেশে আপনাকে লইবার জন্য এই দিব্য বিমান আনিয়াছি; এক্ষণে ইহাতে আরোহণ করিয়া, অন্যের এবং আপনার পিতৃ-পিতামহেরও অগম্য সর্ব্বোত্তম স্থানে গমন করুন।

এই কথা শুনিয়া ধ্রুব সকলকে প্রণাম করিয়া বিনীত ভাবে বিমানে আরোহণ করিলেন; অমনি দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইল, পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্বগণ গান আরম্ভ করিল। তৎকালে ধ্রুব তাঁহার জননীকে স্মরণ করায় বিষ্ণুদূতেরা বলিলেন—ঐ দেখুন, আপনার মাতা অগ্রেই বিমানারোহণে চলিয়াছেন। এইরূপে ধ্রুব হরিনামোচ্চারণ-ফলে সর্ব্বোত্তম দিব্যলোকে গমন করিয়া অদ্যাপি সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

প্রহ্লাদ-চরিত

"নামেরই ফলে, প্রহ্লাদকে নিলেন কোলে,
দয়াল হরি।"

কশ্যপপত্নী দিতির গর্ভে সর্ব্বপ্রথমে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই অসুর জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান্ হরি রসাতলমগ্না ধরণীকে উদ্ধার করিবার জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়া, তৎকার্য্যে বিঘ্নকারী হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। সেই ভ্রাতৃবধের কারণে হিরণ্যকশিপু হরির প্রতি একান্ত বিদ্বেষবশতঃ হরিপরায়ণ দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিতে, যজ্ঞানুষ্ঠানে বাধা জন্মাইতে এবং হবিঃসাধন গাভীগণের হিংসা করিতে অনুচরবর্গকে আদেশ করিয়া, স্বয়ং স্বীয় প্রপিতামহ ব্রহ্মার

আরাধনার্থ কঠোর তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইল। দীর্ঘকাল-পরে ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্যত হইলে, হিরণ্যকশিপু প্রার্থনা করিল—বিধিসৃষ্ট কোনও জীব হইতে, গৃহের অভ্যন্তরে ও বাহিরে, রাত্রে ও দিবসে, শূন্যে ও ভূতলে, অস্ত্রে ও শস্ত্রে তাহার মৃত্যু হইবে না; এবং সে, সমরে অজেয় হইবে ও ত্রিভুবনে একাধিপত্য লাভ করিবে।

ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলে, হিরণ্যকশিপু অপ্রতিহত-বলবীর্য্য প্রভাবে ত্রিভুবন জয় করিয়া, পরম রমণীয় মহেন্দ্রভবনে বাস করিতে লাগিল। কালক্রমে তাহার চারিটি পুত্র জন্মিল, তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্ব-কনিষ্ঠ; দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করায় তদীয় পুত্র শণ্ড ও অমর্কের উপর দৈত্য-বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পিত হইল। প্রহ্লাদ অন্যান্য অসুর-বালকদিগের সহিত গুরুগৃহে বাস করিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

একদিন দৈত্যপতি পরম স্নেহাস্পদ পুত্র প্রহ্লাদকে আনাইয়া ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস, এতদিন গুরুগৃহে থাকিয়া যে সকল বিষয় শিক্ষা করিলে, তন্মধ্যে যাহা সার বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহা আমাকে শুনাও।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—পিতঃ, আমি যে সার কথা শিখিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শুনুন ঃ—

অনাদিমধ্যান্তমজম্ অবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্ব্বকারণকারণম্॥

যাঁহার আদি মধ্য ও অন্ত নাই, যাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, যাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যিনি সকল কারণের কারণ, সেই মহাপ্রভাব হরিকে প্রণাম করি।

দৈত্যরাজ এই কথা শুনিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া প্রহ্লাদের

গুরুর দিকে চাহিয়া কহিল—বিপ্রকুলাধম! এ কি? আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার পুত্রকে শত্রুস্তুতি শিখাইয়াছ!

গুরু ভীত হইয়া কাম্পিতকলেবরে কহিলেন—দৈত্যেশ্বর! আমার উপর ক্রোধ করিবেন না। আপনার পুত্র যাহা বলিতেছে, উহা আমি শিখাই নাই।

হিরণ্য। বৎস প্রহ্লাদ! কে তবে তোরে এরূপ শিখাইয়াছে? তোর গুরু ত বলিতেছে—"আমি শিখাই নাই।"

প্রহ্লাদ।—যিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন. পিতঃ! সেই পরমাত্মা হরি ভিন্ন কে কাহাকে কি শিখাইতে পারে?

হিরণ্য।—হরি কে রে, দুর্ম্মতি?

প্রহ্লাদ।—যাঁহার পরম পদ যোগিগণের ধ্যেয় ও বাক্যের অগোচর, এবং যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ও যিনি স্বয়ংই এই জগৎ, সেই হরি পরমেশ্বর।

হিরণ্য।—তোর কি মরিবার ইচ্ছা হইয়াছে? মূর্খ! আমি পরমেশ্বর; আমার সাক্ষাতে অন্যকে পরমেশ্বর বলিতেছিস্।

প্রহ্লাদ।—পিতঃ! ক্রোধ করিতেছেন কেন? তিনি কেবল আমার পরমেশ্বর নহেন; তিনি সর্ব্বজনের এবং আপনারও পরমেশ্বর।

হিরণ্য।—কোনও ভূত বুঝি তোর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে; তাহার আবেশে তুই এরূপ কথা বলিতেছিস্?

প্রহ্লাদ।—পিতঃ! তিনি ভূতও বটেন, ভূতেশ্বরও বটেন। কেবল আমার হৃদয়ে নয়; সেই ভূতেশ্বর আপনারও হৃদয়ে আছেন। তাঁহার আদেশে আপনি, আমি ও সকলেই সকল কার্য্য করিয়া থাকি।

হিরণ্য।—দুরাত্মাকে গুরুগৃহে লইয়া যাও। বিশেষ সাবধানে রাখিতে বল, যেন কোনও শত্রুপক্ষ ছদ্মবেশে আসিয়া তাহাকে আর এরূপ কুশিক্ষা না দেয়।

আদেশমাত্র দৈত্যগণ তাঁহাকে গুরুগৃহে রাখিয়া আসিল। প্রহ্লাদ সেখানে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পরে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ডাকাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রহ্লাদ, আমাকে একটি শ্লোক শুনা দেখি।

প্রহ্লাদ কহিলেন—

যতঃ প্রধানপুরুষৌ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥

যাঁহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহা হইতে এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্বকারণ হরি আমাদের উপর প্রসন্ন হউন।

হিরণ্য।—দৈত্যগণ! এই দুরাত্মাকে এখনি মারিয়া ফেল। এমন কুলাঙ্গার পুত্রে প্রয়োজন নাই।

আজ্ঞামাত্র অসুরেরা খড়্গ লইয়া কাটিতে উদ্যত হইল। প্রহ্লাদ কহিল—হরি যখন আমাতেও আছেন এবং তোমাদের শস্ত্রেও রহিয়াছেন, তখন আমাকে কি কাটিতে পারিবে?

দৈত্যেরা সে কথা বুঝিল না; প্রহ্লাদের উপর এক কালে শত সহস্র খড়্গের আঘাত করিল; কিন্তু সমস্ত খড়্গাই ভাঙ্গিয়া গেল; প্রহ্লাদের অঙ্গে অল্পমাত্র বেদনাও হইল না। তাহা দেখিয়া হিরণ্যকশিপু বলিল—দুর্ম্মতি! এখনও শক্রস্তব হইতে নিবৃত্ত হ', আমি তোকে অভয় প্রদান করিতেছি।

প্রহ্লাদ।—পিতঃ! যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্মভয়, জরাভয়, যমভয় প্রভৃতি কোনও ভয়ই থাকে না, সেই হরি হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কোথায় যে, আপনি আমাকে অভয় দিবেন?

হিরণ্য।—সর্পগণ! তোরা তীব্র-বিষযুক্ত দশনে দংশন করিয়া এই দুর্ম্মতিকে এখনই সংহার কর্।

আদেশ পাইয়া সর্পগণ প্রহ্লাদের সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল। প্রহ্লাদ হরিস্মরণে আনন্দমগ্ন থাকায় বিষের যন্ত্রণা কিছুই অনুভব করিলেন না। সর্পগণ দৈত্যপতিকে কহিল—প্রভো! আমাদের দাঁত টুটিল, মণি ফাটিল, ফণায় ব্যথা হইল এবং হৃদয়ে কম্প ধরিল, তথাপি তাহার চর্ম্ম ভেদ করিতে পারিলাম না, ও-কার্য্য আমাদের অসাধ্য; আমাদিগকে অন্য কার্য্যে আদেশ করুন।

হিরণ্যকশিপু তখন প্রহ্লাদের বিনাশার্থ দিগ্‌গজ সকলকে আদেশ করিলেন। পর্ব্বতপ্রমাণ দিগ্‌গজেরা প্রহ্লাদকে ভীষণ দন্ত দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদের কিছুই হইল না; তাহাদেরই দন্ত ভাঙ্গিয়া গেল।

প্রহ্লাদ কহিলেন—পিতঃ! এই বজ্রসম সুকঠিন গজদন্ত সকল যে ভগ্ন হইল, ইহা আমার প্রভাবে নহে। হরিস্মরণের প্রভাবেই এরূপ হইয়াছে।

হিরণ্যকশিপু তখন প্রহ্লাদকে দগ্ধ করিবার জন্য অসুরদিগকে অনুমতি দিল। অসুরেরা প্রবল অগ্নি জ্বালিয়া তাহার মধ্যে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করিল। প্রহ্লাদ কহিলেন—পিতঃ! এই প্রজ্বলিত হুতাশন আমাকে দগ্ধ করিতেছে না; আমার বোধ হইতেছে, আমি যেন সুশীতল পদ্মপত্রের উপর শুইয়া আছি!

তখন প্রহ্লাদের গুরু দৈত্যপতিকে কহিতে লাগিলেন—দৈত্যেশ্বর, ক্রোধ সংবরণ করুন। আমরা আর কিছু দিন ইহাকে শিক্ষা দিয়া দেখি, তাহাতেও যদি এ আমাদের কথা না শোনে, তখন আমরাই কৃত্যা (আভিচারিক কর্ম্ম) করিয়া ইহাকে বিনাশ করিব। দৈত্যবর ইহাতে সম্মত হইয়া প্রহ্লাদকে আবার গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। প্রহ্লাদ সেখানে থাকিয়া গুরুর উপদেশ মত পাঠ শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং যখন গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন অন্যান্য দৈত্যবালকগণকে স্বয়ং এইরূপ উপদেশ দিতেন—হে দৈত্যবালকগণ, তোমাদের নিকট আমি সার কথা

বলিতেছি, শ্রবণ কর। গুরুরা বৃত্তির লোভে আমাদিগকে অসার কথা শিখাইতেছেন ; আমার সেরূপ কোনও লোভ নাই ; সুতরাং আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমরা সত্য বলিয়া মনে করিবে। দেখ, এই সংসারে জন্ম-মৃত্যুর হাত কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। লোকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতেছে, বারংবার মৃত্যুর কবলে পতিত হইতেছে। জন্মগ্রহণে দারুণ জঠরযাতনা, জীবনধারণেও দেহাদির ভরণপোষণে অশেষ যন্ত্রণা এবং মরণেও অসহ্য যমতাড়না ভোগ করিতে হয়। এই সকল ক্লেশ অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়—হরিভক্তি। অতএব হরিভক্তি গ্রহণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এখন আমরা এই দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়াছি, কিন্তু পরে আবার কোন্ জন্ম হইবে, তাহার নিশ্চয় নাই। এখন আমরা বালক আছি ; কিন্তু কবে আমাদের মৃত্যু হইবে, তাহার স্থিরতা নাই ! দীর্ঘজীবন লাভ করিলেও, যৌবনে একবার বিষয়রসের আস্বাদ পাইলে তাহা সহজে ছাড়িতে পারিব না। বার্দ্ধক্যে সামর্থ্যহীন হইতে হইবে, তখন কোনও কার্য্যই করিতে সমর্থ হইব না। তাই বলি—এই জন্মেই, বাল্যকাল হইতেই, বিষয়রসের আস্বাদ না পাইতে পাইতেই, দেহ মন দুর্ব্বল না হইতে হইতেই হরি-ভক্তিতে রত হওয়া সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দেখ, হরিস্মরণে কোনও ক্লেশ নাই, অথচ তাহাতে সকল ক্লেশের অবসান হইয়া থাকে। অতএব ভাই সকল, তোমরা আসুরিক স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, সকল কাজ ছাড়িয়া, হরিস্মরণে রত হও, দিবারাত্রি বদন ভরিয়া হরি হরি বলিতে থাক।

এ কথা হিরণ্যকশিপুর কাণে উঠিল। তখন সে কুপিত হইয়া বিষ-প্রদানে প্রহ্লাদের প্রাণ সংহার করিতে অনুমতি করিল। তাহার আদেশে পাচকেরা প্রহ্লাদের অন্নে তীব্র বিষ মিশাইয়া দিল। প্রহ্লাদ হরিকে অর্পণ করিয়া সেই অন্ন ভোজন করিলেন। তাঁহার কিছুই হইল না। তখন দৈত্যরাজের আদেশে পুরোহিতেরা কৃত্যা উৎপাদন করিলেন।

তাঁহাদের মন্ত্রবলে অগ্নিকুণ্ড হইতে ভীষণাকৃতি অগ্নিময়ী দেবতা আবির্ভূত হইয়া প্রহ্লাদের বক্ষে শূলপ্রহার করিল। যে হৃদয়ে সর্ব্বশক্তিমান্ হরি বিরাজ করিতেছেন, সে হৃদয়ে লাগিয়া বজ্র ভাঙ্গিয়া যায়, শূলের কথা কি !! কৃত্যা-প্রয়োজিত সেই শূল শতখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই কৃত্যা পুরোহিতগণকেই দগ্ধ করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইল।

প্রহ্লাদ পুরোহিতগণকে বিপন্ন দেখিয়া "হরি, রক্ষা কর" বলিয়া ধাবিত হইলেন এবং কহিলেন—হে জনার্দ্দন, যাহারা আমার অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি তাহাদের প্রতিও মিত্রভাব প্রদর্শন করিয়াছি ; আমার সেই সত্যপ্রভাবে পুরোহিতগণকে বাঁচাইয়া দিন। এই বলিয়া প্রহ্লাদ যেমন পুরোহিতগণকে স্পর্শ করিলেন, অমনই তাঁহারা সুস্থশরীরে বাঁচিয়া উঠিলেন, এবং অন্তরের সহিত প্রহ্লাদকে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

হিরণ্যকশিপু এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রহ্লাদকে ডাকাইয়া কহিলেন —প্রহ্লাদ ! তোর এরূপ অসাধারণ প্রভাব কিরূপে জন্মিল ? ইহা তোর স্বভাবসিদ্ধ ? না, কোনও মন্ত্রাদি-জনিত ?

প্রহ্লাদ বিনীতভাবে বলিলেন—পিতঃ ! এ প্রভাব আমার স্বভাবসিদ্ধও নহে, মন্ত্রাদিজনিতও নহে ; যাহার হৃদয়ে হরি থাকেন, তাহাদেরই এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না, তাহার অনিষ্ট কিছুতেই হয় না, জানিবেন। আমি হরিকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া, কায়মনোবাক্যে কাহারও কখনও কোনও অনিষ্ট করি না বলিয়াই আমারও কোনও অনিষ্ট ঘটিতেছে না। অতএব হরিকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া সকলের প্রতি ভক্তি করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

দৈত্যপতি এই কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া অত্যুচ্চ প্রাসাদশিখর হইতে পাষাণের উপর প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিল। কিন্তু প্রহ্লাদ পাষাণের উপর না পড়িতে পড়িতেই, পৃথিবী প্রহ্লাদজননী

কয়াধূর বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তখন হিরণ্যকশিপু মায়াবী শম্বরকে মায়াপ্রকাশে প্রহ্লাদকে মারিতে অনুমতি দিল। শম্বরাসুর মায়া বিস্তার করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। হরির আদেশে সুদর্শনচক্র আসিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিল। তার পর দৈত্যপতির আদেশে সংশোষক বায়ু প্রহ্লাদের শরীরে প্রবেশ করিল, এবং হরির প্রভাবে স্বয়ং বিনিষ্ট হইল। পরে প্রহ্লাদকে পুনর্ব্বার গুরু-গৃহে পাঠান হইল; তাঁহারা তাঁহাকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে হিরণ্যকশিপু আবার পুত্রকে ডাকিয়া রাজনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিল। প্রহ্লাদ কহিলেন—পিতঃ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা গুরুরা আমায় শিখাইয়াছেন এবং আমিও শিখিয়াছি বটে; কিন্তু তাহা আমার মনোমত নহে। যেহেতু, একমাত্র হরিই যখন সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন, তখন শত্রু মিত্র কোথায় যে, তাহাদের বশীকরণের জন্য সামদানাদি উপায় শিক্ষা করিতে হইবে? এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে প্রহ্লাদের বক্ষে দারুণ পদাঘাত করিল এবং তাঁহাকে নাগপাশে বন্ধনপূর্ব্বক সাগরে ডুবাইয়া তদুপরি রাশীকৃত প্রস্তর চাপাইতে অনুমতি দিল। দৈত্যেরা সেইরূপ করিলে প্রহ্লাদ মনে মনে হরিকে প্রণাম করিলেন—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

হরিস্মরণের প্রভাবে সমুদ্র ক্ষুভিত ও উদ্বেল হইয়া উঠিল; পৃথিবী বিচলিত হইল; নাগপাশ ছিঁড়িয়া গেল; প্রস্তররাশিও দূরে বিক্ষিপ্ত হইল। তখন প্রহ্লাদ উঠিয়া আসিয়া পিতার চরণে প্রণাম করিলেন।

হিরণ্যকশিপু কোপকম্পিত-কলেবরে কর্কশস্বরে কহিতে লাগিল—পাপিষ্ঠ! আজি তোকে আমিই যমালয়ে পাঠাইতেছি। যার ভয়ে আব্রহ্ম

স্তম্বপর্য্যন্ত চরাচর জগৎ কম্পমান হয়, তাহারই সম্মুখে তুই কার বলে এমন নির্ভয়ে কথা কহিতেছিস ?

প্রহ্লাদ সবিনয়ে বলিলেন—পিতঃ, তিনি কেবল আমার বল নহেন; তিনি আপনারও বল, এবং অপর সমস্ত বলবানেরও বল। আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত চরাচর জগৎ যাঁহার বশে চলিতেছে, সেই বলীয়ানের বলে সকলেই বলবান্ হইয়া থাকে। পিতঃ! আপনি এ আসুরিক স্বভাব পরিত্যাগ করুন, কাহারও প্রতি শত্রুভাব করিবেন না। এক হরিই যখন সকলে অবস্থিত, তখন আবার শত্রু কে? অবশীভূত অসৎপথপ্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় ভিন্ন লোকের শত্রু কেহ নাই। যাহারা অগ্রে অন্তঃশত্রু জয় না করিয়া বহিঃ-শত্রু জয় করিতে যায়—সর্ব্বস্বাপহারী দেহস্থ ষড়্‌রিপুকে দমন না করিয়া আপনাকে দিগ্বিজয়ী মনে করে, তাহাদের মত অজ্ঞ আব কে আছে ?

এ কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু কহিল—পাপিষ্ঠ! তোর মৃত্যু সন্নিকট, আর বিলম্ব নাই। আসন্নকালেই লোকে এইরূপ প্রলাপ বকিয়া থাকে। হাঁরে দুর্ম্মতি! তোর হরি যদি সর্ব্বত্রই আছে, তবে এই স্তম্ভের মধ্যে নাই কেন? এই খড়্গাঘাতে এখনই তোকে বধ করিতেছি; কই তোর হরি তোকে রাখুক দেখি? এই বলিয়া সক্রোধে উঠিয়া যেমন সজোরে স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করিল, অমনই ভক্তবৎসল হরি ভক্ত ব্রহ্মার এবং পরমভক্ত প্রহ্লাদের বাক্য সফল করিবার জন্য অতিভীষণ অত্যদ্ভুত নরসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ঘোর গভীর গর্জ্জন-সহকারে স্তম্ভ হইতে নির্গত হইলেন; এবং হিরণ্যকশিপুর গ্রীবা ধরিয়া আপন ঊরুদেশে ফেলিয়া, সভামধ্যে সায়ং সময়ে নখরপ্রহারে তাহার উদর বিদীর্ণ করিলেন।

হিরণ্যকশিপু এইরূপে নিহত হইলে, জগৎ সুস্থ হইল; দেবগণ ঋষিগণ-প্রভৃতি আসিয়া সেই নরসিংহ দেবের স্তব করিতে লাগিলেন। বালক প্রহ্লাদও তাঁহার অনেক স্তুতি করিলেন। তখন ভগবান্ স্নেহভরে প্রহ্লাদকে কোলে লইয়া সাদরে চুম্বন করিয়া কহিলেন—বৎস, আমার

নিকট বর প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ কহিলেন—নাথ, আমি অন্য বর চাই না। কেবল এই বর দিন, যেন জন্মে জন্মে, আপনার চরণে আমার অচলা ভক্তি থাকে। ভগবান্ বলিলেন—তাহা ত আছেই, এবং আমার প্রসাদে চিরদিনই থাকিবে। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ বলিলেন—আমার পিতা আপনার বিদ্বেষী হইয়া আপনার ভক্তগণকে উৎপীড়ন করিয়া আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমা করুন। ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া কহিলেন—বৎস, তোমার মত যাহারা আমার পরম ভক্ত, তাহারা আমার নিকট ঐহিক বা পারত্রিক কোনপ্রকার ঐশ্বর্য্য কামনা করে না। তথাপি আমার আদেশে তুমি এক মন্বন্তর কাল অসুররাজ্য উপভোগ কর; পরে কাল-বশে দেহ পরিত্যাগ করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে; এবং তোমার এই চরিত্র যাহারা শ্রবণ করিবে, তাহারও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন।

নামে ভক্তি।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্য-মর্থদ-মনিত্য-মপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

এই মনুষ্যদেহ অতিশয় দুর্লভ, যেহেতু ইহা বহুজন্মের পর—চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা চিরস্থায়ী নহে, ইহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ইহা অনিত্য। কিন্তু অনিত্য হইলেও ইহা পুরুষার্থ-লাভের প্রধান সাধন। অতএব এই দেহের পতন হইতে না হইতে মুক্তির

জন্য চেষ্টা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ভুক্তি (ভোগ) অপেক্ষা মুক্তি দুর্ল্লভ, যেহেতু ভক্তি পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-প্রভৃতি সর্ব্ববিধ যোনিতেই সম্ভব, কিন্তু মুক্তি মনুষ্যদেহ ভিন্ন আর কোনও দেহে সম্ভবে না।

ভক্তিতেই সেই মুক্তি ফলিয়া থাকে। ভগবান্ স্বয়ং উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—

ইমং লোকং তথৈবামু-মাত্মান-মুভযায়িনম্।
আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ।
বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেকং বিশ্বতোমুখম্।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যো-রতিপারয়ে॥

ইহলোক, পরলোক, এবং সেই উভয়লোকে গমনকারী জীবোপাধি আত্মার অনুগত ধন জন পশু গৃহ—এই সমস্ত এবং অপর সমুদায়কেই পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল আমাকেই ঐকান্তিক ভক্তিতে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া থাকি।

সেই ভক্তির সহজ উপায় হরিনাম। নামেই ভক্তি হইয়া থাকে। যথা—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

(ভাগবত)

ভগবানের নাম উচ্চারণে তাঁহার প্রতি যে ভক্তিসঞ্চার হয়, ইহলোকে তাহাই মানবের পরম ধর্ম্ম।

ভগবান্‌ও স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্॥

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
ইত্যাদি।

হে নিষ্পাপ উদ্ধব, আমি তোমাকে ভক্তিযোগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তুমি তাহাতে প্রীত হইয়াছ বলিয়া, যে যে কারণে ভক্তিসঞ্চার হয়, তাহা এক্ষণে তোমার নিকট বলিব। আমার অমৃতময় কথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার নাম উচ্চারণ, আমার পূজায় আস্থা, স্তুতি দ্বারা আমার স্তব করা ইত্যাদি কারণে আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

হরিনামের যে পাপক্ষয়কারিণী শক্তি আছে, তাহা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করা গিয়াছে। মনের মালিন্যকেই পাপ বলে। মন বিষয়ে আসক্ত হইলে "অহং মম" (আমি ও আমার) এই অভিমান জন্মে, সেই অভিমানে যে কাম-ক্রোধাদি উৎপন্ন হয়, তাহাই মনের মালিন্য; নামের গুণে মন নির্ম্মল হয়, অর্থাৎ বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, কাম-ক্রোধাদি-পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু মন একটা কিছু অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না, ইহা তাহার স্বভাব। সুতরাং এই অনিত্য বিষয় সকল পরিত্যাগ করিলে, সে নিত্য বিষয়—হরিতেই আসক্ত হইবে। সেই আসক্তির নামই ভক্তি। সুতরাং নামে যে ভক্তি হয়, তাহা শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তি দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

অতএব যাঁহারা হরিভক্তির অভিলাষী, তাঁহারা আর কিছু করিতে না পারিলেও, সর্ব্বদা কেবল হরিনাম উচ্চারণ করুন। নামের গুণেই ভক্তি পাইবেন।

নামে মুক্তি।

যমরাজ নিজ কিঙ্করগণকে বলিয়াছিলেন—

নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্যত পুত্রকাঃ।
অজামিলোঽপি যেনৈব মৃত্যুপাশা-দমুচ্যত॥

হে বৎসগণ, হরিনামের মাহাত্ম্য দেখ। যে নামের গুণে মহাপাপী অজামিলও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইল।

এতাবতাল-মঘনির্হরণায় পুংসাং,
সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্॥

ভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নাম সংকীর্ত্তন অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিবারও প্রয়োজন নাই; যেমন-তেমন করিয়া একবার করিলেই হয়। এবং ঐ উচ্চারণের ফল যে কেবল পাপক্ষয়, তাহাও নহে; উহাতে মুক্তি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। দেখ, অজামিল মহাপাপী হইয়াও, মৃত্যুকালে একবার নারায়ণ বলিয়া ডাকিয়া মুক্তিলাভ করিল।

মৃত্যুকালে সকল ইন্দ্রিয়ই অবসন্ন হয়। সুতরাং অজামিলের জিহ্বা তখন অবশ হইয়া আসিয়াছিল। জিহ্বা অবশ হইলে স্পষ্টরূপে কোনও বাক্য উচ্চারণ করা যায় না। অজামিল সেই অবশ জিহ্বায় অস্পষ্টরূপে একবার নারায়ণ বলিয়া ডাকিয়াছিল। তাহাও হরিকে মনে করিয়া নহে। তাহার কনিষ্ঠপুত্রের নাম ছিল নারায়ণ; তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত বলিয়া, মৃত্যুকালে তাহাকেই মনে করিয়া ডাকিয়াছিল। কিন্তু নামের এমনই মহিমা যে, তাহাতেই তাহার মুক্তি হইল!!

নামের গুণে নিত্য বিষয় হরিতেই যে মন আসক্ত হয়, তাহা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করা গিয়াছে। এখন—

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্॥

স্নেহবশতই হউক, দ্বেষবশতই হউক অথবা ভয়বশতই হউক, যে জীব যে যে বস্তুতে একাগ্রভাবে মন সমর্পণ করে, সে সেই সেই বস্তুর সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—

কীটং পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপ-মসংত্যজন্॥

পেশস্কার (কাঁচ পোকা) তৈলপায়ী কীটকে (আর্সুলাকে) ধরিয়া নিজ গর্ত্তে প্রবিষ্ট করিয়া রাখে। সেই কীট তখন ভয়বশতঃ একাগ্র মনে পেশস্কারকে ভাবিয়া, পূর্ব্বদেহ ত্যাগ না করিয়াই, সে তাহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঠিক তাহার মত আকার ধারণ করে।

সেইরূপ শ্রীহরিতে মনকে একাগ্র করিয়া আসক্ত রাখিলে, জীবও তন্ময় হইয়া যায়। ইহাকেই সারূপ্য-মুক্তি বলে। তৈলপায়ীর ন্যায়, জীব সৌভাগ্যক্রমে যখন এই দেহেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, তখন এ দেহ ত্যাগ করিয়া সে মুক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

তাই স্মৃতিও বলিয়াছেন,—

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরি-রিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥

'হরি' এই দুইটি অক্ষর যে ব্যক্তি একবার উচ্চারণ করে, সে মোক্ষ-পদে যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

শাস্ত্রান্তরেও উক্ত আছে —

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্ম্মৃগৈরিব॥

অবশ ভাবেও হরিনাম উচ্চারণ করিলে, সিংহের ভয়ে যেমন মৃগগণ পলায়ন করে, সেইরূপ সকল পাপ তৎক্ষণাৎ দূরে পলায়ন করে। পাপমুক্ত হইলেই ভক্তি দ্বারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

ভীষ্ম বলিয়াছিলেন—

ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্ত্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কাম-কর্ম্মভিঃ॥

ভগবানে ভক্তিপূর্ব্বক মন নিবিষ্ট করিয়া তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলে সকল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

ভগবান্‌ও স্বয়ং গোপীগণকে বলিয়াছিলেন—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাম্ অমৃতত্বায় কল্পতে॥

আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহাই জীবগণের মুক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

হরিনামের এরূপ মহিমা থাকিতেও মনুপ্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ পাপ-ক্ষয়ের জন্য চান্দ্রায়ণাদি বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, যেমন এক সিংহ হইতেই সকল পশুগণের বধ সাধিত হইতে পারিলেও, লোকে শৃগাল-কুক্কুরাদির বিনাশের জন্য দণ্ডপ্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। কারণ, সিংহকে সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না, এবং কেহ পারিলেও, এরূপ তুচ্ছ কার্য্যে সিংহকে নিযুক্ত করিলে, সিংহের অপমান করা হয়। সেইরূপ, হতভাগ্য লোকদিগের হরিনামে প্রবৃত্তি হয় না জানিয়া, সুকর কার্য্যে অনেকের শ্রদ্ধা হইবে না ভাবিয়া, এবং যে হরি-নামে মুক্তি সাধিত হইয়া থাকে, সেই হরিনামকে পাপক্ষয়রূপ তুচ্ছকার্য্যে নিয়োজিত করিলে তাহার অপমান করা হইবে মনে করিয়াই, শাস্ত্রকারগণ

বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, হরিনামেই সর্ব্ব-পাপ-ক্ষয় হয়, হরিনামেই ভক্তিসঞ্চার হয়, এবং হরিনামেই মোক্ষলাভ হয়, ইহা শাস্ত্রেরই উক্তি ; অতএব ইহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

নামই ভবের তরী।

এই সংসার মহানদী-স্বরূপ। নদীতে যেমন তরঙ্গ উঠে, এ সংসার-নদীতেও সেইরূপ শোক-দুঃখের তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। নদীর ন্যায় ইহাতে কামাদি-রিপুরূপ ভীষণ কুম্ভীর সকল আস্ফালন করিতেছে, কালের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, এবং মায়ার আবর্ত্ত (পাক্‌না) ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে।

কোনও ব্যক্তি যদি দৈবদুর্ঘটনায় নদীতে পতিত হয় এবং তাহার সন্তরণবিদ্যা না থাকে, তবে সে আর উঠিতে পারে না ; ক্রমশই তাহাকে তলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু সে যদি কোনও ভেলা পাইয়া তাহা বুকে দেয়, তাহা হইলে আর ডুবিয়া যায় না, ভাসিতেই থাকে ; এবং তাহাতে দৈব অনুকূল হইলে, ভাসিয়া ভাসিয়া কখনও কূলে গিয়াও উঠিতে পারে।

আমরাও প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে এই সুবিস্তীর্ণ ভবনদীতে পতিত হই-য়াছি। আমাদের সন্তরণবিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান নাই ; সুতরাং আমরা ইহাতে হাবুডুবু খাইতেছি, ক্রমশই তলিয়া যাইতেছি। এ নদী হইতে উদ্ধার পাইবার আর উপায় নাই ; উপায় কেবল হরিনামের ভেলা। যে নামের বলে সেতুবন্ধ কালে সাগর-জলে পাষাণ ভাসিয়াছিল, যে নামের বলে বালক প্রহ্লাদ সহস্র-যোজন-বিস্তীর্ণ পর্ব্বতচয়ে আচ্ছন্ন হইয়াও সিন্ধুনীরে ভাসমান হইয়াছিল, সেই নাম-রূপ ভেলা হৃদয়ে ধারণ করিলে, আমরা কিছুতেই এ ভব-নদীতে তলিয়া যাইব না, ভাসিতেই থাকিব। যত

তরঙ্গই উঠুক, যত স্রোতই বহুক, যত পাক্‌নাই ঘুরুক, আমরা সে সকলের উপর-উপরই থাকিব, কিছুতেই ডুবিব না। তাহার উপর যদি দৈব অনুকূল হয়, তাহা হইলে একদিন না একদিন কূলে ঠেকিব, তীরে উঠিব, পারে গিয়া পৌছিব। তাই, অক্রূর যখন কংসপ্রেরণায় কৃষ্ণকে আনিতে বৃন্দাবনে যান, তখন বলিয়াছিলেন—

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন॥

(কৃষ্ণদর্শন আমার ঘটিবে কি না ?)—এরূপ [illegible] করিব না। আমি অধম হইলেও, কৃষ্ণদর্শন আমার হইলেও হইতে পারিবে। যেমন নদীতে যে সকল তৃণ ভাসিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কোনওটা কখন তীরে গিয়াও ঠেকে, সেইরূপ এই কালরূপ-নদীস্রোতে যে সকল জীব ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কখনও কৃষ্ণদর্শন লাভ করিয়া পারে যাইলেও যাইতে পারে।

তবে একটা কথা আছে,—ভেলা বুকে দিয়া ভাসিলে জলে ডুবিয়া যাইতে হয় না বটে ; কিন্তু কুম্ভীরে ত আক্রমণ করিতে পারে ? তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি ?

তাই বলি,—ভাবনা নাই, উপায় আছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ-শ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো-ঽভিন্নাত্মা নাম-নামিনোঃ॥

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

নাম ও নামী (যাঁহার নাম তিনি), উভয়েই অভিন্ন। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম একই বস্তু। উভয়ই চিন্তা করিবার উৎকৃষ্ট বিষয়, উভয়ই চিদ্‌ঘন-মূর্ত্তি, উভয়ই পূর্ণ, উভয়ই নির্ম্মল, এবং উভয়ই নিত্যমুক্ত।

এখন, হরি ও হরিনামে যদি কোনও ভেদ না থাকে,—যিনি হরি,

তিনিই যদি হরিনাম হন, তাহা হইলে হরির ন্যায় হরিনামেরও আকার-প্রকার ও বসন-ভূষণ স্বীকার করিতে হইবে। তবে আর কুম্ভীরের ভয় কি? প্রসিদ্ধি আছে—হরিদ্রাবর্ণে কুম্ভীর ভয় পাইয়া থাকে। যে নদীতে কুম্ভীর বাস করে, সেই নদী হাঁটিয়া পার হইতে হইলে, লোকে হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র—পীতবসন—পরিধান করিয়া যায়। অতএব সেই পীতাম্বর-ধারী শ্রীহরির পীতাম্বর নাম আমাদের হৃদয়ে বদ্ধ থাকিলে, কামাদি কুম্ভীরগণ দূরে পলায়ন করিবে, কখনই আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। আমরা নির্ভয়ে এই ভবনদীতে ভাসিতে ভাসিতে শোক-দুঃখের তরঙ্গাদি অতিক্রম করিয়া হাসিতে হাসিতে, অনায়াসে পার হইয়া যাইব।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, নামের গুণে চিত্তশুদ্ধি হয়। নির্ম্মল পদ্মপত্রে যেমন জল লাগিতে পারে না, সেইরূপ নির্ম্মল চিত্তে কাম-ক্রোধাদি থাকিতে পায় না। হরিনামেই যদি কায় মন ও বাক্য নিরন্তর আসক্ত রাখা যায়, অর্থাৎ করে হরিনাম জপ, মনে হরিনাম চিন্তা এবং বাক্যে হরিনাম উচ্চারণ সর্ব্বদা করা যায়, তাহা হইলে হরিপদে মতি জন্মে, ভক্তির উদ্রেক হয়, সংসারবৈরাগ্য ঘটে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়; সুতরাং ভববন্ধন হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। অতএব "নামই ভবের তরী" ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রার্থনা ।

বিষয়-বিষবিলিপ্ত-স্বস্তনং পায়য়িত্বা
বিশসতি তব মায়া-পূতনা মাং সুবেশা ।
শরণমুপগতোঽহং সাম্প্রতং শঙ্কিতস্ত্বাম্
অব ভবধব দীনং পূতনারে হরে মাম্ ॥

হে হরি, তোমার মায়া পূতনা-রাক্ষসী,
নানা বেশ-ভূষা করি হইয়া রূপসী,
বিষয়স্বরূপ বিষলিপ্ত স্বীয় স্তন
পান করাইয়া মোর বধিছে জীবন ।
পূতনান্তকারী তুমি ক'রেছি শ্রবণ,
তাই এবে লইলাম তোমার শরণ ।
ওহে ভবপতি, ভয় পাইয়াছি মনে,
রক্ষা কর আজি এই দীনহীন জনে ॥

সংকীর্ত্তন ।

জয় যদুনন্দন, ত্রিলোক-বন্দন
মধু-মুর-মর্দ্দন মাধব হে ।
জয় কমলাসন, দিতিসুত-শাসন
শরণাগত-জন-বান্ধব হে ॥
জয় জন-রঞ্জন, রবিসুত-গঞ্জন,
ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ হে ।

(জয়) অনঙ্গ-মোহন, বিহঙ্গ-বাহন,
ত্রিভঙ্গ-বিগ্রহ-ধারণ হে॥
কেশি-নিসূদন, বিপিন-বিনোদন,
মুরলী-বাদন-মোহন হে।
(জয়) সরসিজ-লোচন, ব্রজযুবতী-জন-
মানস-মধুকর-লোভন হে॥
পীত-বসন-ধর, নটবর সুন্দর,
রাস-রসিক বর-তাণ্ডব হে।
(জয়) বর্হ-বিকস্বর বদন-সুধাকর,
প্রেমনিধে প্রিয়-পাণ্ডব হে॥
ব্রজপতি-বালক, ত্রিভুবন-পালক,
ধৃত-বনমালক চারু-গলে।
(জয়) কম-কমলাঙ্কিত, কমলজ-বাঞ্ছিত-
কমলা-লালিত-পাদতলে॥
পুরুষ-ভূষণ, সজ্জন-তোষণ,
চারু-সুদর্শনচক্র করে।
(জয়) কাল-কলেবর, কাল-ভয়াতুর-
মচ্যুত মামিহ পাহি হরে॥
জয় জয় জয় জয় নাথ হরে।
জয় জয় জয় জয় নাথ হরে॥

এক রাজার গল্প

এক রাজার রাজ্যে এক সময় দস্যুগণের উপদ্রব হইয়াছিল। রাজা তাহাদিগের দমন করিবার জন্য একখানি সুন্দর রথে আরোহণ করিলেন। তাহাতে পাঁচটি অশ্ব সংযোজিত। অশ্বগুলি একটি রশ্মি (রাশ) দ্বারা সংযত। সারথি সেই রশ্মি ধারণ করিয়া রথ-চালনায় প্রবৃত্ত। কিন্তু অশ্বগুলা এতই বলবান্, এতই উদ্ধত ও এমনই দুর্দ্দান্ত, এবং সারথিরও কর্ত্তব্য কর্ম্মে এমনই শৈথিল্য যে, সে তাহাদিগকে আয়ত্ত রাখিতে পারিল না; রশ্মি-সংযমেও সমর্থ হইল না। অশ্বেরাই সেই রশ্মি আকর্ষণ করিয়া আপন আপন ইচ্ছার বশে গমন করিতে লাগিল; পাঁচটা অশ্ব পাঁচটা রথে ধাবিত হইল। এইরূপে পরস্পরের বিভিন্ন দিকে গমন করা বশতঃ মহা-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। অশ্বখুরাঘাতে ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া সকলকে আবৃত করিল এবং ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। তখন রথ বিপথে গিয়া পড়িল; দস্যুরা আসিয়া রাজাকে আক্রমণ করিল, এবং রথখানা টানিয়া একটা নালায় ফেলিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল।

এইরূপে রথ নর্দ্দমায় পড়িল, ঘোঁড়া খোঁড়া হইল, রাশ ছিঁড়িল, সারথির কোমর ভাঙ্গিল, রাজা পাঁক মাখিয়া এক অদ্ভুত ভূত সাজিয়া বসিলেন। তাঁহার দস্যুদমন সম্পূর্ণ হইল। রথারোহণের সাধ মিটিল। যেমন কর্ম্ম, তার উপযুক্ত ফল ফলিল।

রাজার এই গল্প শুনিয়া আমাদের হাসি পাইতেছে। ইহাকেই বলে —"ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে"। আমরা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমরাও সেই রাজার মত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; আমা-দেরও একদিন ঐরূপ অবস্থা ঘটিবে।

ভাবিয়া দেখুন,—আমাদের এই যে আত্মা, ইনিও রাজা। কেননা,

ইনি জগতের রাজা সেই শ্রীহরির অংশ। আমাদের এই আত্মাও একখানি রথে আরোহণ করিয়াছেন।

আহুঃ শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি
হয়ানভীষূন্ মন ইন্দ্রিয়েশম্।
বর্ত্মানি মাত্রা ধিষণঞ্চ সূতং
সত্ত্বং বৃহদ্বন্ধুর-মীশসৃষ্টম্॥

(ভাগবত)

এই মানবদেহই সেই রথ; পাঁচটি ইন্দ্রিয় ইহার অশ্ব; মন তাহাদের রশ্মি, যেহেতু মনের বশেই ইন্দ্রিয় সকল পরিচালিত হয়। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ—এই পাঁচটি পথ। বুদ্ধি সেই রথের সারথি এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত চৈতন্যই সে রথের বন্ধন।

বুদ্ধি-সারথি সেই মনোময় রশ্মি আকর্ষণ করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত বলবান্, তাহারা বুদ্ধির বশে চলিতেছে না, আপন আপন ইচ্ছানুসারে মনকে আকর্ষণ করিয়া নানাবিষয়ে ধাবিত হইতেছে—নাসিকা গন্ধ উপভোগ করিতে যাইতেছে, রসনা খাদ্যবস্তুর দিকে চলিতেছে, চক্ষু রূপের দিকে ছুটিতেছে, কর্ণ শব্দের দিকে ধাবমান হইতেছে।

অশিক্ষিতা বুদ্ধি তাহাদিগকে বারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না; মনকেও সংযত করিতে সমর্থ হইতেছে না। মন সেই ইন্দ্রিয়গণেরই অনুসরণ করিতেছে, এবং রথী সারথি-প্রভৃতি সকলই রজঃ ও তমোগুণে আবৃত হইতেছে।

শেষে এই দেহরথ ঘোর-অন্ধকারময় সংসারকূপে পতিত হইবে, বুদ্ধি ও মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণও অবসন্ন হইবে, আমাদের আত্মাকেও নরকে নিমগ্ন হইতে হইবে।

রথী যদি সারথিপ্রভৃতিকে আত্মবশে রাখিতে পারেন, যদি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে পারেন, তবেই তিনি সুপথে রথ চালাইতে পারিবেন, তবেই তিনি আপনাকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন ;—

নো চেৎ প্রমত্ত-মসদিন্দ্রিয়-বাজি-সূতা
নীত্বোৎপথং বিষয়দস্যুষু নিক্ষিপন্তি।
তে দস্যবঃ স-হয়সূত-মমুং তমোঽন্ধে
সংসার-কূপ উরুমৃত্যুভয়ে ক্ষিপন্তি ॥

(ভাগবত)

নতুবা, এই দুষ্ট ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ ও অশিক্ষিত বুদ্ধিরূপ সারথি তাঁহাকে বিপথে লইয়া বিষয়রূপ দস্যুগণের হস্তে অর্পণ করিবে, এবং সেই দস্যুরা অশ্ব ও সারথির সহিত তাঁহাকে তমোময় সংসারকূপে নিক্ষেপ করিবে ; সেখানে তাঁহাকে ভীষণ মৃত্যুর হস্তে পতিত হইতে হইবে।

অশ্বগণকে রীতিমত চালাইতে জানিলে, তাহারা চালকেরই বশে চলে ; নিজের ইচ্ছায় কোনও দিকে যাইতে সমর্থ হয় না। রথীরও বিশিষ্টরূপ প্রভুত্ব থাকিলে সারথি তাঁহার অবাধ্য হইতে ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে শিথিল হইতে পারে না। যিনি সারথ্যকার্য্যে সুদক্ষ, তাঁহার নিকট এ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। যিনি সকল সারথিগণের শ্রেষ্ঠ, যাঁহার সারথ্যগুণে ভীষণ কুরুক্ষেত্র-রণে পাণ্ডবগণ প্রবল রিপুদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল-সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥

(গীতা)

যাহাদের মন অনেক দিকে ধাবিত, যাহারা বিষয়-ভোগে আসক্ত, তাহারা মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়া অপবিত্র নরকে পতিত হয়।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য-স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

(গীতা)

হে মহাবাহো, সেই হেতু যে ব্যক্তি সকল ইন্দ্রিয়কে তাহাদের ভোগ্য বস্তু হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতে পারে, তাহার বুদ্ধিই প্রশংসনীয়।

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।
হৃদয়জ্ঞত্ব-মন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্ব্বতো মুহুঃ॥

(ভাগবত)

যেমন দুর্দ্দান্ত অশ্বকে দমন করিতে হইলে, তাহার অভিপ্রায়-অনুসারে অগ্রে কিয়দ্দূর গমন করিতে হয়, কিন্তু রশ্মি দ্বারা তাহাকে ধারণ করিয়াই রাখিতে হয়, এবং কশাঘাতে তাহাকে তাহার গন্তব্য পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে স্ববশে রাখিতে হইলে, মনোরূপ রশ্মিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া, কিছুকাল তাহাদিগকে ভোগ্যবস্তুতে আসক্ত রাখিবে এবং সতত বৈরাগ্যরূপ কশাঘাতে সেই সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করাইবারই চেষ্টা করিবে। ইহাই হইতেছে ইন্দ্রিয়দমনের ও চিত্তসংযমের শ্রেষ্ঠ উপায়।

হরিনামের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি।

হরিনামের উৎপত্তির বিবরণ দুই প্রকার।—

(১) প্রতিসৃষ্টিতে চতুর্দ্দশ মনু হন। মনুগণের অধিকারকালকে মন্বন্তর বলে। মনুষ্য-পরিমাণের সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি —এই চারি-

যুগে দেব-পরিমাণের এক যুগ হয়। সেই দেব-পরিমাণের ৭১ যুগই এক এক মন্বন্তরের পরিমাণ। মন্বন্তরের ছয়টি অঙ্গ। যথা—

মন্বন্তরং মনুদেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ।
ঋষয়োঽংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্বিধ মুচ্যতে॥

মনু, মনুপুত্র, দেবতা, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি ও ভগবানের অবতার। প্রতি মন্বন্তরেই পৃথক্ পৃথক্ মনু ও মনুপুত্রাদি হইয়া থাকেন।

প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব শতরূপা-নাম্নী পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র ও তিন কন্যা উৎপাদন করেন। পুত্রদ্বয়ের নাম—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ: এবং কন্যাত্রয়ের নাম—আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু রুচিনামক প্রজাপতিকে আকূতিনাম্নী কন্যা, কর্দ্দম প্রজাপতিকে দেবহূতি, এবং দক্ষ প্রজাপতিকে প্রসূতি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র সত্ত্বেও তিনি বহুপুত্র-কামনায়, শতরূপার সম্মতিক্রমে রুচি প্রজাপতিকে এই নিয়মে কন্যা সম্প্রদান করেন যে, ঐ কন্যার গর্ভে প্রথম যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র তাঁহারই হইবে, অর্থাৎ সেই দৌহিত্র দ্বারাও তাঁহার সমুদায় পুত্রকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে। এইরূপ নিয়মে কন্যাসম্প্রদানকে পুত্রিকাধর্ম্ম বলে। পরে রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথমটি পুত্র; তাঁহার নাম যজ্ঞ। এবং দ্বিতীয়টি কন্যা, তাঁহার নাম দক্ষিণা। স্বায়ম্ভুব মনু নিয়মানুসারে পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন। যথা সময়ে ঐ পুত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইল। যদিও তাঁহারা উভয়ে একগর্ভ-জাত, তথাপি যজ্ঞ —বিষ্ণুর অবতার, এবং দক্ষিণা—লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া তাঁহাদের বিবাহ দোষাবহ হয় নাই। পরে যজ্ঞের ঔরসে দক্ষিণার গর্ভে তোষ-প্রভৃতি দ্বাদশটি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। সেই পতি পত্নী উভয়ে পরস্পরের প্রতি তুষ্ট থাকিয়া ঐ সকল পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের

সাধারণ নাম—তুষিত ; এবং যম অর্থাৎ যমজ স্ত্রী-পুরুষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহারা যাম ও সুযম নামেও অভিহিত হইয়াছিলেন।

স্বায়ম্ভুব মনু শেষে সংসারে বিরক্ত হইয়া, রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যা করিবার জন্য পত্নীর সহিত বনে গমন করিলেন, এবং এরূপ কঠোর তপস্যায় রত হইলেন যে, শতবর্ষ কাল এক পায়ে দাঁড়াইয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় অসুর ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ যজ্ঞ, তুষিত-সংজ্ঞক পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া আসিয়া, তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া, স্বর্গরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অতএব প্রথম মন্বন্তরে মনু—স্বায়ম্ভুব, মনুপুত্র—প্রিয়ব্রত ও উত্তান-পাদ, দেবতা—তুষিতগণ, সপ্তর্ষি—মরীচি প্রভৃতি, অবতার—যজ্ঞ। ইন্দ্রও সেই যজ্ঞ। ইন্দ্রত্ব-কালে ত্রিভুবনের ক্লেশহরণ করায়, স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁহার 'হরি' এই নাম রক্ষা করিয়াছিলেন।

(২) আবার চতুর্থ মন্বন্তরেও হরিনামে ভগবানের অবতার হয়। যথা—

তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ।
হরি-রিত্যাহৃতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রহাৎ॥

(ভাগবত)

তাহাতেও (অর্থাৎ চতুর্থ মন্বন্তরেও) হরিমেধো-নামক মুনির ঔরসে তদীয় পত্নী হরিণীর গর্ভে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভক্তের ক্লেশ হরণ করার জন্য সেই অবতারে তিনি হরিনামে আখ্যাত হন, এবং কুম্ভীরের আক্রমণ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন।

হৃ ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় করিয়া হরিশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। হরি শব্দের ব্যুৎপত্তি অনেক প্রকার।—

(১) যিনি পাপ হরণ করেন, তিনি হরি। যথা—

হরিহর্রতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥

(বিষ্ণুধর্ম্ম)

ইচ্ছাতেই হউক বা অনিচ্ছাতেই হউক, অগ্নিকে স্পর্শ করিলে সে যেমন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ দুষ্টচিত্ত অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিহীন হইয়াও যাহারা হরিকে স্মরণ করে, হরি তাহাদের পাপ হরণ করিয়া থাকেন।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

(ভাগবত)

যিনি অনন্যভাবে হরি-পাদপদ্ম ভজনা করেন, তিনি হরির প্রিয় হন, এবং কখনই তাঁহার পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না। তথাপি অনবধানতা বশতঃ যদি তিনি কখনও কোনও পাপ কর্ম্ম করিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাহা নিঃশেষে হরণ করিয়া থাকেন।

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণং।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥

(শুকদেব স্তব করিয়া বলিতেছেন—) যাঁহাকে কীর্ত্তন করিলে, যাঁহাকে স্মরণ করিলে, যাঁহাকে দর্শন করিলে, যাঁহাকে প্রণাম করিলে, যাঁহাকে শ্রবণ করিলে, যাঁহাকে পূজা করিলে, তৎক্ষণাৎ লোকের পাপনাশ হয়, সেই পুণ্যশ্লোক হরিকে প্রণাম করি।

(২) যিনি তাপ হরণ করেন, তিনি হরি। যথা—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

(ভাগবত)।

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ মহামুনি (অর্থাৎ নারায়ণ) কর্ত্তৃক কৃত (অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মার নিকট সংক্ষেপে উক্ত) হইয়াছিল। ইহাতে সেই ধর্ম্ম বর্ণিত আছে, যাহাতে ফলাভিসন্ধিরূপ কোনও কপটভাব নাই এবং যাহা মাৎসর্য্যশূন্য অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন সাধুগণেরই ধর্ম্ম। এবং ইহাতে সেই সত্যবস্তু হরির তত্ত্ব জানা যায়,—যিনি মঙ্গলপ্রদ ও ত্রিতাপনাশকারী। অন্য শাস্ত্র কিংবা তদুক্ত সাধন দ্বারা সেই পরমেশ্বর হরিকে সহজে হৃদয়ে স্থির করা যায় না; কিন্তু যে সকল পুণ্যবান্ ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুকও হন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ শ্রবণেচ্ছামাত্রেই হরিকে হৃদয়ে স্থির করিয়া রাখিতে পারেন।

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গ তাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিতমতা-মখিলার্থলাভং,
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্ত-মপত্রপং মে॥

(বিবাহের পূর্ব্বে রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন—) হে ভুবনসুন্দর! হে অচ্যুত! তোমার যে গুণ শ্রোতাদিগের কর্ণকুহর দিয়া প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের তাপ হরণ করে, এবং তোমার যে রূপ দ্রষ্টাদিগের চক্ষুর সর্ব্ববিধ সফলতা সম্পাদন করিয়া থাকে, সেই গুণ ও রূপ শ্রবণ করিয়া আমার মন, লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক, তোমাতে আসক্ত হইয়াছে।

(৩) যিনি সর্ব্ববিধ জনের মন হরণ করেন, তিনি হরি।

উল্লিখিত রুক্মিণীর পত্রেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আরও—

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্,
যামঃ কথং ব্রজমহো করবাম কিংবা ॥

(রাসারম্ভে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে [illegible])—হে কৃষ্ণ, আমাদের যে মন সংসারে আসক্ত ছিল এবং যে করযুগল গৃহকর্ম্মে রত ছিল, তাহা তুমি অনায়াসে হরণ করিয়াছ। তোমার চরণ-সন্নিধান হইতে আমাদের চরণ এক পাও চলিতেছে না। আমরা কিরূপে ব্রজে ফিরিয়া যাইব এবং গিয়াই বা কি করিব?

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোক-লীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥

(শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট বলিয়াছিলেন) —হে রাজর্ষে, আমি নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় নিত্য নিরত হইলেও হরিলীলায় আমার মন এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, আমি সমগ্র ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছি।

তাই সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন—

যাঁহারা আত্মারাম অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; যাঁহারা নির্গ্রন্থ অর্থাৎ শাস্ত্রগ্রন্থের বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিয়াছেন, অথবা যাঁহাদের চিৎ-জড়ের গ্রন্থি (দেহাভিমান) নষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ মুনিগণও হরির প্রতি নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন। (ভক্তির ফল বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের ফল জ্ঞান, জ্ঞানের ফল মুক্তি; অতএব তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াও—জীবন্মুক্ত হইয়াও যে আবার হরিভক্তিতে রত হন, তাহার কারণ—)

হরির গুণই এই যে তিনি সকলের মন হরণ করিয়া থাকেন (সেই জন্যই তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া কেহ থাকিতে পারেন না)।

(৪) যিনি আর্ত্তি (ক্লেশ) হরণ করেন, তিনি হরি। যথা—

জাতো রুচে-রজনয়ৎ সুযমান্ সুযজ্ঞ
আকূতিসূনু-রমরানথ দক্ষিণায়াম্।
লোকত্রয়স্য মহতী-মহরদ্ যদার্ত্তিং
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনূক্তঃ॥

(ব্রহ্মা নারদের নিকট ভগবানের অবতার কথা বলিতেছিলেন—) তিনি রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে যজ্ঞনামে জন্মগ্রহণ করিয়া, দক্ষিণার গর্ভে সুযমনামক দেবগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। পরে তিনিই যখন ইন্দ্র হইয়া ত্রিভুবনের আর্ত্তি হরণ করিলেন, তখন তাঁহার মাতামহ স্বায়ম্ভুব মনু, (প্রথমে যজ্ঞ নাম হইলেও) শেষে 'হরি' এই নামে, তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছিলেন।

অন্তঃপয়স্যুরুবলেন পদে গৃহীতো
গ্রাহেণ-যূথপতি-রম্বুজহস্ত আর্ত্তঃ।
আহেদ-মাদিপুরুষাখিল-লোকনাথ
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল-নামধেয়॥
শ্রুত্বা হরিস্ত-মরণার্থিন-মপ্রমেয়-
শ্চক্রায়ুধঃ পতগরাজ-ভুজাধিরূঢ়ঃ।
চক্রেণ নক্রবদনং বিনিপাট্য তস্মাৎ
হস্তে প্রগৃহ্য ভগবান্ কৃপয়োজ্জহার॥

(হরি-অবতারের কথা বলিতেছেন—) জলমধ্যে যখন মহাবল গ্রাহ (কুম্ভীর) পদে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন গজরাজ হস্তে (শুণ্ডে) পদ্ম

লইয়া, আৰ্ত্ত (কাতর) হইয়া—"হে আদিপুরুষ! হে অখিললোকনাথ! হে তীর্থশ্রবঃ (পুণ্যশ্লোক)! হে মঙ্গলময়-নামধেয়! (যাঁহার নাম শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়)" এই বলিয়া ডাকিয়াছিল! অপ্রমেয়াত্মা চক্রধারী ভগবান্ হরি শুনিয়াই, সেই গজরাজকে শরণার্থী বুঝিয়া, পক্ষিরাজ গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক আসিয়া, চক্র দ্বারা নক্রের বদন বিদীর্ণ করিয়া, কৃপাবশতঃ শুণ্ডে ধরিয়া, তাহাকে সেই নক্রবদন হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত॥

(প্রহ্লাদ বলিতেছেন—) হে দেব, হে শরণাগত জনের আর্ত্তিহারিন্, হে কেশব, আমার প্রতি দয়া কর। হে অচ্যুত, আর একবার দেখা দিয়া আমাকে পবিত্র কর।

(৫) যিনি পুনর্জ্জন্ম হরণ করেন, তিনি হরি। যথা—

আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

(ভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন, আব্রহ্মস্তম্ব সকলকেই পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু হে কৌন্তেয়, যাহারা আমার শরণাপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না।

(৬) যিনি ভূভার হরণ করেন, তিনি হরি। যথা—

ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা নোদিতা বয়ম্।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে॥

(সুরভি কৃষ্ণকে বলিতেছেন—) ব্রহ্মার আদেশে আজ আমরা তোমাকে আমাদের ইন্দ্র (রাজা) করিবার জন্য অভিষিক্ত করিব। হে বিশ্বাত্মন্, তুমি পৃথিবীর ভারগ্রহণের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছ।

(৭) যিনি ভক্তকে হরণ করেন, অর্থাৎ স্বধামে লইয়া যান, তিনি হরি। যথা—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

মৃত্যুকালে পুত্রের নামে হরির নাম উচ্চারণ করিয়া অজামিলও যখন তাঁহার ধামে গমন করিয়াছিল, তখন যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম উচ্চারণ করেন, তিনি যে সেথায় গমন করিবেন, তাহা আর বলিতে হয় কি? (অন্তকালে আপন দূতগণ দ্বারা ভগবান্ অজামিলকে স্বধামে লইয়া-গিয়াছিলেন)।

কপাটী খেলা।

হিন্দুগণ এমনই ধর্ম্মপ্রাণ যে, তাঁহাদের আহার-বিহারাদি যাবতীয় কার্য্যেই ধর্ম্মভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা এমন কার্য্যই করেন না, যাহাতে ধর্ম্মের আভাস নাই। অধিক কি, তাঁহারা সকল ক্রীড়া-কৌতুকের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহারও অন্তরে সেই ধর্ম্মভাব নিহিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে আজ একটি বালক্রীড়ার উল্লেখ করিতেছি।

বালকেরা একপ্রকার খেলা খেলিয়া থাকে, তাহাকে "কপাটী খেলা" বা "কপটি-খেলা" বলে। কপট বেশে ঐ খেলা খেলিতে হয় বলিয়া উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। ঐ খেলায় ভূখণ্ডে রেখা করিয়া দুইটি ঘর বা "কোর্ট" করিয়া থাকে। উভয়কোর্টেই কতকগুলি করিয়া বালক দাঁড়ায়। প্রথম কোর্টের বালকেরা "দম" লইয়া অর্থাৎ শ্বাসরোধ করিয়া দ্বিতীয় কোর্টে প্রবেশ করে। তখন দ্বিতীয় কোর্টের বালকেরা তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকে।

তাহারাও দম থাকিতে থাকিতে কোটে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করে। কেহ বা কৃতকার্য্য হয়, কেহ বা দম ছাড়িয়া সেই দ্বিতীয় কোটের বালকগণের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় কোটের বালকেরাও আবার ঐরূপ ভাবে প্রথম কোটে প্রবিষ্ট হইয়া, কখনও দম থাকিতে নিজকোটে ফিরিয়া যায়, কখন বা বেদম হইয়া প্রথম কোটের আয়ত্ত হয়।

এই খেলার মধ্যে যে কিরূপ ধর্ম্মভাব নিহিত রহিয়াছে,—সকল শাস্ত্রের সারতত্ত্ব খেলার ছলে কেমন সহজে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়!! যিনি এ খেলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে শত শত প্রণাম ও সাধুবাদ প্রদান করিলেও মনের তৃপ্তি হয় না।

ঐ প্রথম কোটকে জ্ঞানকোষ্ঠ বা জ্ঞানকোট এবং দ্বিতীয় কোটকে সংসারকোষ্ঠ বা সংসারকোট মনে করুন। জ্ঞানকোটের বালকেরা ধর্ম্ম, উপাসনা, যোগ, যাগ, তপস্যা, ভক্তি প্রভৃতি জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্ত সাধুগণের প্রতিরূপ; এবং সংসারকোটের বালকেরা সংসারপথে প্রবৃত্ত, কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের দাসভূত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র অসাধুগণের প্রতিরূপ।

এখন মনে করুন, কোনও সাধু দম লইয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া, কপট বেশে কদাচিৎ সংসারকোটে প্রবিষ্ট হইলেন অর্থাৎ সংসারীদিগের অবস্থা বুঝিবার জন্য আত্মভাব গোপন করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। অমনই সংসারীরা নানাছলে তাঁহাকে আপন দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; অর্থাৎ বিবিধ ভাবভঙ্গি প্রদর্শনাদি দ্বারা তাঁহার চিত্তাকর্ষণে যত্নবান্ হইল। তাহাতে কেহ জয়লাভ করিয়া, দম থাকিতে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন, আর কেহ হয় ত বেদম হইয়া তাহাদের দলে মিশিয়া গেলেন। সৌভরি প্রভৃতির উপাখ্যান তাহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। এই জন্যই প্রকৃত সাধুগণ কখনই সংসারীদিগের সংসর্গে আসিতে চাহেন না, তাহাদের ত্রিসীমায় থাকিতে ইচ্ছা করেন না।

আবার সংসারীদিগের মধ্যেও কেহ সাধুদিগের কোর্টে গেল। সে দম লইয়া অর্থাৎ স্ত্রী পুত্রাদিকে স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিয়াই কপটবেশে সাধুসঙ্গে মিশিল। সাধুগণও তাহাকে আয়ত্ত করিতে অর্থাৎ দয়াপরবশ হইয়া সদুপদেশ দ্বারা আপনাদের দলে মিশাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেও সে সকল উপদেশ ছাঁটিয়া আপনার কোর্টে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কারণ, সংসারীরা সহজে মমতা কাটাইয়া জ্ঞানমার্গে যাইতে ইচ্ছুক হয় না। এইরূপে কেহ হয় ত ফিরিয়া আসে, কেহ হয় ত সেই দলেই মিশিয়া যায়।

বালকদিগের পরস্পরের ভিন্ন কোর্টে বারংবার যাতায়াতে ও ধরাধরিতে কাহারও গায়ে আঁচড় লাগে, কখনও হাত-পাও ভাঙ্গে। যখন যে কোর্টে গিয়া যাহার হাত-পা ভাঙ্গে, তখন সেই কোর্টের বালকেরা তাহাকে আপনাদের অভিমত হাসপাতালে লইয়া যায়। সেইরূপ কোনও সাধু সংসারকোর্টে বারংবার যাতায়াত করিলে, সংসারীদিগের প্রলোভনে ও আকর্ষণে তাঁহার হৃদয়ে কখনও মোহের আঁচড়মাত্র লাগে, কখনও বা যোগসাধনাদিরূপ হাত-পাও একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। শেষ অবস্থায় তাঁহাকে সংসারীদিগের গন্তব্য নরকরূপ হাসপাতালে গিয়া থাকিতে হয়। পক্ষান্তরে, কোনও সংসারীও জ্ঞানকোর্টে বারংবার যাতায়াত করিতে থাকিলে সাধুগণের সদুপদেশের আকর্ষণে কখনও তাহার হৃদয়ে ভক্তির আঁচড় লাগে, কখনও বা মায়া-মমতারূপ হাত-পা ভাঙ্গিবারও সম্ভাবনা হয়; সৌভাগ্যক্রমে শেষোক্ত অবস্থা ঘটিলে, তাহাকে অবশেষে সাধুগন্তব্য সেই বৈকুণ্ঠ-হাসপাতালেই আশ্রয় লইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

বাল্যকাল হইতে শাস্ত্রের এই নিগূঢ় তত্ত্ব সহজে শিখাইবার জন্য "কপাটী খেলার" সৃষ্টি। অতএব যাহারা "কপাটী খেলা" খেলে, তাহাদের এ তত্ত্বে লক্ষ রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নতুবা বৃথা সময় নষ্ট ও অনর্থক ছুটাছুটি কষ্ট ভোগ করাই সার হইবে।

এ খেলা যে কেবল বালকদিগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে। যুবক ও বৃদ্ধগণও এ খেলা খেলিতে পারে। তবে, এ বয়সে ওরূপ দৌড়া-দৌড়ি, পাছড়া-পাছড়ি করিতে আমরা যদি লজ্জিত বা অশক্ত হই, তাহা হইলে অন্য উপায়ে এ খেলা খেলিতে পারি। সে উপায় এই—

আজ কাল প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই—প্রত্যেক পল্লীতেই হরিসভা স্থাপিত হইয়াছে। সেই হরিসভাকেই প্রথম কোট মনে করিব, এবং আমাদের আপন আপন গৃহকে দ্বিতীয় কোট ভাবিব। তার পর আমরা দম লইয়া অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদির ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেই সেই হরিসভা-কোটে গমন করিব। তাহা হইলে সে কোটে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা নাম-সংকীর্ত্তন, হরিলীলা-বর্ণন ইত্যাদি দ্বারা আমাদিগকে আট্‌কাইবার চেষ্টা করিবেন, আমরাও দম থাকিতে থাকিতেই নিজ্‌কোটে অর্থাৎ আপন গৃহে আসিবার চেষ্টা করিব। দুই দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন, কৃতকার্য্য হইব অর্থাৎ সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া অল্পক্ষণ থাকিয়া চলিয়া আসিব। কিন্তু প্রতিদিন এইরূপে যাইতে যাইতে একদিন হয় ত বেদম হইয়া সেখানে আট্‌কা পড়িব—হরিকথা শুনিয়া মগ্ন হইয়া যাইব—স্ত্রী-পুত্রাদির কথা আর মনেও থাকিবে না। তাহার উপর, কোনও দিন হয় ত আমাদের হৃদয়ে ভক্তির আঁচড় লাগিতে পারে, কোনও দিন হয় ত মায়া-মমতারূপ হাত-পাও ভাঙ্গিতে পারে। তখন হরি-দূতগণ আসিয়া, হরিধ্বনি করিয়া, হরির হাস্‌পাতাল সেই বৈকুণ্ঠধামে আমাদিগকে লইয়া যাইবেন।

প্রার্থনা।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতু-মুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

পূর্ব্বে যাহা কোনো জন না করিল বিতরণ,
যাহা সুমধুর রসে পূর্ণ।
হেন নিজ ভক্তি-ধন, দয়া করি, বিতরণ
করিতে কলিতে অবতীর্ণ॥
সুবর্ণের সুবরণ ঝলমলে অনুক্ষণ,
যাঁহার সুন্দর কলেবরে।
শচীসুত সেই হরি রহুন প্রবেশ করি,
তোমাদের হৃদয়-কন্দরে॥

(ভাবার্থ)—

হরিশব্দ নানা-অর্থ, সিংহেরে বুঝায়।
সিংহ বাস করে বনে পর্ব্বত-গুহায়॥
আপন প্রভাবে মত্ত-করিবরে নাশে।
অন্য পশু দূরে যায় তাহার তরাসে॥
তেমতি জানিবে ভব-অটবীর মাঝে।
মানবের দেহরূপ পর্ব্বত বিরাজে॥

হৃদয়-গুহায় তার পশি গৌর-হরি।
নাশিবেন মহা-মোহরূপ মত্ত-করী॥
দূরে পলাইবে যত পাপ-পশুগণ।
হরি-মুখে হরি-ধ্বনি করিয়া শ্রবণ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতারত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় বচন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান-মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

হে অর্জ্জুন, যখনই ধর্ম্মের হ্রাস ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি এক এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ধার্ম্মিকদিগের রক্ষার জন্য, অধার্ম্মিকদিগের বিনাশের জন্য এবং সত্য-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—ইহাদের প্রত্যেক যুগেই আমি অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

অতএব কলির প্রথম সন্ধ্যায় যখন যবনরাজগণের উৎপীড়নে আর্য্য-ধর্ম্ম উৎসন্নপ্রায় হইতেছিল, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে, নবদ্বীপে জগন্নাথমিশ্রের ভবনে শচীদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া সংকীর্ত্তনরূপ সত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন।

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী দশ স্মৃতাঃ॥

এই বচনের অর্থ এই যে, এই দশটিও ভগবানের অবতার। এই দশটি ভিন্ন তাঁহার আর অবতার নাই—এরূপ অর্থ নহে। যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট তাঁহার দ্বাবিংশতি অবতারের উল্লেখ করিয়া শেষে বলিতেছেন,—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

হে দ্বিজগণ, যেমন অক্ষয় হ্রদ হইতে বহুসহস্র নদী উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই সত্ত্বগুণাশ্রয় হরি হইতেও অসংখ্য অবতার হইয়া থাকে।

এতাবতা, যে কয়েকটি অবতারের কথা বলা হইল, তদ্ভিন্ন তাঁহার আরও অনেক অবতার আছে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

কলিতে তিনি যে গৌরাঙ্গ অবতার হইবেন, তাহা ভক্তগণের নিকট তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন।—

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥

হে ব্রহ্মন্, আমি কলিতে কোনও স্থানে অবতীর্ণ হইয়া, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া, পাপিষ্ঠ লোকদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব।—উপপুরাণ।

কলিনা দহ্যমানানা-মুদ্ধারায় তনুভৃতাম্।
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥

কলি-নিপীড়িত মানবগণের উদ্ধারার্থে আমি কলির প্রথম সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিব। কূর্ম্মপুরাণ।

শুদ্ধগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীরসমুদ্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

আমি কলিযুগে বিশুদ্ধ-গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ ও দয়ালু হইয়া গঙ্গাতীরে উৎপন্ন হইব এবং সকলকে সংকীর্ত্তন শিক্ষা দিব।—গরুড়পুরাণ।

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ লীলাপ্রচ্ছন্ন-বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমিই লীলা করিয়া কৃষ্ণদেহ গোপনপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত-রূপে সর্ব্বদা লোকরক্ষা করিব।—নৃসিংহপুরাণ।

আনন্দাশ্রুকলা-রোম-হর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিণম্॥

হে তপোধন, কলিতে সকলে আমাকে আনন্দাশ্রুকলায় ও পুলকে পরিপূর্ণ সন্ন্যাসিরূপী দর্শন করিবে।—ভবিষ্যপুরাণ।

কলিঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচারবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥

হে নারদ, আমি শচীগর্ভে সম্ভূত হইয়া, কলিকালে ঘোরমোহাচ্ছন্ন ও আচারবর্জ্জিত সকল লোককে উদ্ধার করিব।—বামনপুরাণ।

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভী ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

হে দেবগণ, তোমরা ভক্তরূপে ভূতলে জন্মগ্রহণ কর। আমিও শচীনন্দন হইয়া কলিতে সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিব।—শিবপুরাণ।

আবার শাস্ত্রান্তরে আছে—

করিষ্যতি কলেঃ সন্ধ্যাং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
দ্বিজাতীনাং কুলে জন্ম শান্তানাং পুরুষোত্তমঃ॥

ভূতভাবন ভগবান্ পুরুষোত্তম কলির সন্ধ্যায় শমনিরত দ্বিজগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন।—দেবীপুরাণ।

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽসৌ মহীতলে।
ভাগীরথীতটে ভূম্নি ভবিষ্যতি সনাতনঃ॥

সেই সনাতন বিষ্ণু কলির প্রথম সন্ধ্যায় ভূতলে ভাগীরথীতীরস্থ প্রদেশে গৌরাঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হইবেন।—পদ্মপুরাণ।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

তিনি সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ, গলিত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল ও কোমলাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য এই শ্রেষ্ঠ পুরুষদ্বয় তাঁহার অঙ্গ (অংশ), তিনি চন্দন দ্বারা আপন শ্রীঅঙ্গে অঙ্গদাকৃতি চিহ্ন (বাজুর ন্যায় রাধাকৃষ্ণ নামের ছাপ) ধারণ করেন, এবং তিনি সন্ন্যাসী, সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন, উদ্বেগরহিত, এবং একাগ্রচিত্ত ও নিবৃত্তিপরায়ণ হন।—মহাভারত।

আরও অনেক শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিতে পারিতাম, কিন্তু আধুনিক অনেকের বিশ্বাস যে, ঐ সকল শাস্ত্রে অনেক প্রক্ষিপ্ত (নূতন-সন্নিবিষ্ট) শ্লোক আছে। বস্তুতঃ সে শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত, কি যাঁহারা প্রক্ষিপ্ত বলেন, তাঁহারাই প্র-ক্ষিপ্ত, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের সেরূপ অপবাদ কাহারও মুখে শুনা যায় না; অধিকন্তু উক্ত মহাপুরাণকে সকলেই প্রামাণিক বলিয়াও স্বীকার করেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

নিমি রাজা জায়ন্তেয় মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্॥

সেই ভগবান্ কোন্ যুগে কিরূপ বর্ণ ও কিরূপ আকার ধারণ করেন,

এবং লোকে তাঁহাকে কি নামে ও কি বিধানে পূজা করিয়া থাকে, তাহা এখন বলুন।

করভাজন উত্তর করিলেন—

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চারিযুগে ভগবান্ নানা বর্ণ, নানা নাম ও নানা আকার ধারণ করিয়া থাকেন, এবং লোকে তাঁহাকে বৈদিক ও তান্ত্রিক নানা বিধানে পূজা করে।

কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহু-র্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্ দণ্ডকমণ্ডলূ॥

সত্যযুগে তিনি শুক্লবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, জটাধারী ও বল্কল-বসন হইয়া কৃষ্ণাজিন (কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম), যজ্ঞোপবীত, জপমালা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া ব্রহ্ম-চারী-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন।

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥

ত্রেতাযুগে তিনি রক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, ত্রিগুণ-মেখলা-ধারী, তাম্রকেশ, বেদময়, এবং স্রুক্স্রুব-প্রভৃতি যজ্ঞসামগ্রী-সংযুক্ত হইয়া যজ্ঞমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভি-রঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥

দ্বাপরযুগে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ, পীতাম্বর, বংশীপ্রভৃতি রূপে পরিণত শঙ্খ-প্রভৃতি নিজ আয়ুধধারী, এবং শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ও দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণে শোভিত হইয়া শ্রীনন্দনন্দনরূপে অবতীর্ণ হন।

তার পর প্রথম তিন যুগের পূজাবিধি ও স্তুতি বলিয়া, বলিতেছেন—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥

হে মহারাজ, দ্বাপর যুগে লোকে এইরূপে জগদীশ্বরকে স্তব করে। কলিতে তন্ত্রমতেরই প্রাধান্য। সেই তন্ত্রোক্ত বিধানে নানা কলিতে যেরূপ তাঁহার পূজা করিয়া থাকে, তাহাও শ্রবণ কর।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

কলিতে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ হন, অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ তাঁহার নামের মধ্যে থাকে (এতাবতা তিনি কৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করেন বুঝিতে হইবে) অথবা কৃষ্ণকে সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা বর্ণন করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। 'ত্বিষা অকৃষ্ণং' কান্তিতে তিনি অকৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ নহেন) অর্থাৎ পীতবর্ণ। অঙ্গ (প্রধান অংশ অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ), উপাঙ্গ (শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি), অস্ত্র (ভববন্ধনছেদনের উপায় হরিনাম), ও পার্ষদ (গঙ্গাধর-পণ্ডিত-প্রভৃতি) তাঁহার নৃত্য-সহবর্ত্তী। এবং বিবেকিগণ সংকীর্ত্তন প্রধান পূজাবিধানে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

উক্তশ্লোকে যে 'অকৃষ্ণ' শব্দ আছে, তাহার অর্থ 'কৃষ্ণবর্ণ নহেন'। 'কৃষ্ণবর্ণ নহেন' বলিলে যদিও শুক্ল ও রক্তবর্ণও বুঝাইতে পারে, তথাপি এখানে পীতবর্ণই বুঝিতে হইবে। যেহেতু যদুকুলাচার্য্য গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করিতে গিয়া গোপরাজ নন্দকে বলিয়াছিলেন—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্লতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

এই বালক, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চারি যুগে চারি বর্ণ ধারণ করেন, সেই চারি বর্ণ এই—শুক্ল রক্ত পীত ও কৃষ্ণ। তন্মধ্যে শুক্ল রক্ত ও পীত তিন বর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে অর্থাৎ দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন।

'কৃতে শুক্ল" ইত্যাদি শ্লোকে সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, "ত্রেতায়াং রক্ত-বর্ণোঽসৌ" ইত্যাদি শ্লোকে ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, এবং "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" ও "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" এই দুই শ্লোকে দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। সুতরাং কলিতেই যে পীতবর্ণ (গৌরবর্ণ) হন, তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রতিকল্পে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি অনেকবার হইয়া থাকে। সেইজন্য "ইতি দ্বাপর" এই শ্লোকে "নানা কলৌ" (নানা কলিতে বলা হইয়াছে, এবং যজন্তি" (পূজা করিয়া থাকেন), এইরূপ বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ আছে। নচেৎ, সত্যযুগে করভাজনের উক্তিতে ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগ থাকিত। এতাবতা, প্রত্যেক দ্বাপর ও প্রত্যেক কলিতেই স্তব করেন ও পূজা করিয়া থাকেন, এই অর্থই পাওয়া যাইতেছে। অতএব দ্বাপরে গর্গমুনি নন্দকে যে বলিয়াছিলেন—"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ" (শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ হইয়া গিয়াছে), তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ত্রেতায় রক্তবর্ণ, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কলিতে পীতবর্ণ হইয়াছিলেন; সুতরাং ভবিষ্যৎ তিন যুগেও ঐরূপ তিন-বর্ণ হইবেন। এবং বর্ত্তমান দ্বাপরে যেমন কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলেন, আবার ভবিষ্যৎ দ্বাপরেও কৃষ্ণবর্ণ হইবেন।

কলিযুগে বিবেকিগণ যাহা বলিয়া ভগবানের স্তব করেন, তাহা করভাজন বলিতেছেন,—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্ন-মভীষ্টদোহং,
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্।

ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং,
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

হে মহাপুরুষ অর্থাৎ পরমহংসরূপিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তোমার যে পাদ-পদ্ম 'সদা ধ্যেয়'—সর্ব্বদা ধ্যানের যোগ্য, যাহা 'পরিভবঘ্ন'—ইন্দ্রিয়-পরিজনাদিকৃত পরাভব দূর করিতে সমর্থ, যাহা 'অভীষ্টদোহ্'—ভক্তগণের সকল কামনা পূর্ণ করে, 'তীর্থাস্পদ'—তীর্থের আধার অর্থাৎ পরম পাবন (অথবা সকল তীর্থ যাহার আস্পদ অর্থাৎ যাহা সকল তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়াছে), যাহা 'শিববিরিঞ্চিনুত'—শিব ও বিরিঞ্চির অবতার অদ্বৈতাচার্য্য ও হরিদাস কর্ত্তৃক পূজিত, যাহা 'শরণ্য'—আপামর সাধারণকে আশ্রয় দানে অনুকূল, যাহা 'ভৃত্যার্ত্তিহ'—আমি তোমার সেবক, মুখে এই কথামাত্র বলিলেও সকল ক্লেশ বিদূরিত করে, যাহা 'প্রণতপাল'—প্রণতিমাত্রেই সকলকে রক্ষা করে, যাহা 'ভবাব্ধিপোত'—ভবসাগর পারের তরণী, তোমার সেই পাদপদ্ম বন্দনা করি।

ত্যক্ত্বাসুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিতরাজ্য-লক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত-মন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

হে মহাপুরুষ, হে ধার্ম্মিকবর, যিনি (অসু-দুস্ত্যজ) প্রাণের ন্যায় ত্যাগ করিতে অসাধ্য এবং (সুরেপ্সিতরাজ্য) যাঁহার সৌন্দর্য্য দেবগণের স্পৃহণীয়, সেই লক্ষ্মী-নাম্নী পত্নীকে* পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আপন বিরহ-রূপ সর্পদংশনে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়া (অথবা যাঁহা অপেক্ষা লক্ষ্মী

---

* অসুবৎ দুস্ত্যজা, সুরৈঃ ঈপ্সিতং রাজ্যং (সৌন্দর্য্যং) যস্যাঃ সা সুরেপ্সিতরাজ্যা, অসুদুস্ত্যজা চাসৌ সুরেপ্সিতরাজ্যা চেতি অসুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিতরাজ্যা, সা চাসৌ লক্ষ্মীশ্চেতি অসুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিতরাজ্য-লক্ষ্মীঃ তাম্।

সুদুস্ত্যজ নহেন, অর্থাৎ লক্ষ্মীর শোক তুমি অনায়াসে সহ্য করিয়াছিলে, কিন্তু যাঁহার বিরহবেদনা তুমি সহসা ভুলিতে পার নাই—লক্ষ্মী অপেক্ষাও যাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতে, এবং যাঁহার কাছে লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য দেব-বাঞ্ছিত নহে অর্থাৎ লক্ষ্মী অপেক্ষাও যিনি সুন্দরী ছিলেন, * সেই দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া) তোমার যে পাদপদ্ম (আর্য্যবচসা) ব্রাহ্মণের শাপ-বাক্যে অরণ্যে গমন করিয়াছিল অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক বৃন্দাবনে গিয়াছিল, এবং তোমার (ঈপ্সিত) অভিমত যে (মায়ামৃগ) মায়ারচিত স্ত্রীপুত্রধনজনাদির অন্বেষণে রত সংসারি মানব-গণ, তাহাদের উদ্ধারার্থ তোমার যে চরণ (দয়িতয়া †) দয়ালুতাবশতঃ অনুগমন করিয়াছিল অর্থাৎ তাহারা দুস্তর ভবসাগরে পতিত হইবার জন্য ধাবিত হইলেও, তুমি তাহাদিগকে সেথা হইতে আপন প্রেমসাগরে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার জন্য আলিঙ্গন করিবে বলিয়া, যাহা তাহাদের পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছিল, তোমার সেই পাদপদ্ম বন্দনা করি।

উক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে কয়েকটির অন্যবিধ অর্থও আছে, কিন্তু প্রস্তুত বিষয়ে অনাবশ্যক বলিয়া, তাহার আর উল্লেখ করা গেল না।

এইরূপে ভগবান্ কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া সংকীর্ত্তন-রূপ সত্যধর্ম্মের প্রচার করেন। তাঁহার নিজের কোনও কর্ত্তব্য না থাকিলেও, লোকশিক্ষার্থে তিনি যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা গীতাতে তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ-প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুর্ত্ততে॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানাবাপ্ত-মবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥

---

* ন সুদুস্ত্যজা সুরেপ্সিতরাজ্যা চ লক্ষ্মীঃ যস্যাঃ তাম্ ইতি পঞ্চম্যন্তো বহুব্রীহিঃ।

† দয়া অস্যাস্তীতি দয়ী, তস্য ভাবঃ দয়িতা তয়া।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, অপর লোকেও সেইরূপ করিয়া থাকে। তিনি যে ধর্ম্ম প্রমাণ বলিয়া মান্য করেন, অপর লোকেও তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন, ত্রিভুবন-মধ্যে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, যেহেতু আমার অপ্রাপ্তও কিছুই নাই, প্রাপ্যও কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। কারণ, আমি যদি অনলস হইয়া কদাচিৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে সকল লোকেই আমার পথ অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ তাহারা অলস হইয়া কোনও কার্য্যই করিবে না।

এই জন্যই ভগবান্, অপর সকলকে সংকীর্ত্তনে রত করিবার নিমিত্তই, ভক্তরূপে নিজেই নিজের নাম সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনামের ব্যুৎপত্তি।

(১) যদুকুলাচার্য্য গর্গমুনি, বসুদেবের প্রেরণায় নন্দালয়ে গমন করিয়া, শ্রীযশোদানন্দনের নামকরণ-কালে বলিয়াছিলেন—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

এই বালক যুগে যুগে শরীর ধারণ করিয়া থাকে। তাহাতে কোনও যুগে ইহার শুক্লবর্ণ, কোনও যুগে রক্তবর্ণ, এবং কোনও যুগে পীতবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে; এইজন্যই ইহার নাম 'কৃষ্ণ' রহিল।

(২) কৃষ্ ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয় করিয়া কৃষ্ণ হইয়াছে। কর্ষতি পাপানি ইতি কৃষ্ণঃ—যিনি পাপ সকল কর্ষণ অর্থাৎ উন্মূলন করেন, তিনি কৃষ্ণ।

(৩) কর্ষতি বিশ্বম্ ইতি কৃষ্ণঃ—যিনি স্বীয় মায়া-রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া জগৎকে কর্ষণ করেন অর্থাৎ কখনও আপনার সন্নিকটে আনয়ন এবং কখনও দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, তিনি কৃষ্ণ।

(৪) কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

কৃষ্ ধাতু-নিষ্পন্ন কৃষ্ শব্দের অর্থ সত্তা (সৎ), ণ শব্দের অর্থ নির্বৃতি (আনন্দ)। সেই উভয়ের যে মিলন, তাহাকেই কৃষ্ণ বলে; এবং তিনিই পরম ব্রহ্ম।

(৫) তমাল-শ্যামল-ত্বিষি শ্রীযশোদা-স্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণশব্দো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়ঃ ॥

তমালের ন্যায় শ্যামলকান্তি শ্রীযশোদানন্দনকেই কৃষ্ণ বলে। ইহা রূঢ় শব্দ। ইহাই সকল শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত।

ব্যাখ্যা।—শব্দ তিন প্রকার; যৌগিক, যোগরূঢ় ও রূঢ়।

যৌগিক।—যাহা প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অনুসারে অর্থ প্রকাশ করে, তাহা যৌগিক। যথা—শয্যা। শী ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় করিয়া শয্যা শব্দ হইয়াছে। শী ধাতুর অর্থ 'শয়ন করা' এবং ক্যপ্ প্রত্যয়ের অর্থ 'যাহাতে হয়'। অতএব শয্যা শব্দের অর্থ—'যাহাতে শয়ন করা হয়'। এখানে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অনুসারেই শয্যা শব্দের অর্থ বিছানা হইয়াছে।

যোগরূঢ়।—যাহা প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অনুসারে অর্থ প্রকাশ করিয়াও সাধারণকে না বুঝাইয়া পদার্থ-বিশেষকে বুঝায়, তাহা যোগরূঢ়। যথা

—সরোজ। সরস্‌শব্দপূর্ব্ব জন ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় করিয়া সরোজ হইয়াছে। উহার প্রকৃতি-প্রত্যয়ানুসারী অর্থ—যাহা সরোবরে জন্মে। কিন্তু পদ্ম, শৈবাল, মৎস্যপ্রভৃতি সরোবরে জন্মিলেও সরোজ শব্দে কেবল পদ্মকেই বুঝায়।

রূঢ়।—যাহা প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ না করিয়া কোনও প্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে, তাহা রূঢ়। যথা মণ্ডপ। মণ্ডশব্দপূর্ব্ব পা ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় করিয়া মণ্ডপ হইয়াছে। উহার প্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থ —যে মণ্ড (মাড়) পান করে। কিন্তু সে অর্থের লেশমাত্রও প্রকাশ না করিয়া মণ্ডপ শব্দ গৃহকে বুঝায় (যথা চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি)।

অমরকোষে বিষ্ণু-পর্য্যায়ের প্রথমেই "বিষ্ণুর্নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ" এই যে তিনটি নামের উল্লেখ আছে, উহারাও যথাক্রমে যৌগিক, যোগরূঢ় ও রূঢ়।

বিষ্ণু—বিষ্‌ ধাতুর উত্তর নু প্রত্যয় করিয়া বিষ্ণু হইয়াছে। বিষ্‌ ধাতুর অর্থ ব্যাপিয়া থাকা, নু প্রত্যয়ের অর্থ তৎকর্ত্তা, অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া থাকেন, তিনি বিষ্ণু। এখানে ঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ইহা যৌগিক শব্দ।

নারায়ণ।—নার (জল) + অয়ন (আশ্রয়)। জল যাঁহার আশ্রয় তিনি নারায়ণ। এখানে প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ প্রকাশ করিয়াও, জলাশ্রিত মৎস্য-প্রভৃতিকে না বুঝাইয়া, প্রলয়সমুদ্র-জলশায়ী শ্রীহরিকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং ইহা যোগরূঢ়।

কৃষ্ণ।—মণ্ডপাদি শব্দের ন্যায় কৃষ্ণ শব্দ রূঢ়, অর্থাৎ ইহা প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ না বুঝাইয়া শ্রীযশোদানন্দনকেই বুঝাইয়া থাকে। (১) তিনি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ নহেন। যেহেতু তিনি পূর্ণব্রহ্ম—নির্গুণ, নিরঞ্জন; তাঁহাতে শ্বেতপীতাদি কোনও বর্ণের সম্ভাবনা নাই। যেমন কামল-(ন্যাবা)-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দৃষ্টির দোষে সকল বস্তুকেই হরিদ্রাবর্ণ

দেখে, সেইরূপ প্রবল তমোগুণান্বিত আমরা দৃষ্টির দোষেই তাঁহাকে তমোবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া থাকি। আবার রজোগুণাদির উদ্রেক হইলে তাঁহার রক্তবর্ণাদিও অবলোকন করি। (২।৩) তিনি পাপকর্ষণ বা জগদাকর্ষণ করেন বলিয়াও কৃষ্ণ নহেন। কারণ, পূর্ণব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়; তাঁহার কোনও কার্য্যই নাই। আমরা নিজের গতি অথবা খণ্ড খণ্ড মেঘের প্রবাহ অনুসারে যেমন নিশ্চল চন্দ্রকে চলিত বোধ করি, সেইরূপ নিজের-কার্য্য এবং কালের প্রবাহ অনুসারেই তাঁহার কার্য্য অনুভব করিয়া থাকি। (৪) যিনি বাক্যে মনেরও অতীত, যিনি বেদের অগোচর, তিনি যে সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি, তাহারই বা নির্ণয় কি? তাই শাস্ত্র সর্ব্বশেষে বলিতেছেন—

তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥

হে পরমেশ্বর, তুমি যে কিরূপ, সে বিষয়ে তোমার তত্ত্ব আমি জানি না। হে সুরেশ্বর, তুমি যেরূপ, সেইরূপকেই আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি।

সংকীর্ত্তন।

কবে কৃপা করিবে কংসারি। (এ অধমে হে)
আমি এ যাতনা আর সহিতে নারি॥
আমায় দিয়েছ যে সম্পদ, পদে পদে তায় বিপদ হে,
দাও ও পদ বিপদ নিবারি॥
(ছিলাম) শৈশবেতে জ্ঞানহীন, হেলে খেলে গেছে দিন,
ভাবি নাহি কোনো দিন, ও রাঙ্গা চরণ॥ (জানি নাই বলে হে)

প্রবল রিপুর বশে, নারী সহ রঙ্গ রসে,
পরহিংসা পরদ্বেষে, গিয়েছে যৌবন॥ (তোমায় না ভজে হে)
প্রৌঢ়কালে দারা স্থত,—পালনে হইয়ে রত
অর্থ-আশে অবিরত, করেছি ভ্রমণ॥ (মিছে কাজে হে)
বৃদ্ধ দশা হলে পর, জরাজীর্ণ কলেবর,
কফে বদ্ধ কণ্ঠস্বর, সরে না বচন॥ (কেমনে ডাকি হে)
লভি এ মানব-কায় হেলাতে হারানু হায়,
সময় ফুরায়ে যায় হে, কি হবে এখন।
হবে বল কি উপায়, হয়েছি যে অনুপায়,
রাখ যদি রাঙ্গা পায় হে, পতিতপাবন॥
(আমার) কিসে হবে পরিত্রাণ, অনুতাপে দহে প্রাণ,
শান্তি নাহি তব কৃপা বিনে। (জানি মনে হে)
(আমি) অন্য কিছু নাহি চাই, (তোমার) শ্রীপাদপদ্ম যদি পাই,
স্নিগ্ধ করি তাপিত জীবনে॥ (হৃদে ধরি হে)
(আমার) কোনো গুণ নাই হে হরি, (তুমি) নিজ গুণে দয়া করি,
চরণ-তরী দাও যদি এ দীনে। (অন্তকালে হে)
(সুখে) ভবপারে যাব চলে, (মুখে) হরি হরি হরি বলে,
ফাঁকি দিয়ে দুরন্ত শমনে॥ (নামের গুণে হে)
আজি কোথা হে পীতবাস (আমার) পূরাও এই অভিলাষ হে,
তোমার দাসের দাস হতে যেন পারি॥ (হরি)

ভক্তির লক্ষণ।

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

অন্য কোনও বিষয়ে মমতা না করিয়া, কেবল বিষ্ণুতেই যে প্রেম-সংযুক্ত মমতা, তাহাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমার বলিয়া যে অভিমান তাহাকে মমতা বলে। আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ধন ইত্যাদি 'আমার' বলিতে যত বস্তু আছে, তৎসমুদয়কে পরিত্যাগ করিয়া, সেই সকল 'আমার' বলিতে কেবল হরি ভিন্ন আর কিছুই নাই, অর্থাৎ হরিই আমার পিতা, হরিই আমার মাতা, হরিই আমার ভ্রাতা, হরিই আমার স্ত্রী, হরিই আমার পুত্র, হরিই আমার বন্ধু, হরিই আমার ধন, হরিই আমার জন, হরিই আমার গৃহ—ইত্যাদি-রূপ যে ভাবনা এবং সেই ভাবনাকে ক্রমশঃ যে প্রেমোন্মুখীন করা, তাহারই নাম ভক্তি।

এখন প্রেম কাহাকে বলে, তাহা জানিতে হইলে, অগ্রে ভাব জানা আবশ্যক। ভাব যথা—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণময়, প্রেমরূপ সূর্য্যকিরণের সদৃশ উজ্জ্বল এবং রতি দ্বারা চিত্তের স্বচ্ছতা-সম্পাদক যে বৃত্তি, তাহাকেই ভাব বলে।

সম্যঙ্-মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

সেই ভাবই যখন ঘনীভূত হইয়া চিত্তের অতিশয় স্বচ্ছতা সম্পাদন

করে এবং অতিশয় মমতাশালী হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতেরা প্রেম বলিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা।—যেমন কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ বস্তু ব্যবধান থাকিলেও, তাহার মধ্য দিয়া পদার্থসমূহ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, আবার যেমন সেই কাচাদি অতিশয় স্বচ্ছ হইলে, তাহা মধ্যস্থলে আছে কি না, তাহা উপলব্ধই হয় না, সেইরূপ প্রেম মনোদর্পণকে এতই স্বচ্ছ করিয়া তোলে যে, তদ্দারা হরিকে সুস্পষ্টভাবে দর্শন করা যায়, এবং সে সময় মন বলিয়া একটা পদার্থ মধ্যস্থলে আছে কি না, তাহার আর উপলব্ধিও হয় না। এবং তাঁহার উপর আত্যন্তিক মমতা জন্মাইয়া দেয়, অর্থাৎ হরি আমার আমি হরির—এইরূপ ধারণা উৎপাদন করে।—ইহাই প্রেমের কার্য্য।

ফল কথা,—ভক্তিরই গাঢ়তর অবস্থাকে ভাব, এবং গাঢ়তম অবস্থাকে প্রেম বলে।

ভক্তি, ভাব ও প্রেমের সোপানপরম্পরা এইরূপ উক্ত আছে।—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাব-স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

অগ্রে শ্রদ্ধা (অর্থাৎ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ করা আবশ্যক, সেই মুক্তির উপায় হরিভক্তি—এই শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস) তার পর সাধু-সঙ্গ (সাধুগণ কিরূপে হরিভক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগের সহবাস), তার পর অনর্থনিবৃত্তি (অতিতুচ্ছ বিষয়-ভোগাদি হইতে মনের নিবৃত্তি) ঘটে, তার পর নিষ্ঠা (চিত্তের একা-গ্রতা), তার পর রুচি (ইচ্ছা), তার পর আসক্তি (অনুরাগ), তার পর ভাব, এবং তার পর প্রেম উদ্রিক্ত হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভা-বের এই ক্রম হইয়া থাকে।

ভক্তির লক্ষণ নয়টি। যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্য-মাত্মনিবেদনম্ ॥

(১) শ্রবণ—বিষ্ণুর নাম-গুণাদি শুনা। (২) কীর্ত্তন—নাম গুণাদি কথন। (৩) স্মরণ—অনুধ্যান। (৪) পাদসেবন—পরিচর্য্যা। (৫) অর্চ্চন—পূজা। (৬) বন্দন—কায়মনোবাক্যে অবনত হওয়া। (৭) দাস্য—কর্ম্মসমর্পণ। (৮) সখ্য -তাঁহাতে প্রীতি বিশ্বাসাদি। (৯) আত্মনিবেদন—আত্মসমর্পণ অর্থাৎ তাঁহার নিকট আত্মবিক্রয় করা (যেমন গবাদি পশু অন্যের নিকট বিক্রয় করিলে তাহাদিগের ভরণ পোষণাদির চিন্তা করিতে হয় না; যাহার নিকট বিক্রয় করা যায়, তাহার উপরেই সমুদয় ভার পড়ে; সেইরূপ ভগবানে আত্মবিক্রয় করিয়া দেহাদির ভরণ-পোষণের ভার তাঁহার উপর দিয়া নিশ্চিত থাকা)।

এই নবলক্ষণা ভক্তি আবার দ্বিবিধ;—সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ ভক্তি তিন প্রকার;—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। তামসিক ভক্তি তিন প্রকার—

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥ *

ভেদদর্শী হইয়া ক্রোধবশে অন্যের হিংসা কামনায় ভগবানে যে ভক্তি, তাহা অধম তামসিক-ভক্তি; দম্ভ-কামনায় যে ভক্তি, তাহা মধ্যম তামসিক-ভক্তি; এবং মাৎসর্য্য (অন্যশুভদ্বেষ)-কামনায় যে ভক্তি, তাহা উত্তম তামসিক-ভক্তি।

রাজসিক ভক্তিও তিন প্রকার—

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ ॥

* ইত্যাদি কয়টি শ্লোকের ভাবার্থমাত্র লেখা হইল।

ভেদদর্শী হইয়া বিষয়কামনায় যে ভক্তি, তাহা অধম রাজসিক ভক্তি; যশস্কামনায় যে ভক্তি, তাহা মধ্যম রাজসিক-ভক্তি; এবং ঐশ্বর্য্যকামনায় যে ভক্তি, তাহা উত্তম রাজসিক-ভক্তি।

এইরূপ সাত্ত্বিক ভক্তিও তিনপ্রকার;—

কর্ম্মনির্হার-মুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥

ভেদদর্শী হইয়া পাপক্ষয়-কামনায় যে ভক্তি, তাহা অধম সাত্ত্বিকভক্তি; ভগবৎপ্রীতিকামনায় তাঁহাতে কর্ম্মসমর্পণ দ্বারা যে ভক্তি, তাহা মধ্যম সাত্ত্বিক-ভক্তি; এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম মনে করিয়া ভগবানে যে ভক্তি করা, তাহা উত্তম সাত্ত্বিক-ভক্তি।

এইরূপে ভক্তি নয় প্রকার। আবার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি প্রত্যেক লক্ষণই এইরূপ নয়-প্রকার হইয়া থাকে। যথা—অধম তামসিক শ্রবণ, মধ্যম তামসিক শ্রবণ, উত্তম তামসিক শ্রবণ; অধম রাজসিক শ্রবণ, মধ্যম রাজসিক শ্রবণ, উত্তম রাজসিক শ্রবণ; অধম সাত্ত্বিক শ্রবণ, মধ্যম সাত্ত্বিক শ্রবণ, উত্তম সাত্ত্বিক শ্রবণ। কীর্ত্তনাদিও এইরূপ জানিবে। সুতরাং এইরূপ সূক্ষ্ম বিভাগ অনুসারে সগুণ ভক্তি (৯ × ৯) একাশী প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নির্গুণ ভক্তি একই প্রকার। যথা—

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতি-রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

ভগবানের গুণ-শ্রুতিমাত্রেই তাঁহাতে যে অবিরাম, নিষ্কাম ও ভেদ-দৃষ্টিবিহীন মনের গতি উৎপন্ন হয়, তাহাকেই নির্গুণ ভক্তি বলে। সগুণ ভক্তির অনুশীলনেই ক্রমশঃ নির্গুণ ভক্তি উৎপন্ন হয়।

ভগবান্ উদ্ধবের নিকট কতকগুলি ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছিলেন। যথা—

মল্লিঙ্গ-মদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্।
পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্ব-গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্।
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যান-মুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং মম পর্ব্বানুমোদনম্।
গীত-তাণ্ডব-বাদিত্র-গোষ্ঠীভির্মদ্‌গৃহোৎসবঃ।
যাত্রাবলিবিধানঞ্চ সর্ব্ব-বার্ষিক-পর্ব্বসু॥
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়-ব্রত-ধারণম্।
মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুর-মন্দির-কর্ম্মণি।
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেক-মণ্ডল বর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া॥
অমানিত্ব-মদম্ভিত্বংকৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্॥
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়-মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

(১) আমার প্রতিমূর্ত্তির ও আমার ভক্তজনের দর্শন, স্পর্শন এবং অর্চ্চনা। (২) পরিচর্য্যা (সেবা)। (৩) স্তুতি। (৪) বিনীত ভাবে আমার গুণ ও কর্ম্মের কীর্ত্তন। (৫) আমার কথা শ্রবণে অনুরাগ। (৬) আমার ধ্যান। (৭) সমস্ত লব্ধ বস্তু আমাতে সমর্পণ করা। (৮) অত্মসমর্পণ। (৯) আমার জন্ম ও কর্ম্ম বর্ণন। (১০) আমার জন্মাষ্টমী-প্রভৃতি পর্ব্বে উৎসব। (১১) নৃত্য গীত বাদ্য ও সভা দ্বারা আমার গৃহে উৎসব করা। (১২) চাতুর্ম্মাস্য একাদশী-প্রভৃতি আমার সমস্ত

বার্ষিক পর্ব্বে উৎসব ও পুষ্পাদি উপহার প্রদান করা। (১৩) মদ্বিষয়ে বৈদিক ও তান্ত্রিক উপদেশ গ্রহণ। (১৪) আমার ব্রত পালন। (১৫) আমার প্রতিমা-স্থাপনে অনুরাগ। (১৬) সমর্থ হইলে স্বয়ং, অসমর্থ হইলে অন্যের সহিত মিলিয়া, আমার প্রীত্যর্থে ফুলের বাগান, ফলের বাগান, ক্রীড়াস্থান, নগর ও মন্দির নির্ম্মাণ। (১৭) মার্জ্জনি দ্বারা সম্মার্জ্জন, গোময় দ্বারা উপলেপন, জল দ্বারা প্রক্ষালন ও ভদ্রমণ্ডলাদি রচনা দ্বারা আমার গৃহসংস্কার। (১৮) মানপরিহার। (১৯) দম্ভ-পরিহার। (২০) ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ না করা। (২১) আমাকে নিবেদিত কোনও বস্তু একাকী উপভোগ না করা; এমন কি, আমায় প্রদত্ত দীপের আলোকেও অন্য কর্ম্ম না করা। (২২) যাহা কিছু উত্তম দ্রব্য আছে এবং যে যে দ্রব্য নিজের অত্যন্ত প্রিয়, সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করা।

এখানে দ্বাবিংশতি লক্ষণ বলা হইয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এগুলি স্বতন্ত্র লক্ষণ নহে; উক্ত নব-লক্ষণেরই অন্তর্গত বলিয়া উপলব্ধ হইবে। যথা—

৫ম ও ১২শ লক্ষণ শ্রবণের অন্তর্গত। ৩য় ৪র্থ ও ৯ম লক্ষণ কীর্ত্তনের অন্তর্গত। ৬ষ্ঠ লক্ষণ স্মরণের অন্তর্গত। ২য় লক্ষণ পাদ-সেবনের অন্তর্গত। ১ম, ১২শ ও২২ লক্ষণ অর্চ্চনের অন্তর্গত। ১৮শ, ১৯শ, ও ২০শ লক্ষণ বন্দনের অন্তর্গত। ৭ম, ১১শ, ১৭শ ও ২১শ লক্ষণ দাস্যের অন্তর্গত। ১০ম, ১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ লক্ষণ সখ্যের অন্তর্গত। এবং ৮ম লক্ষণ আত্মনিবেদনের অন্তর্গত।

উক্ত নবলক্ষণা ভক্তি দ্বারা পরম গতি লাভ করা যায়। তদ্বিষয়ে একটি কবি-বচন আছে।—

পরীক্ষিচ্ছ্রবণেনৈব কীর্ত্তনেন চ নারদঃ।
যজ্ঞপত্ন্যস্তথা স্মৃত্যা রুক্মিণী পাদসেবয়া।

অর্চ্চনেন তথা কুব্জা বন্দনেনোদ্ধবাদয়ঃ।
দাস্যেন গোপিকাঃ সর্ব্বাঃ সখ্যেন পাণ্ডুনন্দনাঃ।
বলি-রাত্মার্পণেনৈবং ব্যস্তেনাপি পরাং গতিম্।
প্রাপুস্তে কিং পুনর্ভক্তাঃ সমস্তৈর্ভক্তিলক্ষণৈঃ॥

পরীক্ষিৎ শ্রবণ দ্বারা, নারদ কীর্ত্তন দ্বারা, যজ্ঞপত্নীরা স্মরণ দ্বারা, রুক্মিণী পাদসেবন দ্বারা, কুব্জা অর্চ্চন দ্বারা, গোপীরা দাস্য দ্বারা, পাণ্ডবেরা সখ্য দ্বারা এবং বলি আত্মসমর্পণ দ্বারা—এইরূপ এক একটি দ্বারাই তাঁহারা--যখন পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন যে সকল ভক্ত, সমস্ত ভক্তি-লক্ষণ দ্বারা, শ্রীহরির আরাধনা করেন, তাঁহারা যে পরম গতি লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে বক্তব্য কি ?

রাজপুত্রদিগের কথা।

এক রাজার কয়েকটি পুত্র ছিল। একদিন তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, সমুদ্র-বিহার করিবেন। তখন সকলে পিতৃ-সন্নিধান হইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ক্ষুদ্র, বৃহৎ—নানাপ্রকার জলযান ছিল। এক এক জন এক-এক-প্রকার পোতে আরোহণ করিলেন। যাহার যেরূপ তরী, তাহার সেইরূপ দাঁড়ী মাঝীও জুটিল।

রাজপুত্রেরা তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া সাগর-বক্ষে বিহার করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে পূর্ব্বপোত পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য পোতে আরোহণ করেন; এইরূপে কত পোত ধরিলেন, কত পোত ছাড়িলেন। মাঝে মাঝে প্রবল ঝটিকা. উত্তাল তরঙ্গমালা, প্রবল স্রোত, ভীষণ আবর্ত্ত, ভয়ঙ্কর জলজন্তুর আস্ফালন দেখিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। কিন্তু দাঁড়ী মাঝী আশ্বাস দিতে লাগিল —ভয় নাই; মুহূর্ত্ত পরে এসব কিছুই

থাকিবে না। তাহাদের আশ্বাসবচনে বিশ্বাস করিয়া রাজপুত্রেরা শান্ত হইলেন, মাঝীও ঝিঁকা মারিতে লাগিল; দাঁড়ীরাও সবলে দাঁড় টানিতে লাগিল। ক্রমশঃ তরী দূরে গিয়া পড়িল; আর কূল কিনারা নাই; কে কোথায় গিয়া পড়িল তাহারও ঠিকানা হইল না।

রাজা সর্ব্বদাই পুত্রদিগের সংবাদ লইতেছিলেন। তিনি তাহাদের বিপদ্ বুঝিয়া, প্রত্যেকের জন্য এক একখানি উৎকৃষ্ট তরী পাঠাইয়া দিলেন। সে তরীগুলি অতি সুন্দর, অতি মনোহর, অতি দৃঢ় (অর্থাৎ লৌহ-নির্ম্মিত), এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। সে তরী-গুলিতে এক এক জন সুদক্ষ কর্ণধার (কাপ্তেন) আছেন। দাঁড় নাই, তরী পা'ল ভরে চলে। তাহাতে পরিচারক (খালাসী) অনেক আছে, সকলেই কর্ণধারের অনুগত ও বশংবদ। রাজপুত্রেরা অবশেষে সেই তরীগুলিতেই আরোহণ করিলেন। তখন কেহ মনে ভাবিলেন,— এ সাগরে বড় বিপদ্, আর এখানে থাকিব না; স্বদেশে ফিরিয়া যাইব। এই ভাবিয়া কর্ণধারের শরণাপন্ন হইলেন। তখন কর্ণধার কর্ণ (হাল) ধরিল; তাহাতে শক্তি প্রয়োগ করিল; সুপথে তরী চালাইল; কিন্তু কেহ কেহ কর্ণধারকে মানিলেন না, বিপদের কথা ভাবিলেন না, তরীর মায়া ছাড়ি-লেন না; আপন ইচ্ছায় তরী চালাইতে লাগিলেন। তরী স্রোতের বশে চলিল। ক্রমে কুবাতাস উঠিল; তরী টলিল, পাকনায় পড়িল, শেষে আরোহী সহ অতল জলে ডুবিল; আর রক্ষা হইল না।

এখন বুঝিয়া দেখুন,—আমরা সেই রাজপুত্র—বিশ্বরাজ্যের রাজা সেই শ্রীহরির পুত্র। আমরা পিতৃসন্নিধান ছাড়িয়া এই ভবসাগরে বিহার করিতে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া এক একটি দেহ ধারণ করিতেছি; সেই দেহগুলি তরী-স্বরূপ। পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি কত দেহ আশ্রয় করিতেছি, কত দেহ ছাড়িতেছি। সেই সকল দেহ-তরীতে মাঝী আমাদের মন, দাঁড়ী আমাদের ইন্দ্রিয়গণ। আমরা তাহাদের বশেই

চলিতেছি, তাহাদের পরামর্শই শুনিতেছি, মাঝে মাঝে এই ভবসাগরে দুঃখের প্রবল ঝড় বহিতেছে, শোকের তুফান উঠিতেছে, কালের স্রোত ছুটিতেছে, মায়ার পাকনা ঘুরিতেছে, কামাদি জলজন্তু সকল আক্রমণ করিতে আসিতেছে। যখনই এ সব দেখি, তখনই ভয় পাই, তখনই ব্যাকুল হইয়া পড়ি; কিন্তু পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, দাঁড়ী মাঝীর কথায় আশ্বস্ত হই, তাহাদের প্রলোভনে মোহিত হইয়া যাই। এইরূপে ক্রমশঃ আমরা দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম, কূলকিনারা পাইতে-ছিলাম না।

পরম কারুণিক সেই পরম পিতা আমাদের বিপদ্ বুঝিয়া, উদ্ধারের জন্য অবশেষে এই মানবদেহ-রূপ উত্তম তরী পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরাও সেই তরী আশ্রয় করিয়াছি। সকল তরী অপেক্ষা ইহা অতি সুন্দর, অতি মনোহর অতি দৃঢ়; এবং সর্ব্ববিধ ভোগ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ অন্য অন্য দেহে কোনও কোনও ইন্দ্রিয়াদির অভাবে যাহা ভোগ করিতে পারা যায় না, মানবদেহে সে সমস্তই ভোগ করা যাইতে পারে। এ তরীর কর্ণধার গুরু। ইহাতে মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনেক পরিচারকও আছে, সকলেই সেই গুরু কর্ণধারের আদেশ মতেই কার্য্য করিয়া থাকে, নিজের ইচ্ছায় কেহ কোনও কার্য্য করে না।

এখন যদি আমরা এমন তরী পাইয়া, এই ভবসাগরে ঘোর বিপদ বুঝিয়া সেই কর্ণধারের শরণাগত হই, কাতর প্রাণে বলি—হে গুরো, আজি আমি ঘোর বিপদে পতিত, তাই আপনার চরণাশ্রিত; আমার দেহ-তরী আপনি সুপথে চালিত করুন; যাহাতে এ ভবসাগর পার হইতে পারি, যাহাতে পিতৃ-সন্নিধানে—শ্রীহরির পাদপদ্ম সমীপে—শীঘ্র উপস্থিত হইতে পারি, তাহার উপায় বিধান করুন, তাহা হইলে সেই দয়ালু কর্ণধার তখ-নই কর্ণ (আমাদের কাণ) ধরিবেন, তাহাতে শক্তি অর্থাৎ তারক ব্রহ্ম-মন্ত্র প্রদান করিবেন; অমনি স্বয়ং শ্রীহরিই সুবাতাস হইয়া বহিতে থাকি-

বেন ; তরী সুপথে চলিবে, কূলে লাগিবে ; আমরাও পিতৃসন্নিধানে পৌঁছিতে পারিব।

কিন্তু, যদি আমরা এমন তরী পাইয়াও, সেই গুরু-কর্ণধারকে না মানি, এ তরীর মায়া না ছাড়ি, বিপদের কথা না ভাবি, আপন ইচ্ছায় তরী চালাইতে থাকি, তাহা হইলে কালরূপ স্রোতের বশেই তরী চলিবে, আমরা ক্রমশঃ দূরে যাইব। শেষে পাপের কু-বাতাস বহিবে, দেহতরী টলিবে, মায়ার পাকনায় পড়িবে, পরে নরকের অতল জলে ডুবিবে ; আর উদ্ধার হইবে না।

তাই ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

নৃদেহ-মাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারম্॥
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

মানব-দেহ সুদুর্লভ, কেননা বহু জন্মের পর তবে ইহা পাওয়া যায় ; কিন্তু সুদুর্লভ হইলেও যখন আমার কৃপায় জীব ইহা পাইয়াছে, তখন ইহা সুলভই বলিতে হইবে। ইহা একটী সুদৃঢ় তরী-স্বরূপ। গুরুই ইহার কর্ণধার, এবং আমিই অনুকূল বাতাস হইয়া ইহাকে চালাইয়া থাকি। এমন তরী পাইয়াও মানব যদি ভবসাগর পার হইতে না পারে, তবে তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে।

প্রার্থনা।

হরে! মুরারে! মধুকৈটভারে!
গোপাল! গোবিন্দ! মুকুন্দ! শৌরে!
যজ্ঞেশ! নারায়ণ! কৃষ্ণ! বিষ্ণো!
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ! রক্ষ॥

হরিরূপে অবতরি, গজেন্দ্র মোক্ষণ
করিয়া, করিলে তার আর্ত্তি বিনাশন।
তাই আমি ডাকি আজি কাতরবচনে,
হরে! রক্ষা কর এই নিরাশ্রয় জনে॥

নরক নামেতে ছিল প্রবল অসুর,
তাহার সেনানী ছিল, নাম তার মুর।
যোড়শ সহস্র রাজপত্নী আনি ধরি,
নিগড়ে বাঁধি সে রেখেছিল বন্দী করি।
তাহারে বিনাশ করি, তুমি সে সবার
সে বিপদ্ ঘুচাইয়া করিলে উদ্ধার।
তাই আমি ডাকি আজ কাতরবচনে,
হে মুরারে! রক্ষা কর নিরাশ্রয় জনে

মধু ও কৈটভ—দুই প্রবল দানব,
তব কর্ণমল হ'তে লভিয়া উদ্ভব,
ব্রহ্মারে খাইতে গেল বিস্তারিয়া মুখ,
দেখি ভয়ে কম্পমান হৈল চতুর্ম্মুখ।

সুদর্শন চক্র দিয়া তুমি হে তখন,
ক'রেছিলে দোঁহাকার মস্তক ছেদন।
তাই আমি ডাকি আজি কাতরবচনে,
মধুকৈটভারে! রক্ষ নিরাশ্রয় জনে॥

কালিয়-হ্রদেতে করি বিষ জল পান,
গাভী বৎস সবে হ'য়েছিল ম্রিয়মাণ।
অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি নিক্ষেপি সে-কালে,
পাইলে গোপাল নাম, রক্ষিয়া গো-পালে।
তাই আমি ডাকি আজি কাতরবচনে,
হে **গোপাল**! রক্ষা কর নিরাশ্রয় জনে॥

রসাতলে গিয়াছিল ধরণী যখন,
কোল-রূপে কৈলে তার উদ্ধার সাধন।
গো শব্দে পৃথিবী, তাঁরে লাভ করি তবে,
তুমি হে গোবিন্দ নাম ধরিলে এ ভবে।
তাই আমি ডাকি আজি কাতরবচনে,
হে **গোবিন্দ**! রক্ষা কর নিরাশ্রয় জনে॥

কর্ম্মের ফলেতে ঘটে সংসার-বন্ধন,
কারো সাধ্য নাহি তাহা করিতে খণ্ডন।
কেবল তুমিই মুক্তি দাও ভক্তগণে,
হে **মুকুন্দ**! রক্ষা কর নিরাশ্রয় জনে॥

বসুদেব-পিতা শূর, তাঁহার কুলেতে
অবতীর্ণ হয়েছিলে ভূভার হরিতে।
তাই তব শৌরি নাম বিদিত ভুবনে,
শৌরে! রক্ষা কর এই নিরাশ্রয় জনে॥

বরাহ হইয়াছিলে যজ্ঞমূর্ত্তি ধরি,
যজ্ঞেশ তোমার নাম হয় তাতে হরি ।
তাই আমি ডাকি আজি কাতর বচনে,
হে **যজ্ঞেশ** ! রক্ষা কর নিরাশ্রয় জনে

প্রলয়-সমুদ্র-জল করিয়া আশ্রয়,
নারায়ণ নামে খ্যাত হ'লে বিশ্বময় ।
অনন্ত-শয্যায় তাহে করিয়া শয়ন,
যোগনিদ্রা-বশে যবে ছিলে অচেতন ;
উঠিল প্রবল ঝড় তরঙ্গ ভীষণ,
নড়িল তোমার তাহে নাভি-পদ্মাসন ।
টলিয়া পড়িলা ব্রহ্মা অকূল পাথারে,
রক্ষ রক্ষ রক্ষ বলি ডাকিলা তোমারে ।
যেমনে রক্ষিলা তাঁরে আজি হে তেমনে,
নারায়ণ ! রক্ষা কর নিরাশ্রয় জনে ॥

মহা প্রলয়েতে যবে হয় একার্ণব,
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া উঠে হাহাকার রব ।
এ চৌদ্দ ভুবন তবে আকর্ষণ করি,
রক্ষা কর আপনার উদরেতে পূরি ।
তাই তব কৃষ্ণ নাম বিদিত ভুবনে,
কৃষ্ণ ! রক্ষা কর এই নিরাশ্রয় জনে ॥

বিশ্বব্যাপী বলি তুমি বিষ্ণু নাম ধর,
অশেষ প্রকারে জগতের হিত কর ।
তাই আমি ডাকি আজি কাতর বচনে,
বিষ্ণো ! রক্ষা কর এই নিরাশ্রয় জনে ॥

সত্ত্বগুণে কর তুমি জগতে পালন,
তোমারি আদেশে চলে এ চৌদ্দ ভুবন।
তাই আমি ডাকি আজি কাতর বচনে,
জগদ্দীশ! রক্ষা কর নিরাশ্রয় জনে॥

ভক্তি-মাহাত্ম্য।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

(ভগবান্ বলিয়াছিলেন)—হে উদ্ধব, ঐকান্তিকী ভক্তি আমাকে যেরূপ বশ করিয়া থাকে, ষট্‌চক্রভেদ-রূপ যোগ, জ্ঞানযোগ, সদাচার, বেদপাঠ, তপস্যা ও দান আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

আমি সর্ব্বভূতের আত্মা এবং সাধুগণের প্রিয়। একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তি দ্বারাই আমি বশীভূত হই। আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহা চণ্ডালদিগকেও অধম জন্ম হইতে পবিত্র করিয়া থাকে (অর্থাৎ ভক্তির ফলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণবৎ পূজনীয় হয়)।

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তি-রুদ্ধবৈনাংসি কৃন্ততি॥

হে উদ্ধব, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহা পাপরাশিকে নষ্ট করিয়া থাকে।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী-র্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

পরম ভক্ত বলিয়া তোমাকে আমি যেমন ভালবাসি, ব্রহ্মাকে তেমন ভালবাসি না, শঙ্করকে তেমন ভালবাসি না, বলদেবকে তেমন ভালবাসি না, লক্ষ্মীকে তেমন ভালবাসি না; অধিক কি, আমি আপনাকেও তেমন ভালবাসি না।

তস্মাদ্ মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

অতএব যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত ও মদ্গতপ্রাণ হয়, তাহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য ব্যতিরেকেও মুক্তি হইয়া থাকে।

এইজন্যই—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্ব-মপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

মুক্তি পঞ্চবিধ—সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস করা), সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করা), সামীপ্য (আমার নিকটে থাকা), সারূপ্য (আমার সমান রূপ ধারণ করা), এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য (আমাতে লীন হইয়া যাওয়া)। এই পঞ্চবিধ মুক্তি আমি ইচ্ছা করিয়া দান করিলেও আমার ভক্তজনে তাহা গ্রহণ করে না।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥

আমার ভক্তগণ ভক্তি দ্বারা উপস্থিত সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ (সালোক্য-সহিত পঞ্চবিধ) মুক্তিও যখন ইচ্ছা করে না, তখন স্বর্গাদি লোকে গমনের ত কথাই নাই; যেহেতু সে সকল কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সেই জন্য ভক্ত প্রহ্লাদ বরদানোদ্যত শ্রীহরিকে বলিয়াছিলেন—

নাথ জন্মসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তি-রচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

হে নাথ, আমি বহুসহস্র জন্মের মধ্যে যে যে জন্ম পাইব, সেই সেই জন্মে, হে অচ্যুত, তোমাতে যেন আমার অচলা ভক্তি হয়।

যা প্রীতি-রবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

অজ্ঞ লোকদিগের সংসারে যেরূপ অচলা ভক্তি আছে, তোমাকে স্মরণ করায় তোমার প্রতি সেইরূপ ভক্তি আমার হৃদয় হইতে যেন অপগত না হয়।

ভগবান্ তাঁহাকে "তথাস্তু" বলিয়া পুনর্ব্বার অন্য বর দিতে চাহিলে, প্রহ্লাদ কহিলেন—

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥

সমস্ত জগতের কারণ যে তুমি, তোমাতে যাহার অচলা ভক্তি থাকে, তাহার আর ধর্ম্ম অর্থ কামে প্রয়োজন কি? এবং তাহাকে মুক্তিই বা চাহিতে হইবে কেন? ভক্তির ফলে মুক্তি ত তাহার করতলে উপস্থিত থাকে।

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্ যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্॥

(ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন)—হে প্রভো, মুক্তিলাভের সোপানস্বরূপ তোমার

প্রতি যে ভক্তি, তাহা উপেক্ষা করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করে, তণ্ডুললাভের কামনায় শস্যবিহীন স্থূল তুষে যাহারা আঘাত করে তাহাদের ন্যায়, তাহাদের কেবল পরিশ্রমই সার হয়, আর কিছু লাভ হয় না।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা,
মনোরথেনাসতি ধাবতো মুহুঃ॥

ভগবানের প্রতি যাহার নিষ্কাম ভক্তি থাকে, তাহার শরীরে দেবতারা, সকল সদ্‌গুণের সহিত, বাস করিয়া থাকেন। হরিতে যে ভক্তিমান্ নহে, তাহার সদ্‌গুণ কোথায়? সে কেবল নানাবিধ আশার বশে অনিত্য সংসারে ছুটাছুটি করিয়া থাকে।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি-র্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈ-র্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

জ্ঞান হইলে মুক্তি সুলভ হয়, এবং যজ্ঞাদিজন্য পুণ্যে ভুক্তিও (ভোগও) সুলভ হইয়া থাকে। কিন্তু হরিভক্তি, সহস্র সাধনাতেও লাভ করা দুষ্কর।

হরিভক্তি এরূপ সুদুর্লভ হইলেও হরিনামের গুণে তাহা অনায়াসেই পাওয়া যায়। ইহা "নামে ভক্তি"-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে।

সংকীর্ত্তন।

কত বার, হরি ভবে আর, আমায় আসিতে হবে, হে ভববারণ।
আমায় চৌরাশী লক্ষ যোনি, ঘুরালে চক্রপাণি, চক্রে ফেলিয়ে;
এখন এ চক্র করহে নাথ সংবরণ॥
এই নিবেদন করি নারায়ণ।

আমায় আর যাতনা দিও না হে ;
যদি মানব-জনম, দিলে কৃপা করি,
দেখো দেখো হে, যেন আবার পতন না হয় হরি।
অশেষ পাপের পাপী, আমি ওহে হরি, তুমি তরাও যদি তবে তরি।
(নিজ গুণে তুমি তরাও যদি তবে তরি)
তব নামের বলে, শিলা ভাসে জলে ;
নামের গুণে যেন, আমি শরণ পাই ঐ চরণ-তলে।
অকূল পাথারে হরি, হাবুডুবু খেয়ে মরি ; আমায় তরাও তরাও হে ;
হায় হে আমায় তরাতে হবে ;
ঐ চরণ-তরণী দিয়ে আমায় তরাতে হবে ;
(তোমায়) স্বয়ং কর্ণধার হ'য়ে আমায় তরাতে হবে ;
হরি হে আমায় তরাতে হবে ;
ওহে অধম-তারণ, নরক-বারণ, পতিত-পাবন বিশ্বপতি।
(তরাও হে)
আমি বিপদে মগন, ওহে নারায়ণ, বিনে ও চরণ নাই হে গতি॥
(তরাও হে)
ত্রাহি মধুসূদন, বিপদ-ভঞ্জন, (আমায় দয়া করহে ;
আমার গতি নাই গতি নাই ;
আর আমার গতি নাই গতি নাই ;
তোমার চরণ বিনে, আর আমার গতি নাই গতি নাই)
শ্রীপদে স্থান দেহ হরি।
(যেন ভুলো না ভুলো না ;
শ্রীপদে স্থান দিতে যেন ভুলো না ভুলো না ;
শ্রীপদে স্থান দেহ হরি।)
এ ভব-সাগর, বিষম স্থদুস্তর, তরি যেন পেয়ে পদতরি॥

(আজ তোমার শরণ নিলাম হে ;
কাতর প্রাণে আজি তোমার শরণ নিলাম হে ;
এ বিপদে, তরি যেন পেয়ে পদতরি।)
আমি না জানি সাধন, না জানি ভজন,
না জানি পূজন, কুজন অতি।
সদা মহামোহবশে, বিষয়-বিষ-রসে,
মুগ্ধ আমার মূঢ় মতি ॥
তুমি নিজ গুণে হরি, একবার দয়া করি,
হৃদয় মন্দিরে এস আমার।
আমায় দিয়ে পদছায়া, ঘুচাও মহামায়া,
(আমার) দূরে যাক, মনের আঁধার ॥
আমি নয়ন মুদে, আপন হৃদে, দেখি তোমায় হরি।
তুমি দাঁড়াও বাঁকা হ'য়ে, রাধায় বামে ল'য়ে, যুগল-রূপ ধরি ॥
(ওহে ও রাধানাথ)
আমি সকল যন্ত্রণা ভুলি, হইয়ে কতূহলী, দুই বাহু তুলি ;
করি বদন ভরিয়ে হরি-সংকীর্ত্তন ॥ (সদা)

দোনো হাত জোড়া থা।

রাম সিংহ নামে এক খোট্টা কর্ম্মের জন্য নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিল। এক ঐশ্বর্য্যশালী দয়ালু পুরুষ, তাহার দুরবস্থা দেখিয়া, দয়া করিয়া, তাহাকে আপন নির্ম্মিত বিচিত্র উদ্যানে এক মনোহর ভবনে থাকিতে দিলেন। ঐ ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ ও আদেশ প্রতিপালন—এই উভয় কার্য্যের উপযোগী উৎকৃষ্ট ঢাল ও তরওয়াল তাহার হাতে প্রদান করিলেন।

রাম সিং সেরূপ গৃহে থাকিতে পাইয়া এবং সেই ঢাল-তরওয়াল হাতে পাইয়া, অহঙ্কারে বুক ফুলাইয়া, মোছ্ চুঙ্গ্রাইয়া, সদম্ভ পাদবিক্ষেপে মাটি কাঁপাইয়া বেড়াইত; আপনাকে মহাবীর বলিয়া পরিচয় দিত; ধরাকে শরা জ্ঞান করিত; কাহাকেও দৃক্‌পাত করিত না। কিন্তু সে সেই ঢাল-তরওয়ালের মর্ম্ম বুঝিত না; তাহাদের ব্যবহারও জানিত না;—ঢালে রুটীর আটা মাখিত, তরওয়ালে তরকারি কুটিত। এইরূপ করিয়া কাল-ক্রমে ঢালখানি ছিঁড়িয়াছিল, তরওয়ালখানিকেও ভোতা করিয়া ফেলিয়াছিল।

ঐ ভবনটি বহুমূল্য দ্রব্য-সামগ্রীতে সুসজ্জিত ছিল। একদিন পাঁচ ছয় জন দস্যু, ঐ ভবনে প্রবেশ করিয়া সমুদয় দ্রব্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে লাগিল। রাম সিং তাহা জানিতে পারিয়াও কিছু প্রতিকার করিল না; তাহাদিগকে কোনও বাধাও দিল না; ভয়ে লুকাইয়া রহিল। তাহারা সর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিলে পর, উঁকি ঝুঁকি মারিয়া, সিংহের পো বাহির হইল এবং ঢাল-তরওয়াল লইয়া দেউড়িতে দাঁড়াইল।

প্রাতঃকালে বাবু এই সংবাদ পাইয়া রাম সিংহকে ডাকাইলেন এবং তিরস্কার করিয়া কহিলেন—তুমি কি রকম লোক! তোমাকে যে আমি এতদিন ভরণপোষণ করিলাম, এমন উৎকৃষ্ট হাতিয়ার দিলাম, তাহার উপযুক্ত কার্য্য তুমি কি করিলে? পাঁচ ছয় জন বদমাইসকেও ভাগাইতে পারিলে না?

তখন রাম সিং হাত জোড় করিয়া কহিল,—ক্যা করেগা হুজুর! উস্ বখত্ হামরা দোনো হাত জোড়া থা,—এক হাত্‌মে ঢাল ঔর এক হাত্‌মে তরওয়াল থা।

এই কথা শুনিয়া, বাবু বিরক্ত হইয়া, পদাতিক দ্বারা গলা ধাক্কা দেওয়াইয়া, তাহাকে দূর করিয়া দিলেন এবং তাহার সে ঢাল-তরওয়ালও কাড়িয়া লইলেন। তাহার যে দুর্গতি, আবার সেই দুর্গতিই হইল।

সেইরূপ আমরাও কর্ম্মের জন্য (অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মের বশে) নানাস্থানে (অর্থাৎ নানা যোনিতে) ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী পরমকারুণিক পরমপুরুষ শ্রীহরি আমাদের দুর্গতি দেখিয়া, দয়া করিয়া, শেষে আমাদিগকে তাঁহার নির্ম্মিত বিচিত্র সংসার-উদ্যানে এই মানবদেহরূপ মনোহর ভবনে থাকিবার অধিকার দিয়াছেন; ইহার রক্ষণা-বেক্ষণ ও তাঁহার আদেশ (অর্থাৎ বেদবাক্য) অনুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন; এবং তদুপযোগী উৎকৃষ্ট বিবেক-ঢাল ও বুদ্ধি-তরবারিও আমাদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। আমরা এখন এই সকল পাইয়া অহঙ্কারে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছি; পশুপক্ষ্যাদি সর্ব্ববিধ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতেছি; পদভরে মেদিনী কম্পিত করিতেছি; ধরাকে শরাখানা দেখিতেছি, কাহাকেও দৃক্‌পাত করিতেছি না। কিন্তু যে ঢাল-তরওয়াল পাইয়াছি, তাহাদের মর্ম্ম বুঝি না; তাহাদের ব্যবহারও জানি না;—অসার সংসার-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া উভয়কেই অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছি।

আমাদের এই মানবদেহরূপ ভবন সর্ব্ববিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শম-দম-তিতিক্ষা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত। কামক্রোধাদি ছয় জন দস্যু ইহাতে প্রবেশ করিয়া সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হই-য়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াও তাহার কোনও প্রতিকার করিতেছি না; তাহারা সর্ব্বনাশ করিতেছে, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না; তাহাদিগকে বাধাও দিতেছি না; যেন ভয়ে লুকাইয়া আছি।

এইরূপে তাহারা যে দিন আমাদের সর্ব্বস্ব সংহার করিবে, সেই দিন সেই ভগবান্ আমাদিগকে ডাকাইয়া, তিরস্কার করিয়া, যখন বলিবেন— তোমরা কিরূপ লোক! এত দিন তোমাদিগকে যে ভরণপোষণ করিলাম, তোমাদের অধিকারে যে এমন শ্রেষ্ঠ বাসভবন, এমন উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র দিলাম, তাহার উপযুক্ত কার্য্য কি করিলে? ছয়টা-মাত্র দস্যু, তাহা-

দিগকেও তাড়াইতে পারিলে না। তাহারা তোমাদের চক্ষের উপর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল।

তখন আমরা সেই রাম সিংহের মত হাত জোড় করিয়া বলিব,—কি করিব প্রভু! আমাদের দু'হাতই জোড়া ছিল;—এক হাতে বিবেক-ঢাল, তাহা ছেঁড়া; আর এক হাতে বুদ্ধি-খাঁড়া, তাহারও ধার মোড়া।

এ কথা শুনিলে শ্রীহরি বিরক্ত হইয়া তখনই তাঁহার প্রধান পদাতিক যমকে আদেশ করিবেন—ঐ ঢাল-তরওয়াল কাড়িয়া লইয়া ইহাদিগকে দূর করিয়া দাও; যে ভবনে থাকিতে দিয়াছিলাম, তাহাতে আর প্রবেশ করিতে দিও না। তাহা হইলে আমাদের অনন্ত দুর্গতি হইবে! আবার চৌরাশীলক্ষ যোনি ঘুরিতে হইবে!!

অতএব সময় থাকিতে, রিপুগণ সর্ব্বস্ব অপহরণ না করিতে করিতে, বিবেক ও বুদ্ধির সাহায্যে সংসারকে অনিত্য ও অসার ভাবিয়া, ইহাতেই একান্ত আসক্ত না হইয়া, প্রতিদিন ক্ষণকালের জন্যও হরিকথার আলোচনা করিয়া, রিপুজয়ে, শমদমাদির উত্তেজনায় যত্নবান্ হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

——

ভক্তির সাধনা।

(ভগবদুক্ত)

সকাম ও নিষ্কাম ভক্তির লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিষ্কাম ভক্তিই উৎকৃষ্ট, সকাম ভক্তি নিকৃষ্ট। কিন্তু অগ্রে সকাম ভক্তির সাধনা না করিলে, নিষ্কাম ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। বৃক্ষের স্কন্ধ আশ্রয় না করিয়া একেবারেই তাহার শিখরে উঠিবার চেষ্টা যেমন নিস্ফল, অগ্রে সকাম ভক্তির অনুষ্ঠান না করিয়া নিষ্কাম ভক্তির অনুশীলনও সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর। ভক্তির সাধনা কি, তাহা ভগবান্ গীতাতে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত-চেতসাম্॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

যাহারা আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, অব্যভিচারী ভক্তিযোগে আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, হে অর্জ্জুন, আমি সেই মদ্গতচিত্ত ব্যক্তিদিগকে মৃত্যুযুক্ত সংসারসমুদ্র হইতে অচিরে উদ্ধার করিয়া থাকি। তুমি আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি দেহান্তে আমাতেই লীন হইবে, সন্দেহ নাই।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

হে অর্জ্জুন, যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিতে না পার, তবে অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর, অর্থাৎ আমাতে মন স্থির করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা কর।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে আমার কর্ম্মে রত হও। আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিতে করিতেও সিদ্ধি লাভ করিবে।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥

যদি আমার কর্ম্ম করিতেও অশক্ত হও, তবে যে কর্ম্মই কর, জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিবে। অর্থাৎ—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

যোগস্থ হইয়া, আসক্তি ত্যাগ করিয়া, এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমান ভাবিয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করাকেই যোগ বলে।

ভাবার্থ।—ভগবানের কর্ম্ম করিতে যদি ইচ্ছা না হয়, নাই হউক; কিন্তু জীব কর্ম্ম না করিয়া যখন থাকিতে পারে না, তখন তাহাকে যে কোনও কর্ম্ম করিতেই হইবে। অতএব যাহার যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়, সে সেই কর্ম্মই করুক। কিন্তু সেই কর্ম্মে সিদ্ধই হউক বা অসিদ্ধই হউক, তাহাতে হর্ষ বিষাদ শূন্য হইতে হইবে। কর্ম্মজন্য যে ফল, তাহাতে যদি আসক্তি না থাকে, তাহা হইলে হর্ষ-বিষাদও ঘটিবে না। এই ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। এই নিষ্কাম কর্ম্মই ভক্তির সাধনা। সকাম কর্ম্ম অর্থাৎ সংসারাসক্তিই ভক্তির প্রধান অন্তরায়। যথা—

সংসারাসক্তচিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥

পশ্চিম দিকে যে বস্তু আছে তাহা পাইবার ইচ্ছায় পূর্ব্বদিকে যে গমন করে, তাহার পক্ষে তাহা যেমন দুর্লভ, সেইরূপ সংসারাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে হরিভক্তিও সুদূরপরাহত। অধিক কি, মুক্তিকামনাও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যথা—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু।

পিশাচরূপিণী ভোগ-মোক্ষ-কামনা যত দিন হৃদয়ে থাকিবে, তত দিন ভক্তিসুখের উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু তাই বলিয়া ভগবৎ-প্রীতিকামনায় যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে সকাম কর্ম্ম বলে না। যে কর্ম্ম সংসারবন্ধনের কারণ, সেই কর্ম্মই সকাম কর্ম্ম। ভগবৎপ্রীত্যর্থ যে কর্ম্ম, তাহা বন্ধনের কারণ নহে বলিয়া তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্মই বলা যায়। যথা—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

গীতা।

(এখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতি) ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ কর্ম্ম ভিন্ন আর সমস্ত কর্ম্মই লোকের সংসারবন্ধনের কারণ। হে অর্জ্জুন, তুমি আসক্তিশূন্য হইয়া কেবল ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর।

আবার ইহাও বলি যে ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাও সহজ নহে। যে, যে কর্ম্মই করুক, ফললাভের আশা করিয়াই করিয়া থাকে। এইজন্যই বেদ প্রথমতঃ স্বর্গাদি-কামনায় যজ্ঞাদি-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিয়াছেন। ঐ সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া এবং তাহাতে প্রকৃত সুখ না পাইয়া, জীব ক্রমশঃ তাহাতে বীতস্পৃহ ও অপশ্রদ্ধ হইলে সকল কামনা হইতে বিরত হইবে। অতএব যত দিন ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে না পারা যায়, ততদিন বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই রত হইবে; নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—আমার কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে অভিলাষ, সর্ব্বদা আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, আমার স্তুতি, আমার পরিচর্য্যায় যত্ন, আমার নিকট অষ্টাঙ্গে প্রণাম, আমার ভক্তজনের পূজা, সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্বচিন্তা, আমার প্রীত্যর্থে নৃত্যাদি, আমার গুণবর্ণন, আমাতে চিত্তসমর্পণ, সকল কামনা পরিত্যাগ,

এবং আমার ভজনার্থে ভজনার বিরোধি—ধনোপার্জ্জনাদি কর্ম্ম, চন্দনাদি উপভোগ ও পুত্রাদির লালন-পালনজন্য সুখ বিসর্জ্জন করিলে আমাতে ভক্তি হয়। আমার প্রীতিকামনায় যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা দ্বারাও আমার প্রতি ভক্তি হইয়া থাকে। এরূপ ভক্তি যে লাভ করিতে পারে, তাহার আর সাধ্য বা সাধন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

(কপিলদেবোক্ত।)

ভগবান্ কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া জননী দেবহূতির নিকট ভক্তির সাধন এইরূপ বলিয়াছিলেন।—

নিষ্কামভাবে যথাবিধি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, আমার প্রতি ভক্তি হয়। মদীয় মূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তুতি ও অভিবাদন করিলে আমার প্রতি ভক্তি হয়। সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্ব ভাবনা করিলে আমার প্রতি ভক্তি হয়। বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন, ভোগে অনাসক্তি, মহতের সম্মান, দীনে দয়া, আত্মতুল্য জনে মৈত্রী, যম (অহিংসাদি), নিয়ম (শৌচাদি), আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন, অকপটভাব, সাধুসঙ্গ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ দ্বারা আমার প্রতি ভক্তি হয়।

আমি আত্মারূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছি, সুতরাং সর্ব্বভূতই আমার প্রতিমূর্ত্তি। অতএব ভূতগণকে অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তি আমার পাষাণাদি-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি অর্চ্চনা করে, তাহার সেই অর্চ্চনা ভস্মে ঘৃতাহুতি-প্রদানের ন্যায় নিষ্ফল জানিবে। যাহারা ভেদবুদ্ধি দ্বারা অন্যের প্রতি অবমাননা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে, তাহাদের মনে কখনও শান্তি ঘটে না। যাহারা অন্য দেবতাদির অবমাননা করিয়া, আমার মূর্ত্তিনির্ম্মাণ পূর্ব্বক বিবিধ উপচারে পূজা করে, তাহাদের সে পূজায় আমি প্রীতি-লাভ করিতে পারি না। আমিই সর্ব্বভূতে ও স্বীয় হৃদয়ে অবস্থান করি, ইহা যত দিন লোকে বুঝিতে না পারে, ততদিনই আমার মূর্ত্তিপূজা করিবার বিধি আছে। যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি দ্বারা আপনার ও অন্যের

প্রভেদ দর্শন করে, তাহাদের মৃত্যুভয় অনিবার্য্য। অতএব আমাকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া, অভেদজ্ঞানে সকলকে দান, মান ও মিত্রতাদ্বারা সমাদর করিবে।

অচেতন অপেক্ষা চেতন পদার্থ শ্রেষ্ঠ, চেতন অপেক্ষা প্রাণধারী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদিগের মধ্যে জ্ঞানবান্ (সামান্য-জ্ঞানবিশিষ্ট) শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানবান্ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়বান্ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়বান্দিগের মধ্যে স্পর্শজ্ঞ বৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ, স্পর্শজ্ঞ অপেক্ষা রসজ্ঞ মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ, রসজ্ঞ অপেক্ষা গন্ধজ্ঞ ভ্রমরাদি শ্রেষ্ঠ, গন্ধজ্ঞ অপেক্ষা শব্দজ্ঞ সর্পাদি শ্রেষ্ঠ, শব্দজ্ঞ অপেক্ষা রূপজ্ঞ বায়সাদি শ্রেষ্ঠ, রূপজ্ঞ অপেক্ষা উভয়পঙ্‌ক্তি-দন্তবিশিষ্ট প্রাণী শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে বহুপদ জন্তু শ্রেষ্ঠ, বহুপদ অপেক্ষা চতুষ্পদ শ্রেষ্ঠ,চতুষ্পদ অপেক্ষা দ্বিপদ শ্রেষ্ঠ। দ্বিপদের মধ্যে চতুর্ব্বর্ণ শ্রেষ্ঠ, চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞ অপেক্ষা বেদের অর্থজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, অর্থজ্ঞ অপেক্ষা সংশয়চ্ছেত্তা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা স্বধর্ম্মানুষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সঙ্গত্যাগী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা নিষ্কাম পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পরন্তু আমাতে যে মন, প্রাণ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সমর্পণ করে, সে তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যে আমাতে আত্মা ও কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ আমি আর কাহাকেও দেখি না। ঈশ্বর জীবাত্মা রূপে ইহার অন্তরে অবস্থিত আছেন—ইহা ভাবিয়া যে ব্যক্তি সকল পদার্থের নিকটেই প্রণত হয়, সেই ব্যক্তিই আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(প্রহ্লাদোক্ত।)

প্রণাম, স্তুতি, কর্ম্মসমর্পণ, পরিচর্য্যা, শ্রীচরণস্মরণ, লীলাকথাশ্রবণ—এই ষড়ঙ্গ সেবা দ্বারাই ভগবানে ভক্তিসঞ্চার হইয়া থাকে ; তদ্ভিন্ন হয় না।

চড়ক পর্ব্ব।

চড়কের অর্থ যাহাই হউক, উহার ইতিহাস যাহাই থাকুক, আমি তাহা বলিতে চাহি না। মূঢ়মতি আমি উহার অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছি, পাঠকগণের নিকট আজি তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

চড়ক পর্ব্ব প্রায় আগত হইল; পলের পর পল, দণ্ডের পর দণ্ড, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, অয়নের পর অয়ন অতিক্রম করিয়া, দেখিতে দেখিতে, এক বৎসর কাটিয়া গেল, আমাদের বয়স আর এক বৎসর বৃদ্ধি পাইল; রাশিচক্র আর এক পাক ঘুরিয়া আসিল। কিন্তু আমাদের পরমায়ু যে আর এক বৎসর কমিয়া গেল, সে বিষয়ে আমাদের ভ্রূক্ষেপ নাই; কে ও চক্র ঘুরাইল, তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই; এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা ক্রমশই যে, মৃত্যুর গভীর অন্ধকূপে অগ্রসর হইতেছি, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা নাই। তাই আমরা কাহাকেও মানি না, কাহাকেও গণি না, কাহারও প্রতি দ্বেষহিংসা ছাড়ি না; আত্মগরিমায় বিভোর হইয়া—ধন জন-যৌবনাদি-মদে মত্ত হইয়া রহিয়াছি; অধঃপাতে যাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া তুলিতেছি। আর কত কাল এমন উদাসীনভাবে থাকিব; কতকাল এরূপ হেলায় হারাইব; কত দিনই বা এ বিষম গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াইব!! আমরা পর্য্যায়ক্রমে একই ঋতু কতবার ভোগ করিয়াছি, আবার সেই সকল ভোগ করিতে চলিলাম; কিন্তু তাহাতে আমাদের হইয়াছে কি, হইতেছে কি, হইবেই বা কি, তাহা একবারও কি ভাবিয়া দেখিব না? আমরা সুখের জন্য এত আটুপাটু করিতেছি, তথাপি প্রকৃত সুখ পাইতেছি না কেন? দুঃখের হাত এড়াইতে পারিতেছি না কেন? আমাদের এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না কেন? এত চেষ্টা করিয়াও এ গোলকধাঁধার বাহিরে যাইতে পারিতেছি না কেন? তাহা কি একবারও ভাবিব না!

সে তত্ত্ব কি একবারও আলোচনা করিব না! না ভাবিলে যে উদ্ধার নাই; না চিন্তিলে যে নিস্তার নাই।

৩০ দিনে মাস ধরিলে ৩৬০ দিনেই বৎসর হয়, কিন্তু তাহা না হইয়া প্রতিবৎসরই ৫ দিন করিয়া বৃদ্ধি পায়—৩৬৫ দিনে বৎসর হইয়া থাকে। জগদীশ্বর দয়া করিয়া এই অতিরিক্ত ৫ দিন আমাদিগকে দিয়া থাকেন। তাহাদের অপব্যয় করা আমাদের উচিত নহে; তাঁহার দানের উদ্দেশ্য নিষ্ফল করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। আমরা ৩৬০ দিনই ত সংসারের কাজে মগ্ন আছি; হা সংসার, যো সংসার—করিয়া ছুটাছুটি করিতেছি। তবে এ অতিরিক্ত ৫ দিনও আবার তাহার মধ্যে পুরি কেন? যে সংসারের জন্য এত কষ্ট পাইতেছি, এত কর্ম্মভোগ করিতেছি,—এই উদ্বৃত্ত ৫ দিনে—এস, সকলে মিলিয়া একবার সেই সংসারের তত্ত্ব আলোচনা করি; পুরাতন ও নূতন বর্ষের এই সন্ধিক্ষণে অতীত জীবনের হিসাব বুঝিয়া দেখি; এবং ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয় করি।

কিন্তু তাহা এ ভাবে হইবে না। সমুদ্রে নিমগ্ন থাকিলে তাহার বিশালতা বুঝা যায় না; তাহার উত্তাল তরঙ্গমালা দৃষ্ট হয় না। অর্ণবপোতের অভ্যন্তরে থাকিলে তাহার গতি নিরূপণ করা যায় না। যাহারা পৃথিবীতে বাস করে, তাহারা পৃথিবীর আবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। সেইরূপ, আমরা সংসারে এইরূপে মজিয়া থাকিলে, সংসারের তত্ত্ব বুঝিতে পারিব না। তাই বলিতেছি,—যে ভাবে আছি, সে ভাবে থাকিলে তাহা বুঝিতে পারিব না; ভাবান্তর চাই। যদি সংসার-তত্ত্ব বুঝিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এস, এই ৫ দিনের জন্য একবার সংসার ছাড়িয়া দাঁড়াই; সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করি; গুরু-মোহান্তের নিকট গিয়া "আত্মগোত্রং পরিত্যজ্য শিবগোত্রে প্রবেশিতঃ" হই; যম-নিয়ম অবলম্বন করি, "শিবঃ পন্থাঃ" কি, তাহা জানিবার জন্য "শিব শিব" রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করি; বৈরাগ্য-বাণে বাক্‌পাণি-পাদ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বিদ্ধ করি;

অভিমানে উন্মত্ত হইয়া আপনাকে যে উচ্চপদে—মায়ারজ্জু-বিজড়িত অহঙ্কাররূপ যে বাঁশের ভারায়—উত্থিত মনে করিতেছি, তাহা হইতে ঝাঁপ খাই; অনাহত-পটহ-রবে উৎসাহিত হইয়া জ্ঞান-খড়্গের উপর পতিত হই; তাহার আঘাতে বক্ষের মোহাবরণ ফাটিয়া যাউক, চিৎ-জড়ের বন্ধন কাটিয়া যাউক, ভক্তির রুধিরধারা শতধারে ছুটিয়া বেরুক। তার পর এস, কাঁটাবনে গড়াগড়ি দিয়া, দেহাভিমান ঘুচিয়াছে কি না, একবার পরীক্ষা করি।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইব,—এ সংসার সুবিস্তীর্ণ ময়দান। তাহাতে ধর্ম্মার্থকাম—এই ত্রিবর্গরূপ স্তম্বগুচ্ছ আমূল ছিন্ন হইয়াছে; সুখ-দুঃখরূপ ফলও অপসারিত হইয়াছে। আর কিছুই নাই—সকলই শূন্য। যদিও প্রাক্তন-কর্ম্মরূপ মূলমাত্র কাহারও কিছু কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমাদের পদদলিত হইবে; আর অঙ্কুরিত হইতে পারিবে না।

তখন দেখিব—সুরম্য শস্যক্ষেত্র ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে; তাহাতে তৃণ নাই, বৃক্ষ নাই, লতা নাই, গুল্ম নাই, নদী নাই, পল্বল (ডোবা) নাই; কেবল অসার বিষয়প্রসারের অনন্তবালুকা-রাশি চৌদিকে ধূ ধূ করিতেছে; দুঃখের প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ডকিরণ তদুপরি বিকীর্ণ রহিয়াছে; সুদূরে আশার মরীচিকা সুমধুর হাস্য করিতেছে; আর তৃষ্ণার্ত্ত জনগণ তাহারই প্রলোভনে ভুলিয়া, রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া, কেবল প্রাণ হারাইতেছে।

আরও দেখিতে পাইব—সেই বিশাল মরুভূমির মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান অত্যুন্নত অভ্রঙ্কষ এক বিরাট্ মূর্ত্তি!! কি সুদীর্ঘ কলেবর! কি ভীষণ দশনরাজী!! কে ও মহাপুরুষ—বিশাল ভুজদণ্ড বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন! মায়ারজ্জু-নিবদ্ধ ঐ জীবকে, সেই ভুজদণ্ড বিলম্বিত করিয়া, বিঘূর্ণিত করিতেছেন!! উঁহাকে ত জানি না; উঁহাকে ত চিনি না; উঁহাকে ত কখন দেখি নাই; কে উনি!! এস, বিস্মিতহৃদয়ে

স্তিমিতলোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে, অর্জ্জুনের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, উঁহাকে জিজ্ঞাসা করি—

দ্যাবাপৃথিব্যো-রিদ-মন্তরং হি,
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং,
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥

হে মহাপুরুষ! তুমি একাই এই স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যভাগ জুড়িয়াছ, সকল দিঙ্মণ্ডল ব্যাপিয়াছ; তোমার এই অদ্ভুত উগ্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিভুবন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

নভস্পৃশং দীপ্ত-মনেকবর্ণং,
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা,
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥

তোমার কি গগনস্পর্শী দীপ্তিময় কলেবর! কতই তোমার বর্ণ! কি বিস্তীর্ণ বদনগহ্বর! কি উজ্জ্বল বিশাল নেত্র!! হে বিশ্বব্যাপিন্! তোমাকে দেখিয়া এতই ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি যে, ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না, এবং মনে শান্তি পাইতেছি না।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি,
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে. ন লভে চ শর্ম্ম,
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

বিকটদশনযুক্ত কালানল-সন্নিভ তোমার মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া আমি দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, শান্তিলাভেও সমর্থ হইতেছি না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো,
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং,
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥

হে উগ্রমূর্ত্তিধারিন্! তুমি কে আমায় বলিয়া দাও। হে দেববর! তোমায় প্রণাম করি; তুমি প্রসন্ন হও। কে তুমি আদিপুরুষ? তোমায় জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার কার্য্য কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

ঐ শুন—বজ্রনির্ঘোষসদৃশ ভীষণ "কড় কড়" রবে উনি কি উত্তর দিতেছেন—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

আমি উগ্রমূর্ত্তিধারী লোকক্ষয়কারী কালপুরুষ। সকল লোককে সংহার করাই আমার কার্য্য। সেই জন্য আমি এইখানে দাঁড়াইয়া আছি।

এই সংক্ষিপ্ত কথায় যদি সম্যক্ তত্ত্ব বুঝিতে না পার, তবে একবার কপিল দেবের বাক্য স্মরণ কর। তিনি বলিয়াছিলেন—

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ।
স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ।
ন চাস্য কশ্চিদ্দয়িতো ন দ্বেষ্যো ন চ বান্ধবঃ।
আবিশত্যপ্রমত্তোঽসৌ প্রমত্তজনমন্তকৃৎ॥
যদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যদ্ভয়াদ্ বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ॥
যদ্ বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ।
স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্ণন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥

স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধির্যতঃ।
অগ্নিরিন্ধে সগিরিভি-র্ভূর্ন মজ্জতি যদ্ভয়াৎ॥
অদো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মান্নভঃ।
লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্॥
গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিষ্বস্য যদ্ভয়াৎ।
বর্ত্তন্তেঽনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্॥
সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালো-ঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্॥

যিনি সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূতগণ দ্বারা ভূতগণকে সংহার করেন, যিনি সকলের আশ্রয়, যিনি যজ্ঞের ফলদাতা, যিনি বশীকারীদিগের বশীকর্ত্তা, তিনি কাল; তাঁহারই নাম বিষ্ণু। তাঁহার প্রিয় কেহ নাই, তাঁহার অপ্রিয় কেহ নাই, তাঁহার বন্ধু কেহ নাই। তিনি অন্তকারী, এবং স্বয়ং সাবধান থাকিয়া অসাবধান লোককে আক্রমণ করিয়া থাকেন। যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দেন, যাঁহার ভয়ে নক্ষত্র প্রকাশিত হয়, যাঁহার ভয়ে বৃক্ষ লতা ও ওষধী সকল যথাসময়ে ফলপুষ্প ধারণ করে, যাঁহার ভয়ে নদী সকল প্রবাহিত হয়, যাঁহার ভয়ে সমুদ্র আপন সীমা লঙ্ঘন করে না, যাঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, যাঁহার ভয়ে গিরিবৃন্দসহ পৃথিবী রসাতলে মগ্ন হয় না, যাঁহার আদেশে ঐ আকাশমণ্ডল জীবদিগকে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দিয়া থাকে, এবং মহত্তত্ত্ব স্বয়ং সপ্তধাতু-সমাবৃত অহংতত্ত্বময় স্বদেহ প্রস্তুত করিয়া লয়, এই চরাচর জগৎ যাঁহাদের বশে চলিতেছে - সেই ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার ভয়ে জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়াদি কার্য্যে বারং বার প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন,—সেই কালপুরুষ লোক দ্বারা লোককে সৃষ্টি করেন বলিয়া তিনি সকলের আদিকৃৎ (জন্মদাতা), কিন্তু নিজে অনাদি; তিনি মৃত্যু

ধারা অন্তকেরও অন্ত করেন বলিয়া অন্তকর, কিন্তু নিজে অনন্ত ও অব্যয়।

এখন ত সবিশেষ পরিচয় পাইলে? তবে চল, উঁহার পাদমূলে গিয়া প্রণত হইয়া অর্জ্জুনের কথায় বলি—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা,
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি,
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥

হে হৃষীকেশ! তোমার মহিমানুবর্ণনে জগদ্বাসী সকলেই যে আনন্দিত ও অনুরক্ত হয়, রক্ষোগণ ভীত হইয়া যে দিকে দিকে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ যে তোমার চরণে প্রণত হন, তাহা বিচিত্র নহে।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্,
গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস,
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ॥

হে মহাত্মন্! তুমি যখন ব্রহ্মারও জন্মদাতা, তখন গুরুরও গুরু। অতএব কিজন্য তোমাকে তাঁহারা প্রণাম না করিবেন? হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি পরব্রহ্ম, তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং তৎসমুদায়ের আদি কারণও তুমি।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ,
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম,
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

তুমি সকল দেবতার আদি; তুমি অনাদি পুরুষ; তুমি এই জগতের পরম আশ্রয়; তুমি জ্ঞাতা; তুমি জ্ঞেয়; তুমি পরম ব্রহ্ম। হে অনন্ত-মূর্ত্তে! তুমিই এই বিশ্বসংসার বিস্তার করিয়াছ।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে॥

তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি চন্দ্র, তুমি প্রজাপতি, তুমি প্রপিতামহ। তোমাকে সহস্রবার প্রণাম করি, আবার সহস্রবার প্রণাম করি, পুনরপি সহস্রবার প্রণাম করি।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

তোমার সম্মুখে প্রণাম করি; তোমার পশ্চাতে প্রণাম করি; হে সর্ব্বময়, তোমার সকল দিকেই প্রণাম করি। তোমার বীর্য্য অসীম, তোমার বিক্রম অমিত। সকলকে ব্যাপিয়া আছ বলিয়া তোমাকে সর্ব্বময় কহিয়া থাকে।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥

তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, তুমি পূজ্য, তুমি গুরু, তুমি গুরুর গুরু। হে অমিতপ্রতাপ! ত্রিভুবনে যখন তোমার সমান কেহ নাই, তখন তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহ-মীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥

তুমি ঈশ, তুমি উপাস্য। অতএব আমি সাষ্টাঙ্গপাতে প্রণাম করিয়া তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, সখা যেমন সখার দোষ মার্জ্জনা করে, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অতিক্রম সহ্য করে, সেইরূপ, হে দেব, তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা,
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং,
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছি; কিন্তু ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। হে দেব, আমি আর এ মূর্ত্তি দেখিতে সাহস করিতেছি না, আমাকে সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করাও। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্,
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন,
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥

আমি তোমার সেই কিরীটশোভিত, গদাযুক্ত, চক্রধর মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! সেই চতুর্ভুজরূপে একবার আবির্ভূত হও।

এই কথা বলিলে, শরণাগতবৎসল দয়াময় হরি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বলিবেন—

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো,
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং,
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥

আমার এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আর ব্যাকুল হইও না, আর হতবুদ্ধি হইয়া রহিও না। এখন ভয় পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়া আমার এই—সেই রূপ সন্দর্শন কর।

আমরা তখন—

সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্।
সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্॥
সমানকর্ণবিন্যস্ত-স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিভূষিতম্।
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্॥
দ্যুমৎকিরীটকটক-কটিসূত্রাঙ্গদাযুতম্।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্॥

সুশান্ত, সুগঠন, সুবদন, আজানুলম্বিত-সুন্দর-চতুর্ভুজ-বিশিষ্ট, সুন্দর-গ্রীবাযুক্ত, সুন্দর-গণ্ড-সমন্বিত, সুমধুর-হাস্যকারী, সুন্দরকর্ণযুগলে উজ্জ্বল

মকর-কুণ্ডলধারী, পীতাম্বর, ঘনশ্যাম, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও লক্ষ্মী দ্বারা বিরাজিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও বনমালায় বিভূষিত, চরণযুগলে নূপুরধারী, কৌস্তভমণির প্রভায় উদ্ভাসিত, উজ্জ্বল কিরীট-কটক-মেখলা ও অঙ্গদে সুশোভিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মনোহর, প্রসন্নবদন ও প্রসন্ননয়ন— এইরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিব।

আমরা ঘোর সংসারী, সংসারের মায়া সহসা ত্যাগ করিতে পারিব না। নববর্ষে আবার সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু দেখিও, যে চিত্র দেখিলাম, তাহা যেন চিরদিন স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে; যে রূপ দর্শন করিলাম, তাহা যেন কদাপি ভুলিয়া না যাই; হৃদয়মন্দিরে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেন সংসারের কার্য্য কবিতে পারি; এবং ত্রিসন্ধ্যায় যেন সেই হৃদয়ের দেবতাকে অকপট হৃদয়ে হৃদয়ের কথা জানাইতে পারি।

প্রাতঃসন্ধ্যায় তাঁহাকে বলিব—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব,
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং,
সংসারযাত্রা-মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

হে জগদীশ্বর, হে চৈতন্যময়, দেবাধিদেব, হে শ্রীকান্ত, হে বিষ্ণো! আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া তোমারই আদেশে, তোমারই প্রীত্যর্থে, সংসার যাত্রায় প্রবৃত্ত হই।

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় জানাইব—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

আমি ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই; অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও জানি, কিন্তু তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই; হে হৃষীকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যাহা করাইতেছ, আমি তাহাই করিতেছি।

এবং সায়ংসন্ধ্যায় কহিব—

যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি,
তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতং হি ফলভুক্,
ত্বমেব মধুসূদন॥

আমি যাহা করিলাম এবং যাহা করিব, তৎসমুদায় আমার করা নহে। হে মধুসূদন, সে সকলই তোমার করা; অতএব তুমিই তাহার ফলভাগী হও।

এইরূপ ভাবে কার্য্য করিলে আমাদিগকে আর পাপপুণ্যের ভাগী হইতে হইবে না; সুখ দুঃখের হাত আমরা অনায়াসেই অতিক্রম করিব। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরির চরণছায়া আশ্রয় করিয়া এ সংসার-মরুভূমিতে পরম সুখে বিচরণ করিতে পারিব—আনন্দময়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইব।

প্রার্থনা।

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতা-মমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণ-মুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্‌গুণকথামৃতপান-মত্তঃ॥

(ভাগবত)

সতত তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ
যে সব অমলচিত্ত সাধু মহাজন,
তাঁহাদের সঙ্গ যেন পাই নিরন্তর,—
হে অনন্ত, কৃপা করি দেহ এই বর।
তা হ'লে তোমার গুণকথামৃত-পানে
মত্ত হ'য়ে, তুচ্ছ করি দুরন্ত তুফানে,
ভীষণ দুস্তর এই ভব-পারাবার
সাঁতারিয়া অনায়াসে হ'য়ে যাব পার।

শ্লোক।

শ্রীগোবিন্দ-পদদ্বন্দ্ব-মধুনো মহদদ্ভুতম্।
যৎপায়িনো ন মুহ্যন্তি মুহ্যন্তি যদপায়িনঃ

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমল সুন্দর।
অপরূপ মধু তাহে ক্ষরে নিরন্তর॥
অন্য মধু পানে মোহ ঘটে অতিশয়।
যে না পান করে, তারি জ্ঞান ঠিক রয়॥

এ মধু করিলে পান মোহ পায় নাশ।
না খেলে কদাচ নহে জ্ঞানের প্রকাশ

ভক্তের লক্ষণ।

ভক্ত দ্বিবিধ—সগুণ বা সকাম, নির্গুণ বা নিষ্কাম। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণের অনুসারে সকাম ভক্ত ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যথা—

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥

যে ব্যক্তি ভেদদর্শী ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া হিংসা, দম্ভ অথবা মাৎসর্য্যের বশে আমাতে (ঈশ্বরে) ভক্তি করে, সে তামসিক ভক্ত।

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ॥

যে ব্যক্তি ভেদদর্শী হইয়া বিষয়, যশ অথবা ঐশ্বর্য্য কামনায় আমার (ঈশ্বরের) অর্চ্চনা করে, সে রাজসিক ভক্ত। এবং

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥

যে ব্যক্তি ভেদদর্শী হইয়া এবং প্রাক্তন কর্ম্মের ক্ষয় অথবা ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ উদ্দেশে কিংবা ঈশ্বরারাধনা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে ঈশ্বরের আরাধনা করে, সে সাত্ত্বিক ভক্ত।

নিষ্কাম ভক্তের লক্ষণ ভগবান্ উদ্ধবকে এইরূপ বলিয়াছেন—

কৃপালু-রকৃতদ্রোহ-স্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥

কামৈরহতধীদান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥

যিনি নিষ্কাম ভক্ত, তিনি—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥
জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

(১) কৃপালুঃ—অন্যের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না।

(২) সর্ব্বদেহিনাম্ অকৃতদ্রোহঃ—কোনও প্রাণীর অনিষ্ট করেন না।

(৩) তিতিক্ষুঃ—ক্ষমাশীল (অপকারীর অপকার করিতে অনিচ্ছুক)।

(৪) সত্যসারঃ—সত্যই তাঁহার স্থিরতা।

(৫) অনবদ্যাত্মা—অসূয়ারহিত (অন্যের প্রতি দোষারোপ করেন না)।

(৬) সমঃ—সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করেন।

(৭) সর্ব্বোপকারকঃ—সকলের উপকারী।

(৮) কামৈরহতধীঃ—বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত নহেন।

(৯) দান্তঃ—বাহ্যেন্দ্রিয় দমন করিয়া থাকেন।

(১০) মৃদুঃ—কঠিনচিত্ত নহেন।

(১১) শুচিঃ—সদাচার-সম্পন্ন।

(১২) অকিঞ্চনঃ—ধনাদি কিছুই গ্রহণ করেন না।

(১৩) অনীহঃ—সাংসারিক কার্য্যে চেষ্টাশূন্য।

(১৪) মিতভুক্—পরিমিতাহারী (যদ্দ্বারা প্রাণধারণমাত্র হয়, সেই পরিমাণে আহার গ্রহণ করেন)।

(১৫) শান্তঃ—মনকে দমন করিয়া রাখেন।

(১৬) স্থিরঃ—স্বধর্ম্মে স্থির।

(১৭) মচ্ছরণঃ—আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত।

(১৮) মুনিঃ—মননশীল (ভগবদ্ধ্যান-পরায়ণ)।

(১৯) অপ্রমত্তঃ—সাবধান (লক্ষ্যপথ হইতে যাহাতে ভ্রষ্ট না হন, তদ্বিষয়ে সদা সতর্ক)।

(২০) গভীরাত্মা—নির্বিকার।

(২১) ধৃতিমান্—বিপদেও ধৈর্য্যশালী।

(২২) জিতষড়্গুণঃ—ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে জয় করেন।

(২৩) অমানী—নিজের মান চাহেন না (আত্মাভিমান-শূন্য)।

(২৪) মানদঃ—অপরকে সম্মান প্রদান করেন।

(২৫) কল্পঃ—পরকে বুঝাইতে দক্ষ।

(২৬) মৈত্রঃ—বঞ্চনাশূন্য।

(২৭) কারুণিকঃ—দয়ার বশেই উপদেশাদি কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, লোভের বশে নহে।

(২৮) কবিঃ—সম্যক্ জ্ঞানী।

(২৯) মৎপ্রণীত বৈদিক ধর্ম্মের দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করিয়াও (অর্থাৎ অকরণে প্রত্যবায় ও করণে পুণ্যসঞ্চয় ভাবিয়াও) সে সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, আমার আরাধনাতেই সকল হইবে ভাবিয়া, যিনি কেবল আমাকেই (ঈশ্বরকেই) ভজনা করেন।

(৩০) আমার স্বরূপ বুঝিয়া অথবা না বুঝিয়াই যাঁহারা একাগ্রভাবে

আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত অর্থাৎ তাঁহারাই নিষ্কাম ভক্ত।

সকাম ভক্ত নিকৃষ্ট এবং নিষ্কাম ভক্ত উৎকৃষ্ট। সকাম ভক্তের উদাহরণ—ধ্রুব, এবং নিষ্কাম ভক্তের উদাহরণ—প্রহ্লাদ। এই জন্যই ধ্রুব অপেক্ষা প্রহ্লাদ উৎকৃষ্ট,—প্রহ্লাদই পরম সাধু,—এবং প্রহ্লাদই ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত।

ধ্রুব উৎকৃষ্ট পদের কামনায় শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন; প্রহ্লাদের কোনও কামনা ছিল না; তিনি নিষ্কাম ভাবেই হরি-আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই দুই মহাপুরুষের চরিত্র সমালোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। প্রথমতঃ ধ্রুবচরিত্র পর্য্যালোচনা করা যাউক। ধ্রুব প্রথমে তামসিক, তৎপরে রাজসিক এবং শেষে সাত্ত্বিক ভক্ত হইয়াছিলেন।—

তিনি প্রথমে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে সিংহাসনাধিরূঢ় পিতার উৎসঙ্গে উপবিষ্ট দেখিয়া মাৎসর্য্যের অর্থাৎ উত্তমের শুভদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অতএব "অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা" এই তামসিক ভক্তের লক্ষণ তাঁহাতে বর্ত্তিয়াছিল।

তার পর বিমাতা সুরুচি তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন, এবং কহিলেন যে, যদি রাজাসনে বসিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তপস্যা করিয়া আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর। রাজা সে সব কথা শুনিয়াও কোনও উত্তর দিলেন না—নীরবেই রহিলেন, ধ্রুবকে সান্ত্বনাও করিলেন না। তখন ধ্রুবের অতিশয় অভিমান হইল, তিনি পিতার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য পাইতে অভিলাষী হইলেন। সুতরাং তিনি তখন "বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা" এই রাজসিক ভক্তের লক্ষণে গিয়া পড়িলেন।

শেষে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মাতা সুনীতির কাছে আসিয়া সকল কথা কহিলেন। সুনীতি কহিলেন—"বাছা, অভিমান ত্যাগ কর।

সকলে স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। তুমিও সেই প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে ভাগ্যবতী সুরুচির গর্ভে না জন্মিয়া এ দুর্ভগার গর্ভে জন্মিয়াছ। অতএব যদি উচ্চ পদের কামনা থাকে, তবে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনা করিয়া কর্ম্ম ক্ষয় কর।" তখন ধ্রুব "কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য" হরি-আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সাত্ত্বিকভক্ত হইলেন।

কিন্তু প্রহ্লাদের ভক্তি সেরূপ নহে। প্রহ্লাদ নিষ্কাম ভক্ত ছিলেন। নিষ্কাম ভক্তের সেই ত্রিশ প্রকার লক্ষণ প্রহ্লাদে দেখিতে পাওয়া যায়।—

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর আদেশে যখন পুরোহিতেরা প্রহ্লাদের বিনাশার্থ মন্ত্রবলে কৃত্যা (অগ্নিময়ী দেবতা) উৎপাদন করিলেন, তখন সেই ভীমাকৃতি কৃত্যা শূলহস্তে আগমন করিয়া প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে সেই তীক্ষ্ণ শূল নিক্ষেপ করিল। কিন্তু ভগবৎপ্রভাবে সে শূল প্রহ্লাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াই শতখণ্ডে ভগ্ন হইয়া গেল। তার পর সেই কৃত্যা, নিষ্পাপ প্রহ্লাদের উপর প্রয়োগ করা জন্য অপরাধে, পুরোহিতগণকেই আক্রমণ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ তাঁহাদের সে যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহাদের অনিষ্টাচরণে ও প্রত্যপকার-সাধনেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি "হে কৃষ্ণ, রক্ষা কর; হে অনন্ত, রক্ষা কর" বলিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং সেই জ্বলন্ত অবস্থায় স্বয়ং তাঁহাদিগের চরণ ধরিয়া পড়িলেন। তাঁহার অঙ্গ-সংস্পর্শে পুরোহিতেরা তখনই সুস্থদেহ হইয়া উঠিলেন। অতএব প্রহ্লাদ—"কৃপালুঃ অকৃতদ্রোহঃ তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।"

প্রহ্লাদ গুরুগৃহে প্রেরিত হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে আনাইয়া কোলে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—বৎস, এতকাল তুমি যাহা অধ্যয়ন করিলে, তাহাতে কি সার কথা শিখিয়াছ, আমায় বল। প্রহ্লাদ বলিলেন—পিতঃ, আমি যে সার কথা শিখিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন—

অনাদিমধ্যান্তমজ-মবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি জগন্নাথং সর্ব্বকারণকারণম্॥

যাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, ও অন্ত নাই, যাঁহার ক্ষয় নাই ও বৃদ্ধি নাই, যিনি সকল কারণেরও কারণ, সেই জগন্নাথ অচ্যুতকে আমি প্রণাম করি।

দৈত্যরাজ এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। প্রহ্লাদের গুরুর প্রতি চাহিয়া কহিল—আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার পুত্রকে কি এই অসার কথা শিখাইয়াছেন? গুরু বলিলেন—মহারাজ! আমি উহাকে এরূপ শিখাই নাই। তখন দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে বলিল—প্রহ্লাদ, তোরে কে এমন কথা শিখাইয়াছে? তোর গুরু ত বলিতেছে—আমি শিখাই নাই। প্রহ্লাদ বলিলেন—

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে॥

পিতঃ, যিনি সকলের শিক্ষাদাতা ও সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, সেই হরি ভিন্ন কে কাহাকে শিক্ষা দিতে পারে?

দৈত্যরাজ কহিল—আমিই ত সকলের শিক্ষাদাতা, আমার সম্মুখে তুই যে হরির কথা বলিতেছিস্, সে হরি কে? প্রহ্লাদ বলিলেন,—

ন শব্দগোচরে যস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্।
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ॥

যাঁহার তত্ত্ব বাক্যের অগোচর, কেবল যোগীদিগের ধ্যানের গম্য, যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যিনি স্বয়ং এই জগৎ সেই হরি পরমেশ্বর।

দৈত্যরাজ কহিল—তোর কি মরিবার ইচ্ছা হইয়াছে? আমিই ত

পরমেশ্বর, আমা ভিন্ন আবার তোর কে পরমেশ্বর আছে? প্রহ্লাদ বলিলেন—

> ন কেবলং তাত মম প্রজানাং
> স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষ্ণুঃ।
> ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ
> প্রসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্॥

পিতঃ সেই পরমব্রহ্ম হরি কেবল আমারই পরমেশ্বর নহেন, তিনি আপনারও ধাতা, বিধাতা ও পরমেশ্বর। অতএব প্রসন্ন হউন; কিজন্য ক্রোধ করিতেছেন?

হিরণ্যকশিপু কহিল—ইহার হৃদয়ে কোনও পাপিষ্ঠ প্রবেশ করিয়াছে, সেই ইহাকে এরূপ কথা বলাইতেছে।

প্রহ্লাদ বলিলেন—

> ন কেবলং মদ্ধৃদয়ং স বিষ্ণুঃ
> আক্রম্য লোকান্ সকলানবস্থিতঃ।
> স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ সমস্তান্
> সমস্তচেষ্টাসু যুনক্তি সর্ব্বগঃ॥

পিতঃ, সেই হরি কেবল যে আমার হৃদয়েই প্রবিষ্ট আছেন, তাহা নহে; তিনি সর্ব্বভূতেই অবস্থিত আছেন, এবং আমাকে, আপনাকে ও অপর সকলকেই সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন।

যে হিরণ্যকশিপুর ভয়ে ত্রিভুবন কম্পিত, তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া বালক প্রহ্লাদ নির্ভীক-চিত্তে সত্যকথা কহিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। অতএব তিনি—"সত্যসারঃ।"

দৈত্যরাজের আদেশে গুরুরা যখন প্রহ্লাদকে নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত

করিলেন, তখন একবার হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে ডাকাইয়া নীতিশাস্ত্র-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে প্রহ্লাদ বলিলেন—

মামোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ।
গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতং মম॥
সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদদণ্ডৌ তথাপরৌ।
উপায়াঃ কথিতাঃ সর্ব্বে মিত্রাদীনাঞ্চ সাধনে॥
তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংস্তাত মা ক্রুধঃ।
সাধ্যাভাবে মহাবাহো সাধনৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণু-র্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ॥

গুরু আমাকে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন এবং আমিও তাহা শিক্ষা করিয়াছি; কিন্তু আমার মতে তাহা ভাল বোধ হইতেছে না। যেহেতু, যে মিত্র-প্রভৃতিকে বশ করিবার জন্য সাম দান ভেদ দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায় উক্ত হইয়াছে,—পিতঃ! ক্রোধ করিবেন না,—সে মিত্রাদি ত আমি দেখিতে পাই না। সুতরাং সাধ্যের অভাবে সাধনের প্রয়োজন কি, তাহা বুঝি না। সেই ভগবান্ হরি যখন আপনাতে আছেন, আমাতে আছেন এবং আর সকলেও আছেন, তখন এ আমার মিত্র, এ আমার শত্রু—এরূপ ভেদবুদ্ধি কেন?

পাছে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুদিগের বৃত্তি-বন্ধ করেন, সেই ভয়ে প্রহ্লাদ তাঁহাদের দোষ কাটাইবার জন্য অগ্রেই স্বীকার করিয়া লইলেন যে, গুরু আমাকে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন এবং আমিও তাহা শিক্ষা করিয়াছি। অতএব তিনি—"অনবদ্যাত্মা।"

দৈত্যরাজের আদেশে অসুরেরা অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করিল, তখন প্রহ্লাদ বলিলেন—

তাতৈষ বহ্নিঃ পবনেরিতোঽপি
ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোঽহম্।
পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি
শীতানি সর্ব্বাণি দিশাং মুখানি॥

পিতঃ, এই অগ্নি বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত হইলেও আমাকে দগ্ধ করিতেছে না। আমি মনে করিতেছি, যেন সুশীতল পদ্মপত্রের উপর আমি শুইয়া আছি। অতএব তিনি—"সমঃ।"

ভগবান্ হরি প্রত্যক্ষ ও প্রসন্ন হইয়া যখন প্রহ্লাদকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন তিনি অগ্রে ভক্তি-বরই চাহিলেন। ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া অন্য বর প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন—

ময়ি দ্বেষানুবন্ধোঽভূৎ সংস্তুতাবুদ্যতে তব।
মৎপিতুস্তৎকৃতং পাপং দেব তস্য প্রণশ্যতু॥
শস্ত্রাণি পাতিতান্যঙ্গে ক্ষিপ্তো যচ্চাগ্নিসংহতৌ।
দংশিতশ্চোরগৈর্দত্তং যদ্বিষং মম ভোজনে॥
বদ্ধা সমুদ্রে যৎ ক্ষিপ্তো যচ্চিতোঽস্মি শিলোচ্চয়ৈঃ।
অন্যানি চাপ্যসাধূনি যানি যানি কৃতানি মে॥
ত্বয়ি ভক্তিমতো দ্বেষা-দঘং তৎসম্ভবঞ্চ যৎ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রভো সদ্য-স্তেন মুচ্যেত মে পিতা।

হে দেব, আপনার ভজনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া আমার প্রতি আমার পিতার যে দ্বেষবুদ্ধি হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহার যে পাপ হইয়াছে, তাহা যেন নষ্ট হয়। তাঁহার আদেশে আমার অঙ্গে যাহারা অস্ত্র প্রহার করিয়াছিল, যাহারা আমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, যে সর্পগণ

আমাকে দংশন করিয়াছিল, যাহারা আমার ভোজনে বিষ প্রদান করিয়াছিল, যাহারা আমাকে বন্ধন করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল ও আমার উপর পাহাড় চাপা দিয়াছিল, আরও যাহারা যে যে অত্যাচার আমার উপর করিয়াছিল, তাহারা তত্তৎ অপরাধ জন্য পাপ হইতে মুক্ত হউক। এবং আপনার ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ করায় আমার পিতার যে পাপ হইয়াছে, হে প্রভো, আপনি দয়া করিয়া আমার পিতাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করুন।

যে পিতা চিরদিন তাঁহার উপর প্রাণান্ত-কর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছেন, সেই পিতার হিতসাধনে পরাঙ্মুখ হইলেন না এবং শস্ত্রপাতাদির কথা উল্লেখ করিয়া পিতার আদেশে যাহারা সেই সকল অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদেরও মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। অতএব তিনি—"সর্ব্বোপকারকঃ।"

গুরুরা প্রহ্লাদকে বুঝাইতে লাগিলেন,—বৎস তুমি ত্রিভুবন-বিখ্যাত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তোমার পিতা; তিনি সর্ব্ব-লোকের অধিপতি; তুমি হরিনাম ত্যাগ কর, তাহা হইলে তুমিও এই পদের – এই অতুল ঐশ্বর্য্যের—অধিকারী হইবে। কিন্তু তথাপি প্রহ্লাদ হরিনাম ছাড়িলেন না; সে অতুল ঐশ্বর্য্যের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি হরি-ভজনেই রত থাকিলেন। অতএব তিনি—"কামৈঃ অহতধীঃ দান্তঃ।"

কৃত্যাদগ্ধ গুরুগণের প্রতি তাদৃশ আচরণে এবং তাঁহার অঙ্গস্পর্শে গুরুগণের পুনরুজ্জীবনেই জানা গিয়াছে যে, তিনি—"মৃদুঃশুচিঃ।"

তিনি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচার্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহেই বাস করিয়াছিলেন। অতএব তিনি—"অকিঞ্চনঃ অনীহঃ মিতভুক্ শান্তঃ।"

তাদৃশ অসহনীয় অত্যাচারেও তিনি হরিভজন ত্যাগ করেন নাই। অতএব তিনি—"স্থিরঃ।"

তিনি সর্ব্বদাই শ্রীহরির শরণাগত এবং সততই তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। অতএব তিনি—"মচ্ছরণো মুনিঃ।"

হরিভক্তি হইতে যাহাতে ভ্রষ্ট না হন, সেজন্য সর্ব্বদাই—"অপ্রমত্তঃ।"

ভীমাকৃতি দৈত্যগণ দৈত্যরাজের আদেশে শতসহস্র শস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে কাটিতে উদ্যত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার হৃদয়ে ভয় নাই, চিত্তে চাঞ্চল্য নাই। অতএব তিনি—"গভীরাত্মা।"

শত শত বিপদ্ ঘটিয়াছে, কিছুতেই অধীর হন নাই। অতএব তিনি —"ধৃতিমান্।"

প্রহ্লাদ বহুবৎসর সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন থাকিয়াও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন নাই, অতুল ঐশ্বর্য্যের আশা পরিত্যাগ করিয়াও শোকমোহে অধীর হন নাই, এবং সহস্র উপায়েও তাঁহার জরা-মৃত্যু ঘটে নাই। অতএব তিনি —"জিতষড়্গুণঃ।"

দৈত্যরাজের আদেশে দিগ্গজেরা প্রহ্লাদকে ভূতলে ফেলিয়া দন্ত-প্রহার করিতে থাকিলে, তাহাদের দন্ত সকল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন প্রহ্লাদ তাঁহার পিতাকে বলিলেন—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাত-বিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥

এই হস্তীদিগের বজ্রসম কঠিন দন্ত সকল যে ভগ্ন হইয়া গেল, ইহা আমার ক্ষমতায় নহে। যাঁহাকে স্মরণ করিলে সকল বিপদ দূরীভূত হয়, সেই শ্রীহরির স্মরণ-প্রভাবেই এরূপ ঘটিয়াছে।

আবার কৃত্যাও যখন নিষ্ফল হইয়া গেল, তখন গুরুমুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রহ্লাদ!

তোর এরূপ ক্ষমতা কিরূপে হইল ? ইহা কি তোর স্বভাবসিদ্ধ ? না, মন্ত্রাদি-জনিত ?

প্রহ্লাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন—

ন মন্ত্রাদিকৃতষ্ঞৈতৎ ন বা নৈসর্গিকং মম।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতো হৃদি ॥

ইহা মন্ত্রাদিজনিতও নহে, এবং আমার স্বভাবসিদ্ধও নহে। যাহাদের হৃদয়ে হরি বিরাজ করেন, তাহাদেরই এইরূপ শক্তি জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিতেই সকল হইতেছে, ইহাতে আমার শক্তি কিছুই নাই।

তাঁহার এই সকল কথা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি—"অমানী।" এবং তিনি গুরুগণের ও তাদৃশ অত্যাচারী পিতার নিকটেও সতত বিনীত ও প্রণত ছিলেন। অতএব তিনি—"মানদঃ।"

প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া দৈত্যবালকগণকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপদেশের বলে তাহাদেরও মতি ফিরিয়াছিল,—তাহারাও হরিভক্তি-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উপদেশপ্রদান-কালে প্রহ্লাদ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—

শ্রূয়তাং পরমার্থো মে দৈতেয়া দিতিজাত্মজাঃ।
ন চান্যথৈতন্মন্তব্যং নাত্র লোভাদি কারণম্ ॥

হে অসুরবালকগণ, তোমরা আমার নিকট সত্য কথা শ্রবণ কর। ইহা অন্যবিধ মনে করিও না। কারণ, গুরুরা বৃত্তির লোভে তোমাদিগকে দৈত্যরাজের আদেশ মত অসদুপদেশও প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার সেরূপ কোনও লোভ নাই।

এখন দেখুন, তিনি কেমন—"কল্পঃ মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ।"

অপিচ, তিনি অসুর-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, আসুরিক ধর্ম্ম—অধিক

কি সর্ব্বধর্ম্ম—পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল হরিভক্তিতেই রত হইয়াছিলেন, এবং অশেষ বিপদে পড়িয়াও কখনও বিপদুদ্ধারের প্রার্থনা করেন নাই—নিজের প্রাণভিক্ষা চান নাই—"হরি আমায় রক্ষা কর" এ কথা একবারও মুখে বা মনে আনেন নাই। কেবল একাগ্রমনে তাঁহার ভজনা করিয়াছিলেন। অতএব তিনি—"পরম সাধু"—"সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ভক্ত।"

সকাম ভক্ত নিকৃষ্ট বলিয়া ভগবানের কৃপাভাজন নহেন, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। সেই ভক্তবৎসল সকল ভক্তের প্রতিই দয়া করিয়া থাকেন। যে যাহা কামনা করিয়া তাঁহার আরাধনা করে, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন, নিষ্কাম ভক্তকে মুক্তি প্রদান করেন। তাহা না হইলে ধ্রুব উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিলেন কিরূপে?

তিনি অন্যান্য সকল ভক্তের যে কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাও পরে প্রকাশ করা যাইবে।

এক সময়ে দেবতারা শ্রীহরির উদ্দেশে বলিয়াছিলেন,—

সতাং দিশত্যর্থিত-মর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতা-মনিচ্ছতাম্
ইচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥

ভগবানের নিকট যে যাহা কামনা করে, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন; কিন্তু পরমার্থ যে তাঁহার পদপল্লব, তাহা তিনি দেন না; সেজন্য তাহাকে পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিতে হয়। কিন্তু নিষ্কাম ভক্তগণ প্রার্থনা না করিলেও ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাহাদিগকে সর্ব্বাভীষ্টপূরক স্বীয় শ্রীপদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন।

ভগবান্ স্বমুখে প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন,—

প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোঽহমস্তেঽসুরোত্তম।
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম্॥

* * * *

প্রীণন্তি হ্যথ মাং ধীরাঃ সর্ব্বভাবেন সাধবঃ।
শ্রেয়স্কামা মহাভাগ সর্ব্বাসামাশিষাং পতিম্॥

ভদ্র প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হউক; হে অসুরশ্রেষ্ঠ, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর। আমি লোকের সকল কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকি। * * * হে মহাভাগ, আমার সাধু ভক্তগণ, আমাকে সকল বর প্রদানে সমর্থ জানিয়া, শ্রেয়ঃ কামনায় সর্ব্বান্তঃকরণে আমার ভজনা করিয়া থাকেন।

এক সময়ে মহারাজ মুচুকুন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন,—

বরান্ বৃণীষ্ব রাজর্ষে সর্ব্বান্ কামান্ দদাম্যহম্।
মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিৎ ন ভূয়োঽর্হতি শোচিতুম্॥

হে রাজর্ষে, যে বর তোমার অভিমত হয়, সেই বর প্রার্থনা কর। আমি সকল বরই দিয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার ভজনা করে, আমি তাহাকে এমন অক্ষয় বর প্রদান করি যে, তাহাকে আর সেজন্য কখনই দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

যে, যে ভাবে অর্থাৎ যে কামনায় আমার ভজনা করে, আমি তাহার সেই কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকি।

অতএব শুকদেবের কথায় সকলকে বলি—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

যাঁহার কোনও কামনাই নাই, অথবা যাঁহার নানাপ্রকার কামনা আছে, কিংবা যিনি মুক্তি কামনা করেন. তিনি একান্ত ভক্তিযোগে পরমপুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করুন।

প্রার্থনা।

স ত্বং হি নিত্যবিজিতাত্মগুণঃ স্বধাম্না
কালো বশীকৃত-বিসৃজ্য-বিসর্গশক্তিঃ।
চক্রে বিসৃষ্ট-মজয়েশ্বর ষোড়শারে
নিষ্পীড্যমান-মুপকর্ষ বিভো প্রপন্নম্॥

(ভাগবত)

আপন শক্তিতে তুমি ওহে শক্তিধর,
বুদ্ধিগুণ-গণে জয় কর নিরন্তর।
কার্য্য আর কারণের শক্তি সমুদয়,
আত্মবশে রাখিয়াছ জানি হে নিশ্চয়।
মায়ার ঈশ্বর তুমি, তুমিই সে কাল,
তোমার রচিত এই সংসার বিশাল।
ষোল-পাখি * এই চক্র অতীব ভীষণ,
তব চক্রে তাহে আমি প'ড়েছি এখন।

* পঞ্চ ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—এই ষোড়শ বিকারই সংসার-চক্রের পাখি।

কাতর হইয়া তার তীব্র নিষ্পেষণে,
শরণ লইনু এবে তোমার চরণে।
সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি আজি দয়া করি,
আপনার কোলে মোরে টেনে লও হরি।

"কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্"।

(গোবিন্দাষ্টকম্)

সর্ব্ববিঘ্নপ্রশমনং সর্ব্বাপদ্বিনিবারণম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥১

সকল বিঘ্নের শান্তি হইবে তোমার।
আপদ্ বিপদ্ কিছু না রহিবে আর ॥
সর্ব্বপাপ-ক্ষয়ে হবে পুণ্যের সঞ্চার।
গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার ॥

যদি মজ্জন্তমাত্মানং দুষ্পারে ভবসাগরে।
উদ্ধারয়িতুকামোঽসি কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥ ২

সুদুস্তর-ভবসিন্ধু-সলিলে পড়িয়া।
ভাব না কি? দিন দিন যেতেছ ডুবিয়া ॥
বাসনা থাকয়ে যদি পাইতে উদ্ধার।
গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার ॥

করালবদনং কালং প্রসার্য্য করমন্তিকে।
বর্ত্তমানং সদা দৃষ্ট্বা কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥৩

চক্ষু মেলি একবার দেখ না চাহিয়া
করালবদন কাল হাত বাড়াইয়া॥
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে নিকটে তোমার।
গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার॥

আধিব্যাধি-পরাভূতঃ শোকদুঃখনিপীড়িতঃ।
শান্তিমিচ্ছসি চেন্নিত্যং কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥৪

আধি-ব্যাধি-অভিভূত হয়ে নিরন্তর।
শোক-দুঃখে হইতেছ সদা জরজর॥
শান্তিলাভে ইচ্ছা যদি থাকয়ে তোমার।
গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার॥

বৃথা ভ্রমসি রে মূঢ় মনস্তুচ্ছসুখাশয়া।
লপ্স্যসে পরমং সৌখ্যং কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥৫

সামান্য সুখের আশে, ওরে মূঢ় মন।
কেন বৃথা ইতস্ততঃ করিস্ ভ্রমণ॥
পাইবি পরম সুখ, কহিতেছি সার।
গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল্ অনিবার॥

সরসাং রসনাং প্রাপ্য মাস্বাদয় বৃথারসান্।
অনুত্তমং রসং প্রাপ্তুং কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥৬

সরস রসনা যদি পেয়েছ এমন।
করিও না তবে বৃথা রস আস্বাদন॥
পাইবে এ হেন রস সর্ব্বরস-সার।
গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার॥

ধর মূর্দ্ধনি নির্ম্মাল্যং, স্মর পাদসরোরুহম্।
হর কালং সদানন্দঃ, কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥ ৭

গোবিন্দ-নির্ম্মাল্য শিরে করহ ধারণ।
গোবিন্দের পাদপদ্ম করহ স্মরণ ॥
সদানন্দ হ'য়ে কাল কর পরিহার।
গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার ॥

উরু-সংসার-কান্তারে পুরুতাপ-প্রপীড়িতঃ।
গুরু-কল্পতরোর্মূলে কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥ ৮

সংসার-দুর্গমপথে করি বিচরণ।
তাপত্রয়ে হইতেছ মুগ্ধ অনুক্ষণ ॥
গুরু কল্পতরু, বসি পদতলে তাঁর।
গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার ॥

দশচক্রে ভগবান্ ভূত।

উক্ত প্রবাদের মূলে একটি প্রচলিত ইতিহাস আছে। তাহা এই —কোনও রাজার সভায় ভগবান্ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা ও তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিমত্তা, এই উভয় গুণে রাজা তাঁহার অত্যন্ত বশতাপন্ন হইয়াছিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ইহাতে অমাত্যপ্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মচারিবর্গ তাঁহার উপর ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সকলে একমতাবলম্বী হইয়া তাঁহার রাজসভায় আগমন নিবারণ করিতে কৃতসংকল্প হইল। কিছুদিন পরে ভগবান্ পীড়িত হইলেন। রাজা সে সংবাদ পাইয়াই ব্যাকুলচিত্তে

রাজবৈদ্যকে আদেশ করিলেন,—"যাহাতে ভগবান্ পণ্ডিত শীঘ্র আরোগ্য লাভ করেন, তাহার চেষ্টা করুন। চিকিৎসা ও পথ্য সম্বন্ধে কোনওরূপ ত্রুটি না হয়।" কর্ম্মচারীরা ইহা একটি উত্তম সুযোগ বুঝিল। ১০।১২ দিন পরে তাহারা একবাক্যে রাজাকে জানাইল—ভগবান্ মরিয়া গিয়াছেন। রাজবৈদ্যও সেই বাক্যের সমর্থন করিলেন। এই সংবাদে রাজা নিতান্ত অধীর হইয়া তাঁহার জন্য বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া প্রকৃতিস্থ করিল।

সেই ষড়্যন্ত্র-কারীরা একে একে ভগবানের নিকটে গিয়া কহিল যে, আপনার অনুপস্থিতিকালে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া সভাপণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া গিয়াছেন; তাহাতে রাজা বিশেষ লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া আপনার উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। অধিক কি, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আপনার আর মুখ দর্শন করিবেন না; এবং দ্বারবান্দিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, আপনি যদি কোনও দিন রাজদ্বারে উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ অপমানিত করিয়া আপনাকে তাড়াইয়া দিবে।

এই কথা শুনিয়া ভগবান্ পণ্ডিত মর্ম্মাহত হইলেন, এবং বৃত্তিবন্ধ হওয়ায় সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহেও বিশেষ ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। কষ্ট যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি একদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন; কিন্তু দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব শিক্ষিত দ্বারীরা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিল না। অগত্যা তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। একে রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছেন, তাহার উপর আহারাদির ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ; এই সকল কারণে তিনি নিতান্ত মলিন ও শীর্ণকায় হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, কোনও উপায়ে একবার রাজদর্শন পাইলে উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া বিনয়-সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

একদিন সায়ং সময়ে রাজা শকটারোহণে পারিষদবর্গ-সমভিব্যাহারে

বায়ু-সেবনে বহির্গত হইয়াছেন। ভগবান্ পণ্ডিত এই সংবাদ পাইয়া রাজদর্শনার্থ বহির্গত হইলেন ; কিন্তু সে নিবিড় জনতা ভেদ করিয়া রাজার নিকট যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ভাবিয়া, পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া রাজাকে কহিলেন —মহারাজ লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলাম, ভগবান্ পণ্ডিত মরিয়া ভূত হইয়াছে এবং প্রতিবেশিবর্গের বাটীতে বিবিধ উৎপাত অরাস্ত করিয়াছে। কিন্তু আমরা সে কথায় এতদিন বিশ্বাস করিতাম না। আজ প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিশ্বাস হইল। ঐ দেখুন, ভগবান ভূত হইয়া ঐ বেল গাছে বসিয়া আছে ; উহার নিকট যাইবার সময় বোধ হয় আপনার উপর অত্যাচার করিবে। অন্যান্য পারিষদগণও অমনি বলিয়া উঠিল—হাঁ মহারাজ, আমরাও শুনিয়াছিলাম ভগবান্ ভূত হইয়াছে। তাহা সত্য কথা । ঐ যে গাছের উপর দাঁড়াইয়া আছে। কি লম্বা ঠ্যাং ! কি কুটুরে চোক ! কি মূলার মত দাঁত !!

সকলের মুখে ঐ কথা শুনিয়া রাজা ভীত হইলেন, আর অগ্রসর না হইয়া শকট ফিরাইতে আদেশ করিলেন। তখন ভগবান্ নিতান্ত দুর্ব্বলতাবশতঃ ক্ষীণ স্বরে "মহারাজ, মহারাজ" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। রাজা আরও ভীত হইয়া, সে দিকে না চাহিয়া দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন।

এইরূপে দশজনের চক্রে পড়িয়া জীবিত ভগবান্ ভূত হইয়া গেলেন।

উল্লিখিত ইতিহাস ভিন্ন আমরা ইহার আরও একটি ইতিহাস পাইয়াছি। তাহাই প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সে ইতিহাস এই—ভগ শব্দে অসীম প্রভুত্ব, অসীম বীর্য্য, অসীম, যশ, অসীম সৌন্দর্য্য, অসীম জ্ঞান ও অসীম বৈরাগ্য—এই ছয়টি গুণকে বুঝায়। এই ছয়টি গুণ ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাতেই সম্ভবে না। এই ছয়টি গুণ বর্ত্তমান থাকায় ঈশ্বরকে ভগবান্ বলে। সেই ঈশ্বরের যে অসাধারণ শক্তি, তাহাকে মায়া বা প্রকৃতি বলে। প্রকৃতির তিনটি গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

সেই তিন গুণে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। প্রকৃতি দ্বিবিধা—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিক্ষেপশক্তিকে বিদ্যা এবং আবরণশক্তিকে অবিদ্যা বলে। বিদ্যা স্বরূপকে প্রকাশ করিয়া দেয়, এবং অবিদ্যা স্বরূপকে আবরণ করিয়া রাখে। এই দ্বিবিধ শক্তি অনুসারে ঈশ্বরও দ্বিবিধ হইয়াছেন—জীব বা আত্মা এবং পরমেশ্বর বা পরমাত্মা। যিনি স্বেচ্ছাক্রমে প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তন্নির্ম্মিত ভৌতিক দেহে প্রবৃষ্ট হন, তাঁহাকে জীব বলে; এবং যিনি প্রকৃতিকে আপন বশে রাখিয়া তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করাইয়া থাকেন, তাঁহাকে পরমেশ্বর কহে। একই ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্যনীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে একই সময়ে এই দ্বিবিধ মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন। জীবোপাধি ভগবান্ মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যান; যে দেহে তিনি বাস করেন, সেই দেহে বুদ্ধি দ্বারা যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তিনি আপনাকে তাহার কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া মনে করেন; সুতরাং কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারে লিপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি যে অকর্ত্তা অভোক্তা ও নির্লিপ্ত, তাহা তাঁহার মনে থাকে না; এই জন্য দেহেই তাঁহার 'অহং'বুদ্ধি হয় এবং দেহেই তাঁহার 'মমত্ব' বোধ জন্মে। অতএব দেখুন, সেই ভগবান্ সর্ব্বভূত-মহেশ্বর হইয়াও, ভূতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—এই দশের চক্রে পড়িয়া আপনিই ভূত হইয়া রহিয়াছেন।

এক ভূতে পাইলে রক্ষা নাই, তাঁহাকে পঞ্চভূতে পাইয়াছে। এই পঞ্চভূতের হাত এড়াইতে না পারিলে তাঁহার উদ্ধার নাই। এ ভূত ছাড়াইবার একমাত্র ওঝা—সাধু পুরুষ; একমাত্র মহৌষধি হরিভক্তি; এবং একমাত্র মহামন্ত্র—হরিনাম। সাধু-সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহার মুখে হরিনাম-মহামন্ত্র শুনিয়া, হৃদয়ে ভক্তিরূপ মহৌষধি বাঁধিয়া রাখিলে, সকল ভূত ছাড়িয়া যাইবে; আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে; তাহাতেই মুক্তিলাভ ঘটিবে।

প্রার্থনা।

বাণী গুণানুকথনে, শ্রবণৌ কথায়াং,
হস্তৌ চ কর্ম্মসু, মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং, শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে,
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শতেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥

(ভাগবত)

বাক্য যেন করে তব গুণের বর্ণন।
কর্ণ যেন তব কথা করয়ে শ্রবণ॥
হস্ত যেন তব কর্ম্ম করে অনুক্ষণ।
মোদের মানস যেন স্মরে ও চরণ॥
তোমার আবাস ভাবি চরাচর যত,
সবার নিকটে শির রহে যেন নত॥
তব প্রতিমূর্ত্তি হয় যত সাধুজন।
তাঁদের দর্শন যেন পায় এ নয়ন॥

দ্বিপদ পশু।

শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন,—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসা-মুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥

ঐ যিনি প্রতিদিন উদিত ও অস্তগত হইতেছেন, উনি ঐরূপ করিয়া

লোকের আয়ুঃ হরণ করিতেছেন; কিন্তু যে ব্যক্তি হরিকথায় ক্ষণকালও যাপন করে, তাহার আয়ুঃ হরণ করিতে পারেন না।

ভাবার্থ—হরণের অর্থ চুরি করা। চোরে যে ধন চুরি করে, তাহা ধনস্বামীর দানেও আসে না, ভোগেও আসে না; সুতরাং তাহা বৃথা যায়। সেইরূপ, যাহারা হরিকথায় পরাঙ্মুখ, তাহাদের আয়ুঃ সূর্য্যের উদয়াস্তে বৃথা অতিবাহিত হইয়া থাকে। আরও সূর্য্যের উদয়াস্ত-অনুসারে দিন, মাস, বৎসর ইত্যাদিক্রমে লোকের আয়ুঃ ক্ষয় পায়, তাহারা ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়; কিন্তু যাঁহারা হরিকথায় রত থাকেন, তাঁহাদের আয়ুঃ ক্ষয় পায় না, তাঁহারা মৃত্যুমুখে অগ্রসর হন না; তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। এ জন্য সূর্য্য তাঁহাদের আয়ুঃ ক্ষয় করিতে সমর্থ হন না! অতএব যাঁহারা মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের হরিকথার আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তরবঃ কিংন জীবন্তি, ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥

তরুসকল কি জীবন ধারণ করে না? ভস্ত্রাগুলা (কর্ম্মকারের যাঁতা) কি শ্বাস ফেলে না? গ্রামের অন্যান্য পশুরা কি খায় না ও মলমূত্র ত্যাগ করে না?

ভাবার্থ।—কেবল জীবনধারণ করা অর্থাৎ দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকাই যদি মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হয়, তবে বৃক্ষ অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ কিসে? কারণ, কতশত বৃক্ষ কতশত বৎসর জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নাই; সুতরাং সেই সকল বৃক্ষকে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যদি শ্বাস পরিত্যাগ করাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হয়, তবে ভস্ত্রায় ও মনুষ্যে প্রভেদ কি? ভস্ত্রাগুলাও ত শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্য করিয়া থাকে। আর যদি আহার ও মলমূত্র ত্যাগ করাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হয়,

তবে অন্যান্য গ্রাম্য পশু হইতে মনুষ্যের পার্থক্য কিসে? 'অন্যান্য' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, হরিকথায় পরাঙ্মুখ মনুষ্য-সকল দ্বিপদ পশু বলিয়া গণ্য। সেই দ্বিপদ পশুরা যেমন আহার গ্রহণ ও মলমূত্র বিসর্জ্জন করিতে পারে, চতুষ্পদ পশুরাও ত সেইরূপ সকলই করিয়া থাকে; তবে আর সে দ্বিপদ পশুতে ও চতুষ্পদ পশুতে প্রভেদ রহিল কোথায়?

শ্ব-বিড়্‌বরাহোষ্ট্র-খরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ কদাপি যাহার কর্ণপথে প্রবেশ না করেন, সেই মনুষ্য পশু বলিয়া গণ্য; এবং কুক্কুর, বিড়্‌বরাহ অর্থাৎ বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্যশূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ তাহাকে স্তব করে অর্থাৎ আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে।

ভাবার্থ—নৃসিংহপুরাণে উক্ত আছে—"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্। ধর্ম্মো হি তেষা-মধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সামানাঃ॥" (আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন পশুদিগেরও যেমন, মনুষ্যদিগেরও সেইরূপ আছে। বেশীর ভাগ কেবল মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম আছে, পশুদিগের ধর্ম্ম নাই। অতএব যে সকল মনুষ্য ধর্ম্ম আচরণ না করে—সর্ব্বধর্ম্মের সারভূত ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহারা পশুদিগেরই সমান)। সেই জন্যই বলা হইয়াছে, যাহার কর্ণকুহরে কখনও হরিকথা প্রবেশ করে নাই, সে দ্বিপদ পশু।

তাহাদিগকে কুক্কুরে স্তব করে। কুক্কুরের স্বভাব এই যে, সে গৃহস্থের গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে; চোর আসিলে চীৎকার করিয়া গৃহস্থকে সতর্ক করিয়া দেয়। কিন্তু তথাপি গৃহস্থ তাহার আহার বিষয়ে যত্ন লয় না; অশ্রদ্ধা-সহকারে অসময়ে অপবিত্র স্থানে অতি সামান্য আহার দিয়া থাকে। তাহাও উৎকৃষ্ট নহে; সকলের উচ্ছিষ্ট, ভুক্তাবশিষ্টমাত্র। তাহাও

আবার প্রত্যহ নহে; যে দিন কাহারও পাতে কিছু না থাকে, সে দিন তাহার ভাগ্যে একাদশী। বাটীর কর্ত্তার অবস্থাও সেইরূপ। তিনি সকলকে খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন; সকলের ভরণ-পোষণের জন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহ যত্ন করিয়া খাইতে দেয় না। উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য পুত্র, কন্যা, জামাতা ও কুটুম্বেরা খাইলে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবেই তিনি কিঞ্চিৎ পাইলেন; নচেৎ যাহা জুটিল, তাহাতেই উদরপূর্ত্তি করিলেন। তিনি যদি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হন, তাহা হইলে ত লাঞ্ছনার শেষ থাকে না। কর্ত্তা হইয়াও তিনি কুত্তা হইয়া পড়েন। তথাপি তিনি সংসারের জন্যই বিব্রত, সংসারের চিন্তাতেই সর্ব্বদা নিমগ্ন; হরিকথা শুনিতে, হরিনাম জপিতে, ক্ষণমাত্র অবসর পান না। তাই কুক্কুর বলে—আমরা কোন্ ছার কুকুর; হরিকথায় পরাঙ্মুখ যে মানব, সেই আসল কুকুর।

গ্রাম্য শূকরের স্বভাব এই যে, তাহাকে যদি রমণীয় পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করান যায়, সেখানে সে পুষ্পের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে চাহে না, তাহার সৌরভে আকৃষ্ট হয় না; কেবল বিষ্ঠারই অনুসন্ধান করে, বিষ্ঠাকেই পরম উপাদেয় ভাবিয়া থাকে। সেইরূপ সংসারী মানব এই সুরম্য সংসার-উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি-কৌশলের প্রতি দৃক্পাত করে না; ইহার অন্তরে তাঁহার যে প্রেমের সৌরভ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতেও আকৃষ্ট হয় না। এখানে আসিয়া সে অনুসন্ধান করিতেছে কেবল বিষয়। সেই বিষম বিষময় বিষয় ভোগের লালসায় অহোরাত্র অশেষবিধ দুঃখ অনুভব করিতেছে, তথাপি সর্ব্বদুঃখহারিণী হরিকথা শ্রবণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। তাই শূকর বলে—হরিকথা-বিমুখ যে মানুষ, তার মত শূয়ার জগতে নাই।

উষ্ট্র স্বভাবতঃ কণ্টকপ্রিয়, কাঁটাপালা খাইতে বড়ই ভালবাসে। সে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, উত্তম লতাপাতা ছাড়িয়া, কেবল কাঁটাপালা

টানিয়া ভক্ষণ করে। তাহাতে তাহার জিহ্বা ক্ষতবিক্ষত হয়, সে কতই যন্ত্রণা ভোগ করে; কিন্তু পরক্ষণেই —যন্ত্রণার একটু উপশম হইলেই— আবার অন্য কাঁটাপালা ধরিয়া টানিতে থাকে। সেইরূপ, মনুষ্য এই সংসারকাননে প্রবেশ করিয়া, মধুর হরিকথা ছাড়িয়া, ঈশ্বরারাধনার কণ্টকস্বরূপ স্ত্রীপুত্রের লালনপালনেই আসক্ত হয়। তাহাদিগকেই পরম প্রীতিপ্রদ ভাবিয়া হৃদয়ে ধারণ করে। কিন্তু সেই স্ত্রীপুত্র হয় ত দুর্ব্যবহার করিয়া কিংবা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিল, সুদারুণ শোকশল্যে বিদ্ধ করিয়া তাহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল; তথাপি সে নিবৃত্ত নহে। পরক্ষণেই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়া, অন্য পুত্রকে টানিয়া লইয়া, আবার বক্ষে ধারণ করিয়া থাকে। তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইয়া শান্তিবিধায়িনী হরিকথায় আসক্ত হয় না। তাই উষ্ট্র বলে—হরিকথায় বিমুখ যে মানব, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উষ্ট্র।

গর্দ্দভ শীতাতপ সহ্য করিয়া রজকের ভার বহন করে। তাহাতে তাহার কিছুমাত্র লাভ নাই। আহার লাভের প্রত্যাশাও নাই। রজক তাহাকে খাইতে দেয় না। সে ক্ষেত্রে বিচরণপূর্ব্বক স্বোদর পূর্ণ করিয়া পরের ভার বহন করে। সেইরূপ, সংসারী মনুষ্যও সেবাবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা বহুকষ্টে নিজের আহার চালাইয়া স্ত্রীপুত্রাদির জন্য মাথায় মোট বহিয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে। যিনি এ ভার অর্পণ করিয়াছেন তাঁহার উপর সকল ভার সমর্পণ করিয়া, তাঁহার কথা লইয়া কালযাপন করিলে যে কোনও দুঃখই পাইতে হয় না, তাহা ক্ষণকালের জন্যও সে ভাবিয়া দেখে না। তাই গর্দ্দভ বলে—আমরা কি গাধা; হরিকথায় বিমুখ যে মানব, তার মত গাধা দুনিয়ায় নাই।

অতএব এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া যদি ইহার সার্থকতা সম্পাদনে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে হরিকথায় রত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রকাশ দ্বারা এই দুঃখসঙ্কুল সংসার-

বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে চেষ্টা করা নিতান্তই আবশ্যক। সমুদায় ইন্দ্রিয়গুলিকে তাঁহার সেবার নিযুক্ত রাখিতে পারিলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি করা হয়। ভগবান্ মনুষ্যকে যত ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, অন্য কোনও প্রাণীকে তত দেন নাই। এই জন্যই মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া যে মানবদেহ লাভ করা যায়, তাহা স্বীয় সাধনার উপযোগী করিবার জন্যই সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর মনুষ্যকে এই সকল ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন) সুতরাং তাঁহাতে আসক্ত না হইতে সমুদায় ইন্দ্রিয়ই নিরর্থক বলিয়া জানিবে।

বিলে বতোরুক্রম-বিক্রমান যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন যোপগায়ত্যুরুগায়-গাথাঃ ॥

(ভাগবত)

হে সূত, মনুষ্যের যে কর্ণদ্বয় হরিকথা শ্রবণ না করে, তাহা কর্ণ নহে ; তাহা গর্ত্ত। এবং যে জিহ্বা হরিকথা উচ্চাচরণ না করে, তাহা ভেক-জিহ্বার ন্যায় অনিষ্টকারিণী।

ভাবার্থ।—কোনও গৃহে গর্ত্ত থাকিলে, তাহাদের কোনটাতে মূষিক ও কোনটাতে সর্প প্রবেশ করে। সুযোগ পাইয়া সেই মূষিক গৃহস্থের বহুমূল্য বস্ত্রাদি কাটিয়া নষ্ট করে, এবং সর্পও দংশন করিয়া প্রাণান্ত ঘটায়। সেইরূপ, যে কর্ণে হরিকথা প্রবেশ না করে, সেই কর্ণ দুইটি এই দেহরূপ গেহের গর্ত্তস্বরূপ। তাহাদের একটিতে কুপত্নীর বা কুলোকের কুপরামর্শরূপ মূষিক প্রবেশ করিয়া সময়ক্রমে পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, বন্ধুবাৎসল্যপ্রভৃতিরূপ বহুমূল্য বস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়া নষ্ট করিয়া থাকে। এবং

অন্তটিতে বৈষয়িককথারূপিণী ভুজঙ্গী প্রবেশ করিয়া কালক্রমে কালের গ্রাসে নিক্ষেপ করে।

তার পর জিহ্বার কথা। জিহ্বা দ্বারা চর্ব্বণের সাহায্য হয় ও ভোজ্য বস্তুর স্বাদ অনুভব করা যায়। ভেক কিন্তু ভক্ষ্য দ্রব্য গিলিয়া খায়; সুতরাং তাহার জিহ্বা চর্ব্বণে ও আস্বাদ গ্রহণে সহায়তা করে না। তবে ঐ জিহ্বার সাহায্যে সে একপ্রকার শব্দ করিয়া থাকে। সে শব্দে কাহারও কর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না, বরং বিরক্তই হয়; সুতরাং তাহা তাহার নিজের বা অন্যের কোনও উপকারেই আসে না; প্রত্যুত তাহার নিজের অনিষ্টই করিয়া থাকে,—ক্ষুধার্ত্ত সর্প সেই শব্দের অনুসরণে গিয়া তাহাকে গ্রাস করে। সেইরূপ, যাহার জিহ্বা হরিকথা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বৈষয়িক কথাবার্ত্তাতেই রত থাকে, যমদূতেরা আসিয়া তাহাকে কালপাশে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। যেহেতু যমরাজ স্বীয় কিঙ্করগণকে সেইরূপই আদেশ করিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

তে দেবসিদ্ধ পরিগীত-পবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে।

যে সমদর্শী সাধুগণ ভগবানের শরণাগত, দেবগণ ও সিদ্ধগণও তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকটে তোমরা যাইও না। তাঁহারা হরিকথা দ্বারাই সুরক্ষিত থাকেন। তাঁহাদের দণ্ড-বিধানে আমিও সমর্থ নহি, কালও সমর্থ নহে।

তানানয়ধ্ব-অসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দ-মকরন্দ-রসাদজস্রম্।

নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈ রসজ্ঞৈ-
র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥

অকিঞ্চন ও অনাসক্ত পরমহংসগণের সেবিত হরিপাদপদ্মের মধুপানে বিরত হইয়া যাহারা নরকের পথস্বরূপ গৃহেই সদা আসক্ত আছে, সেই অসৎদিগকেই তোমরা আনয়ন করিবে।

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্-গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্ব-মসতোঽকৃত-বিষ্ণুকৃত্যান্ ॥

যাহাদের জিহ্বা একবারও হরিগুণ বা হরিনাম কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার চরণারবিন্দ স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে না, যাহাদের হস্ত একদিনও বিষ্ণু-কার্য্য করে না, সেই অসৎদিগকেই তোমরা আনয়ন করিবে।

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টম্
অপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎ-কাঞ্চন-কঙ্কণৌ বা ॥

যে মস্তক মুকুন্দ-চরণারবিন্দে প্রণত হয় না, তাহা উষ্ণীষ ও মুকুটে পরিশোভিত হইলেও নিতান্তই ভারস্বরূপ। যে করদ্বয় হরির পূজা না করে, তাহা স্বর্ণবলয়ে উদ্ভাসিত হইলেও শবের হস্তস্বরূপ।

ভাবার্থ।—ভার যতক্ষণ স্কন্ধোপরি থাকে, ততক্ষণ বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়; স্কন্ধ হইতে ভার নামাইলেই সে কষ্ট দূর হইয়া থাকে। সেইরূপ হরি-প্রণাম-পরাঙ্মুখ মস্তক যতক্ষণ স্কন্ধে থাকে, ততক্ষণ বিবিধ ক্লেশ প্রদান

করে। কারণ, মস্তকই বুদ্ধি ও চক্ষুরাদি উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয় সকলের আধার; সেইজন্য মস্তকের একটি নাম উত্তমাঙ্গ। উত্তমাঙ্গ হইলেও তাহা যদি পুরুষোত্তম শ্রীহরির চরণসঙ্গ না করে, নিকৃষ্ট বিষয়সঙ্গেই নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে অশেষ দুঃখ উপস্থিত হয়। সুতরাং তাদৃশ মস্তককে সুতীক্ষ্ণ-শস্ত্র-প্রহারে স্কন্ধচ্যুত করিয়া ভারলাঘব করাই কর্ত্তব্য।

শবের হস্ত যেরূপ অপবিত্র, হরিপূজা-বিবর্জ্জিত হস্তও সেইরূপ অপবিত্র। সাধুগণ সে হস্তের জল গ্রহণও করেন না।

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥

মনুষ্যদিগের যে নয়নদ্বয় বিষ্ণুর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ না করে, তাহা ময়ূর-পুচ্ছের নেত্রস্বরূপ। এবং মানবগণের যে পদদ্বয় শ্রীহরির ক্ষেত্রে অর্থাৎ বৃন্দাবনাদি ধামে গমন না করে, তাহা বৃক্ষমূল-স্বরূপ।

ভাবার্থ।—ময়ূরপুচ্ছে যে সকল নেত্র অর্থাৎ চন্দ্রক আছে, তদ্দ্বারা যেমন দর্শনকার্য্য হয় না, সেইরূপ যে চক্ষু বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন না করে, তদ্দ্বারা প্রকৃত দর্শনকার্য্য সিদ্ধ হয় না। এবং বৃক্ষের মূল যেমন ক্রমশঃ নিম্নাভি-মুখেই গমন করে, সেইরূপ যে পদদ্বয় তীর্থক্ষেত্রে গমন না করিয়া ধনো-পার্জ্জনাদি বৈষয়িক কার্য্যের অনুরোধে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে, তাহা নরকাভিমুখেই যাইতে থাকে।

জীবন্ শবো ভাগবতাঙ্ঘ্রি-রেণূন্
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলষেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপাদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসন্ শবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥

যে মনুষ্য ভগবদ্ভক্তগণের চরণধূলি অভিলাষ না করে, সে জীবন্মৃত। এবং যে মনুষ্য বিষ্ণুপাদপদ্মে সমর্পিত তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ না করে, সেও জীবন্মৃত।

ভাবার্থ।—মৃত ব্যক্তির চন্দনাদি অনুলেপনে অভিলাষ থাকে না, কুসুমের সৌরভ অনুভূত হয় না। শ্মশানের অপবিত্র ধূলিতেই তাহার দেহ আচ্ছন্ন থাকে, এবং পূতি-বায়ুই তাহার নাসিকায় প্রবেশ করে। সেইরূপ হরিভক্তি-হীন সংসারী মানবও সাধুগণের চরণধূলি দ্বারা অঙ্গ পবিত্র করিতে ইচ্ছুক হয় না, শোণিত-শুক্রাদি-নির্ম্মিত মলমূত্রাধার অপবিত্র পুত্রকলত্রের দেহই তাহার অঙ্গসংলগ্ন হয় এবং তাহাদের ক্লেদগন্ধ-পরিপূর্ণ শ্বাসপ্রশ্বাসই তাহার নাসাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্ গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু কম্পঃ॥

হরিনাম-শ্রবণে যৎকালে ভক্তগণের নেত্রে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চরূপ বিকার উপস্থিত হয়, তৎকালেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, হায়! সে হৃদয় পাষাণময় জানিবে।

ভাবার্থ।—নবজলধরের উদয়ে যখন বর্ষাকাল সমাগত হয়, তখন আকাশ হইতে জলধারা পতিত ও তরুগণ কম্পিত হইতে থাকে; কিন্তু পাষাণ সমভাবেই অবস্থান করে। সেইরূপ নবজলধরকান্তি শ্রীহরির নামসংকীর্ত্তনে যখন ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে, তখনও অভক্তের হৃদয় পাষাণবৎ স্থিরভাবেই অবস্থান করে।

অতএব কায়, মন ও বাক্যে হরিভজন করাই সংসারী মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা করিলেই তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অম্বরীষ

রাজা ঠিক এইরূপ সাধনা করিয়াই জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির-মার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্র-স্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ॥

তিনি হরিপাদপদ্মে মন, হরিগুণানুকীর্ত্তনে বাক্য, হরিমন্দিরমার্জ্জনে করদ্বয় এবং হরিকথাশ্রবণে কর্ণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরির শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীমন্দির দর্শনে চক্ষুঃ, হরিভক্তগণের গাত্রস্পর্শে অঙ্গ, হরিপাদপদ্মের সৌরভযুক্ত তুলসীর গন্ধে নাসিকা এবং হরি-নৈবেদ্য ভোজনে রসনা অর্পণ করিয়াছিলেন। হরির ক্ষেত্রে গমনে পদদ্বয় ও হরিপাদপদ্ম-প্রণামে মস্তক অর্পণ করিয়া, হরি-নির্ম্মাল্য চন্দনাদিই উপভোগ করিতেন; বিলাসের জন্য সে সকল ভোগ করিতেন না। এইরূপ করিয়া তিনি ভগবদ্ভক্ত-গণের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

—

সংকীর্ত্তন

দীননাথ দিন গেল হে, কি হবে এ দীনের গতি, ভাবি তাই।
গেছে কত দিন, ভুলেও কোনো দিন,
দীন-দয়াময় ব'লে তোমায় ডাকি নাই ॥ (ওহে)
পাইয়ে সংসার-ভার, অসারে ভেবেছি সার,
তব পদ সারাৎসার, বারেক না ভাবি মনে।
ভুলিয়ে মায়ার ঘোরে, কাঞ্চনে ফেলিয়ে দূরে,
কাচেরে ধ'রেছি শিরে, পরম যতনে ॥
তুমি অগতির গতি জানি হে দয়াময়।
তাই করি হে মিনতি, ওহে বিশ্বপতি,
(আমার) ও চরণে মতি যেন হয় ॥ (কৃপাময়) (দয়াময়)
তুমি দয়া না করিলে, মন তো ও চরণে নাহি যাবে,
(আমার) গতি তবে কি হবে হে ;
(কৃপাময়) (দয়াময়)
ওহে নারায়ণ, করি নিবেদন,
যেন চরমে অভয় চরণ-কমল পাই ॥ (ওহে) (দেখো)

রথযাত্রা।

"ও বাছা, দাঁড়াও দাঁড়াও ; একটা কথা শোন।" কলিকাতার জগন্নাথ-ঘাটের কাছে কোনও ব্যক্তি এক বৃদ্ধাকে এই কথা কহিল।

বৃদ্ধা।—এখন ভিক্ষে টিক্ষে দিতে পার্‌ব না বাপু!

ব্রাহ্মণ।—বাছা আমি ভিক্ষা চাই না ; তোমায় একটা কথা ব'ল্‌ব।

বৃদ্ধা।—কথা টথা বুঝেছি। তোমার গলায় পৈতে দেখ্‌ছি। গলায় দ'ড়েদের ভিক্ষে করাই ব্যব্‌সা।

ব্রাহ্মণ।—বাছা সত্যই ব'লেছ। এ কালে এই গলায় দ'ড়েদের ঐ ব্যবসাই হ'য়েছে বটে। সেকালে ব্রাহ্মণদের সম্মান ছিল; দেশ কাল পাত্র বুঝে সকলেই ব্রাহ্মণদিগকে যথাসাধ্য দান করিত। রাজা ও ধনবানেরা পর্য্যাপ্ত অর্থ প্রদান ক'রে বিপন্ন ব্রাহ্মণদের সাহায্য ক'র্‌তেন। তাতে ব্রাহ্মণরা স্বচ্ছন্দে থেকে শাস্ত্র আলোচনা ক'র্ত্তেন, ধর্ম্মাচরণে রত থাক্‌তেন। এখন আর সে কাল নাই। এখন সাত্ত্বিক দান প্রায় উঠেই গেছে। তামসিক দানের মাত্রাই চ'ড়েছে। তাই ব্রাহ্মণরাও উদরান্নের জন্যে লালায়িত। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাই তারা এখন স্বধর্ম্ম ছেড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ ক'চ্চে—কৃষি, বাণিজ্য ও চাকৃরিতে প্রবৃত্ত হ'চ্চে। কেহ কেহ ভিক্ষা করে বটে; কিন্তু সে পেটের জন্যে নয়। তারা বেশ জানে, খেতে না পেয়ে ম'রে গেলেও, কেহ তাদের এক পয়সা দেবে না। তারা ভিক্ষা করে—কলসীর জন্যে। তারা ভাবে—"ভগবান্ আমাদের যে কুলে জন্ম দিয়াছেন, তাতে ত বিনা পয়সায় দড়ি মিলেছে; এখন কলসী কেন্‌বার পয়সাটা জুটলেই মা গঙ্গার শরণ নিয়ে উদ্ধার পাই"। তা বাছা, তোমার কোনও ভয় নাই। যদিও আমার সে অভাব আছে; তবু আমি তোমার কাছে কিছু চাইব না। বিশ্বাস না হয়, এই পৈতে ছুঁয়ে শপথ ক'চ্চি। তোমাকে কেবল একটা কথা ব'ল্‌ব।

বৃদ্ধা।—আমার সঙ্গীরা সব চ'লে গেল, আমি এখন দাঁড়াতে পার্‌ব না বাপু!

ব্রাহ্মণ।—তারা কত দূর গিয়েছে?

বৃদ্ধা।—ঐ যাচ্চে। আমরা আরমানির ঘাটে জাহাজে উঠ্‌ব।

ব্রাহ্মণ।—তোমারা কোথায় যাবে?

বৃদ্ধা।—আমরা ফেত্তোর যাব, ফতে ফগন্নাথ দর্শন ক'র্‌ব (বুড়ীর

শাশুড়ীর নাম ক্ষেত্রমণি, তাই তাকে ক্ষেত্র বলিতে নাই; তার শ্বশুরের নাম রতন, তাই সে রথ বলে না; এবং তাহার ভাসুরের নাম জগন্নাথ বলিয়া তাহাকে ও নামটাও করিতে নাই।) আমি বুড়ো মানুষ; ওদের সঙ্গে সমান চ'ল্‌তে পারিনি, তাই পেছ্‌য়ে প'ড়েচি।

এই বলিতে বলিতে সেই ভগ্নকটি বৃদ্ধা বামহস্তে কক্ষস্থিত গাঁটুরি ও দক্ষিণ হস্তে যষ্টি ধারণ করিয়া ছুটিতে লাগিল। ব্রাহ্মণও তাহার পিছু পিছু চলিল। বৃদ্ধা ঘাটে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই জাহাজ ছাড়িয়া দিল। তাহার সঙ্গিনীরা তাহার অপেক্ষা না করিয়াই তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিয়া পড়িল। জাহাজ ঝপ্‌ ঝপ্‌ করিয়া তফাতে গেল; বৃদ্ধাও ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া বুক ও মাথা চাপ্‌ড়াইয়া কাঁদিতে বসিল।

ব্রাহ্মণ।—ব'সে কাঁদ্‌লে আর কি হবে বাছা! এখন যাতে রথে জগন্নাথ দেখ্‌তে পাও, তার উপায় কর।

বৃদ্ধা।—আর কি উপায় আছে বাবা?

ব্রাহ্মণ।—আছে বৈকি! ভেবো না, আমি তোমায় উপায় ক'রে দিব।

বৃদ্ধা।—বাবা! তোমার পায়ে ধরি। তুমি আমার উপায় ক'রে দাও।

ব্রাহ্মণ।—তবে চল, ঐ চাঁদনির ভিতর ঠাণ্ডায় একটু ব'স্‌বে চল। তোমার বড় কষ্ট হ'য়েছে দেখ্‌ছি। গাঁটুরিটা আমিই নিয়ে যাচ্চি।

বুড়ীর বড় কষ্টও হ'য়েছিল এবং বিনা ভাড়ায় মুটেও জুটিল; তাই সে অগত্যা ব্রাহ্মণকে গাঁটরিটা দিতে কোনও আপত্তি করিল না। কিন্তু তাহা হইতে কি একটা বাহির করিয়া লইল।

ব্রাহ্মণ।—ও কি? টাকা বুঝি?

বৃদ্ধা।—না বাবা! টাকা পেট-কাপড়ে বাঁধা আছে। এটা গুলের কৌটো।

ব্রাহ্মণ!—বাছা, গাঁটরিটা দিতে বিশ্বাস হ'ল; তবু গুলের কৌটটা

দিতে বিশ্বাস হ'ল না !! (বোচ্‌কা তুলিয়া) উঃ ! এটা ভারী ত কম নয় !! আধ মণের উপর হবে। এতে এত কি আছে বাছা ?

বৃদ্ধা।—এমন কিছুই নেই। নাচ রেক মুড়ি আছে, নাচটা ঝুনো নারিকেল আছে (বুড়ীর স্বামীর নাম পাঁচকড়ি, তাই সে পাঁচকে নাচ্‌ বলে), শুক্‌নো গুড় সের খানেক আছে—রাস্তায় জল টল খেতে। আর চা'লটে, ডা'লটে, বেগুনটো, আলুটা, নুনটা, লঙ্কাটা কিছু কিছু আছে। আর বাবা ! হাতাটা, বেড়িটা, বোক্‌নাটা, ঘটীটা, বাটীটা, কাপড় চোপড়টাও নিতে হয়েছে।

ব্রাহ্মণ।—এমন ক'রে বোচ্‌কা বাঁধ্‌লে কি জগন্নাথ দেখা যায় বাছা ?

বৃদ্ধা।—কোথাও বেরুতে হ'লে ও সব চাই। সবাই ওরকম বাঁধে। আমার সঙ্গীরাও বেঁধেচে।

ব্রাহ্মণ।—সবাই নয় বাছা ; তবে অনেকেই বাঁধে বটে। যে-বার সবাই বাঁধে, সেই বারেই ভরা-বুড়ি হয়।

এই বলিতে বলিতে উভয়ে চাঁদনিতে পৌঁছিল। বুড়ী গাঁটুরি হইতে একটা ঘটী বাহির করিয়া কহিল—"বাবা, আমার বড় পিপাসা পেয়েচে, এক ঘটী জল এনে দিতে পার ?"

ব্রাহ্মণ গঙ্গা হইতে এক ঘটী জল আনিয়া দিল। বুড়ী সমস্তটা পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিল। পরে বলিল—"কৈ বাবা ! আমার কি উপায় কর্‌বে কর।"

ব্রাহ্মণ।—সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। আমি নিশ্চয়ই তোমার উপায় ক'রে দিব ; তুমি নিশ্চিন্ত থাক। একটু বিলম্ব আছে। ততক্ষণ আমার একটা কথা শুন। শাস্ত্রে আছে—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" রথের উপর জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে আর জন্ম হয় না। এ কথাটা খুব সত্য। কি রকম সত্য জান ? যেমন "জল খেলে পিপাসা থাকে না" সেইরূপ সত্য।

বৃদ্ধা।—তা ত বাবা জানি। শাস্তরের কথা কি মিথ্যে হয়। সেই জন্যেই ত বেরিয়েচি।

(বৃদ্ধা বালবিধবা। বৈধব্য-ঘটনার পর হইতেই তাহার ধর্ম্মে মতি হয়, সে শাস্ত্রকথা শুনিতে বড় ভালবাসিত। কোথাও কথকতা, চণ্ডীর গান, রামায়ণ গান ও কৃষ্ণযাত্রা হইলে সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সে সর্ব্বাগ্রে সেখানে যাইত এবং আগা গোড়া মন দিয়া শুনিত। সেই-জন্য সে শাস্ত্রের অনেক কথা জানিত, এবং শাস্ত্রের মর্ম্মও কিছু কিছু বুঝিত। তাই বলিল—"তা ত বাবা জানি। শাস্তরের কথা কি মিথ্যে হয়। সেই জন্যেই ত বেরিয়েছি।"

ব্রাহ্মণ।—বাছা, কথাটা একটু তলিয়ে বুঝ্‌তে হবে। "জল খেলে পিপাসা থাকে না" এ কথাটায় তুমি বিশ্বাস কর ?

বৃদ্ধা।—খুব করি। এই যে, পিপাসায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল তুমি এক ঘটী জল এনে দিলে, খেতেই সব পিপাসা দূর হ'ল। তুমি বেঁচে থাক বাবা ! তোমার এক শ বচ্ছর পরমাই হোক।

ব্রাহ্মণ।—কিন্তু বাছা জিজ্ঞাসা করি এই এক ঘটী জল খেয়েছ ব'লে তোমার কি আর কখনও পিপাসা হবে না ?

বৃদ্ধা।—তা হবে বৈ কি ! এক প'র দেড় প'র বাদে আবার পিপাসা হবে।

ব্রাহ্মণ। অত ক্ষণও অপেক্ষা কর্‌তে হ'বে না। তুমি এখনই এক-বার এই রৌদ্রে ঐ রাস্তায় ঘুরে এস দেখি।

বৃদ্ধা।—তা হ'লে এখনি পিপাসা পাবে।

ব্রাহ্মণ।—তেম্‌নি জান্‌বে যে, রথের উপর জগন্নাথকে যখনই দেখ্‌বে তখনই মুক্তিলাভের অধিকার জন্মিবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সংসারে মন দিলে আর সে অধিকার থাক্‌বে না। যদি এমন কেহ ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী থাকেন যে, "রথে চ বামনং দৃষ্টা"ই দেহ ত্যাগ ক'র্‌তে পারেনা,

কিংবা সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে সর্ব্বদা সেই মূর্ত্তি চিন্তা ক'র্‌তে সমর্থ হন, তবেই তাঁর আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। সেই জন্যে ব'ল্‌ছি, যদি মুক্তি লাভের কামনা থাকে, তা হ'লে প্রত্যহই দেখ্‌তে হয়; বোচ্‌কার মায়া ছেড়ে, সংসারের মমতা ভুলে, সর্ব্বদাই রথে জগন্নাথ দর্শন ক'র্‌তে হয়।

বৃদ্ধা।—তেমন পয়সা কোথা বাবা যে, পিত্যহ যাব, কি সেথা ঘর দোর বেঁধে থাক্‌ব। আর থাক্‌লেই বা পিত্যহ দেখ্‌ব কি করে! রথ ত আর পিত্যহ হয় না। বছরে একদিন মাত্র হ'য়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ।—বাছা, পয়সা খরচ ক'র্‌তে হবে না, কোথাও যেতে হবে না, থাক্‌তেও হবে না; অথচ প্রত্যহ দেখ্‌তে পাবে। সেই দেখাই যথার্থ দেখা। সেই রকম ক'রে দেখ্‌তে পার্‌লেই পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম। তারই উপায় ব'ল্‌ছি, বেশ মন দিয়ে শোন।—

রথ কি জান? এই যে আমাদের মানব-দেহ, এরই নাম রথ। রথের যেমন চাকা থাকে, এ রথেরও তেম্‌নি দুখানা চাকা আছে। তাদের নাম হ'চ্চে পাপ ও পুণ্য। পাপ-পুণ্যের উপর নির্ভর ক'রেই এ রথ এই সংসার-ক্ষেত্রে চ'ল্‌ছে। রথে যেমন ধ্বজা থাকে, এ রথেও তেম্‌নি তিনটি ধ্বজা আছে। সত্ত্ব, রজ, তমঃ—এই তিনটি গুণ হচ্চে এ রথের ধ্বজা। রথের যেমন দ্বার থাকে, এ রথেরও তেম্‌নি নয়টি দ্বার আছে। চক্ষুঃ দুটী, কর্ণ দুটি, নাসিকার ছিদ্র দুট, মুখ একটি, মলদ্বার একটি আর মূত্রদ্বার একটি। রথে কত চিত্র থাকে, রথকে কত ফুল মালা দিয়ে সাজায়; এ রথও রূপলাবণ্য-হাব ভাব-কটাক্ষ-প্রভৃতি কত চিত্রে চিত্রিত, ও কত বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে থাকে। রথে নীড় থাকে। যেখানে রথী বা দেবতা বসেন, তাকে নীড় বলে। এ রথের নীড় হ'চ্ছে হৃদয়। সেই হৃদয়-নীড়ে জগন্নাথ বিরাজ ক'চ্চেন। জগন্নাথ কে জান? তিনিই হ'চ্চেন সেই পরমব্রহ্ম শ্রীহরি; কিন্তু এই রথে ব'সতে তাঁর নাম হ'য়েছে আত্মা। তাঁর সঙ্গে আবার অহঙ্কার অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানও আছে। প্রকৃতি অর্থাৎ

মায়া মাঝ খানে ব'সে সেই অহঙ্কারের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত ক'রে রেখেছেন। সেই অহঙ্কারকে বলরাম, আর সেই মায়াকেই সুভদ্রা ব'লে জান্‌বে। তাঁর বাঁধনের বলে আত্মা নির্লিপ্ত হ'য়েও দেহে লিপ্ত হ'য়ে প'ড়েছেন; তিনি দেহছাড়া হ'য়েও দেহকেই "আপনি" ব'লে মনে করেন; দেহের কাজকেই আপনার কাজ ব'লে ভাবেন, এবং তাতেই সুখ দুঃখও ভোগ করেন। সুভদ্রা তাঁর ভগিনী। 'ভগ' ব'ল্‌তে ষড়ৈশ্বর্য্য অর্থাৎ যাহা ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাতেও নাই সেই ছয়টি অসাধারণ গুণকে ভগ বলে। মায়া ঈশ্বরের শক্তি। যেমন দীপে ও দীপশিখায় কোনও প্রভেদ নাই; দীপের যে গুণ, দীপশিখারও সেই গুণ; তেমনি শক্তিতে ও শক্তিমানে কোনও প্রভেদ নাই; ঈশ্বরের যে গুণ, মায়ারও সেই গুণ। সেই জন্যে মায়া ঈশ্বরের ভগিনী অর্থাৎ সমান ঐশ্বর্য্যশালিনী। মায়া আত্মার শক্তি হ'লেও তিনি এমনি দুর্জ্জয় যে, জগন্নাথ স্বয়ং চতুর্ভুজ হ'য়েও তাঁর কাছে নির্ভুজ হ'য়ে প'ড়েছেন—ঠুঁটো হ'য়ে ব'সে আছেন। স্ব-ইচ্ছায় অহঙ্কারকে ছাড়্‌বার তাঁর শক্তি নাই। অহঙ্কারও আপন ইচ্ছায় তাঁকে ছাড়্‌তে পারেন না। আবার সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাবশে মায়া যে কার্য্য ক'রে ব'সেছেন, তাহা তিনিও আপন ইচ্ছায় পরিত্যাগ ক'র্‌তে অক্ষম। এই জন্যে তাঁদেরও স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্যে কোনও হাত নাই বলিয়া, তাঁরাও ঠুঁটো হ'য়ে আছেন।—এইরূপ ভাবাকে আত্মতত্ত্ব-বিচার বলে।

রথে ঘোঁড়া ও সারথি থাকে। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ (চাম্‌ড়া)—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই এ রথের ঘোঁড়া; মন হ'চ্চে তাদের লাগাম; আর বুদ্ধি হ'চ্চে সারথি। ঘোঁড়ায় যেমন রথ টানে, আর সারথি লাগাম ধ'রে তাদের চালায়, সেইরূপ ঐ পাঁচ ইন্দ্রিয় এই দেহকে বিষয়ের দিকে টান্‌ছে, আর বুদ্ধি মনকে আয়ত্ত ক'রে তারই বশে তাদিগে চালাচ্চে। কিন্তু জগন্নাথের রথে কাঠের ঘোঁড়া ও কাঠের সারথি। সে ঘোঁড়াগুলার রথ টান্‌বার ক্ষমতা নাই; সারথিরও চালাবার শক্তি নাই। সেইরূপ

এ দেহ-রথে যখন ঐরূপে জগন্নাথ দেখ্‌বে—ঐরূপে আত্মতত্ত্ব-বিচারে প্রবৃত্ত হবে, তখন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল কাঠের পুঁতুলের মত নিশ্চল হ'য়ে থাকবে। তারা আর বিষয়ের দিকে যাবে না।—একেই বলে ইন্দ্রিয়-সংযম।

এদিকে জগন্নাথকে রথে উঠ্‌তে দেখে লক্ষ্মী রান্নাঘর ছেড়ে আঁচল পেতে পথে বসেন। তিনি ভোগ রাঁধ্‌তেন; সুতরাং এখন সে ভোগ বন্ধ হইয়া যায়।—ইন্দ্রিয়-সংযম হ'লেই আত্মার সকল ভোগের নিবৃত্তি হয়।

জগন্নাথের রথ কাছি বেঁধে টান্‌তে হয়। টেনে কোথায় নে যায় জান? মাসীর বাড়ী। মাসীর বাড়ী গিয়ে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাকে ছেড়ে রথ থেকে নেমে রত্নবেদীতে বসেন। মাসী কে জান? ঐ যে মায়ার কথা ব'ল্লাম, ওঁর আর একটা নাম অবিদ্যা। ওঁ হ'তেই এই জগৎ উৎপন্ন হ'য়েছে। সেই জন্য উনি আমাদের মা। ওঁর একটি ভগ্নী আছে—ঈশ্বরের আর একটি শক্তি আছে। তাঁর নাম বিদ্যা। সুতরাং সেই বিদ্যা হ'চ্ছেন আমাদের মাসী। এই দেহ রথে ভক্তি-রজ্জু বেঁধে টান দিয়ে সেই বিদ্যার কাছে নে যেতে হয়। সেখানে গেলেই, আত্মা অহঙ্কার ও মায়াকে পরিত্যাগ ক'রে, এ দেহ-রথ ছেড়ে স্বীয় ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত হন।—তা হ'লেই নির্ব্বাণ মুক্তি হ'য়ে গেল।

কিন্তু আর একটা কথা ব'লে রাখি। ঈশ্বর বড় খেলা ক'র্‌তে ভালবাসেন। এই সংসারই তাঁর খেলা। সেই জন্যে তিনি ইচ্ছা ক'রে আবার সেই প্রকৃতি ও অহম্মতির সঙ্গে রথে উঠে, ক্ষেত্রে ফিরে আসেন অর্থাৎ এক একটি দেহ ধারণ ক'রে সংসারে প্রবিষ্ট হন।—তাকেই বলে "উলটো রথ।" উল্‌টো রথে ফির্‌লে আবার সংসারে আস্‌তে হয়, আবার জন্ম গ্রহণ ক'র্ত্তে হয়।

তাই বলি বাছা, তুমি সেই বিদ্যা-মাসীর শরণাগত হ'য়ে ভক্তিরজ্জুকে জ্ঞান-খোঁটায় বেঁধে, ক'সে ধ'রে থেকো; তা হ'লে তোমাকে আর উল্‌টো রথে ফির্‌তে হবে না—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বৃদ্ধা এতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তদ্গতচিত্তে কথাগুলি শুনিতেছিল। কথা শেষ হইলে সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল; কিন্তু ব্রাহ্মণকে আর দেখিতে পাইল না। তখন সে গুলের কৌটা ফেলিয়া দিল; গঙ্গার জলে বোচ্‌কা ভাসাইল; সঙ্গে যে টাকাকড়ি ছিল, ভিক্ষুকদিগকে তাহা বিতরণ করিল। তার পর "আমি আসল রথ দেখ্‌তে যাই" ব'লে কোথায় চলিয়া গেল; তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রার্থনা।

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজং
বিরিঞ্চি-বৈরিঞ্চ্য-সুরেন্দ্র-বন্দিতম্।
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং
ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরপ্রভুঃ॥
ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাজম,
ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা।
ত্বং সদ্‌গুরুর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং,
যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম॥

(ভাগবত)

বিধি, বিধি-সুত—সনকাদি আর
ইন্দ্রের বন্দিত ধন,
ঐহিক-মঙ্গল- অভিলাষী জনে
করে যার আরাধন,

ব্রহ্মারো নিয়ন্তা মহাশক্তি কাল
যাহার বশেতে চলে,
করি মোরা নতি হে নাথ তোমার
সেই পাদপদ্ম-তলে।
হে বিশ্বভাবন মোদের মঙ্গল
কর তুমি অনুক্ষণ;
তুমিই মোদের হও মাতা পিতা,
পতি আর বন্ধুজন।
তুমিই মোদের হও সৎ গুরু,
তুমিই দেবতা-বর্য্য;
তোমায় আশ্রয় করিয়া আমরা
হইলাম কৃতকার্য্য।

কুন্তী বোলায় লো।

শিবলাল ও কিষণলাল দুই বন্ধু। শিবলাল কিষণলালের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া সূতর ব্যবসা আরম্ভ করিল। সে, যে টাকা লইয়াছিল, তাহাতে সূত কিনিল। তার পর বিক্রয় করিয়া লাভে মূলে যাহা পাইল, সমুদায় টাকা দিয়া আবার অধিক সূত ক্রয় করিল। এইরূপে বেচা কেনাই করিতে থাকে; সকল টাকাই ব্যবসাতে ফেলে। মহাজনকে এক পয়সাও দেয় না। দিব বলিয়া ভাবেও না। যে তাহার উপকার করিল, তাহাকে মনেও করে না। ব্যবসার দিকে তাহার মন পড়িয়া রহিল; মহাজনকে সে একেবারেই ভুলিয়া গেল।

কিছু দিন পরে এক ভদ্র লোক আসিয়া কহিলেন—শিবলাল তোমার

এ কিরূপ আচরণ! তুমি এত দিন ব্যবসা করিতেছ, লাভও পাইতেছ, তথাপি মহাজনের টাকা পরিশোধ করিতেছ না, ইহার কারণ কি? তিনি তোমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা কি তোমার মনে নাই? তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা কি তোমার উচিত কাজ?

তখন শিবলালের চৈতন্য হইল। বন্ধুকে মনে পড়িল। এত দিন তাহাকে ভুলিয়া থাকা, তাহার টাকা তাহাকে না দেওয়া অন্যায় হইয়াছে ভাবিয়া দুঃখিত হইল। তাহার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন সেই ভদ্রলোকের উপদেশ অনুসারে এক দিন সে কিষণলালের দ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু দেখিল, দ্বারে এক ভয়ঙ্করী কুক্কুরী বসিয়া আছে। তাহার শরীর শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। কুক্কুরী শিবলালকে দেখিয়াই চীৎকার করিতে লাগিল; তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল। কিছুতেই তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। শিবলাল দুই চারি বার ধমক দিয়া উঠিল, তাহাকে সরাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কুক্কুরী তাহা গ্রাহ্য করিল না; বরং অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহাকে ছিঁড়িয়া খাইবার উপক্রম করিল। তখন শিবলাল অত্যন্ত ভয় পাইয়া, অতিশয় কাতর হইয়া, ডাকিতে লাগিল—এ কিষণলাল! এ কিষণলাল! তোম্‌হারা কুত্তী তোম্ বোলায় লো ভইয়া।

কিষণলাল এতক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। এখন তাহার কাতরতা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। কুক্কুরীকে ডাকিল, ধম্‌কাইল, সরিয়া যাইতে কহিল। কুক্কুরী প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া সরিয়া গেল, পথ ছাড়িয়া দিল। শিবলাল তখন নিরাপদে কিষণলালের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাহার যাহা বক্তব্য ছিল বলিয়া, যাহা কর্ত্তব্য ছিল করিল।

আমরাও সেইরূপ আমাদের পরম বন্ধু পরমাত্মা শ্রীহরির নিকট হইতে ইন্দ্রিয়রূপ পরম ধন লইয়া এই ভবের হাটে আসিয়া সূতর ব্যবসা আরম্ভ

করিয়াছি—দারপরিগ্রহ করিয়া অপত্যোৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। লাভে মূলে সকল ধনই—সকল ইন্দ্রিয়ই সেই ব্যবসাতে নিয়োজিত করিয়াছি। এ হাটে সু-ত কিছুই নাই, সকলই কু; তথাপি দারা সুতই ভাল বলিয়া চিনিয়াছি। রবিসুতর দিকে দৃষ্টি নাই, তাই নন্দসুতকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাকে স্মরণ করি না; তাঁহার প্রদত্ত ইন্দ্রিয়চয় তাঁহাকে অর্পণ করিতেছি না—চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে তাঁহার দর্শন-শ্রবণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছি না।

এমন সময় গুরুদেব আসিয়া যদি আমাদিগকে বলেন—বাপু হে! করিতেছ কি? চির দিনটা কেবল অসার সংসারেই মজিয়া থাকিবে? একবার সার বস্তু ভাবিবে না? একবার কৃষ্ণদর্শন করিবে না? পরিত্রাণের পথ দেখিবে না? তখন হয় ত আমাদের চৈতন্য হইবে। আমরা কৃষ্ণদর্শনে সমুৎসুক হইব। গুরুর উপদেশানুসারে চলিয়া শ্রীহরির দ্বারে উপস্থিত হইতে পারিব। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে সহসা যাইবার উপায় নাই। দুরত্যয়া ত্রিগুণময়ী মায়া-কুক্কুরী সে দ্বার রক্ষা করিতেছেন; কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতেছেন না, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সকলকেই সংসারের দিকে ফিরাইয়া দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার তাড়া খাইয়াও আমরা যদি ফিরিয়া না আসি, কাতরপ্রাণে ব্যাকুলমনে কৃতাঞ্জলিপুটে যদি বলিতে পারি—হরি! কোথায় তুমি? দয়াময়! প্রসন্ন হও; কৃপা করিয়া তোমার কুক্কুরীকে তুমি ডাকিয়া লও; এ "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" মায়াকে সরাইয়া দাও, তাহা হইলে সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারিবেন না; তখনই মায়াকে অপসারিত করিবেন; আমরাও কৃষ্ণদর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণকে এই ইঙ্গিত করিবার জন্যই প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

ত্রিগুণময়ী এই যে আমার দৈবী মায়া, ইহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা আমারই শরণাগত হয়, তাহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে।

শ্লোক।

গুরুর্ন স স্যাৎ, স্বজনো ন স স্যাৎ,
পিতা ন স স্যাৎ, জননী ন স্ স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ, ন পতিশ্চ স স্যান্,
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

অর্থ।— গুরু নন তিনি, তিনি নহেন স্বজন,
পিতা ত নহেন তিনি, মাতা তিনি নন।
দেবতা নহেন তিনি, তিনি নন পতি,
ভবপাশ-নাশে যাঁর নাহিক শকতি॥

অন্যবিধ অর্থ।— সদা সৎ উপদেশ করি বিতরণ
ঘুচাতে নারেন যিনি সংসার-বন্ধন,
তিনি যেন কভু কারো কাণে মন্ত্র দিয়া
গুরুগিরি করিবারে না যান ধাইয়া।

সদা সৎ উপদেশ করি বিতরণ
ঘুচাতে নারেন যিনি সংসার-বন্ধন,
তিনি যেন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন
করিবার তরে নাহি যান কদাচন।

সদা সৎ উপদেশ করি বিতরণ
ঘুচাতে নারেন যিনি সংসার-বন্ধন,
তিনি যেন আতি-বিতি হ'য়ে অনর্থক
নাহি যান হইবারে কাহারো জনক।

সদা সৎ উপদেশ করি বিতরণ
ঘুচাতে নারেন যিনি সংসার-বন্ধন,
মাতা হইবার সাধ বিড়ম্বনা তাঁর,
জানিবে শুধুই নানা-কষ্ট-ভোগ সার।

যাহাতে অনা'সে খণ্ডে সংসার-দুর্গতি,
হেন বর দিতে যার নাহিক শকতি,
দেবতা হইয়া শুধু নৈবেদ্যের লোভে,
পূজা নিতে যা'য়া তাঁর কভু নাহি শোভে।

সদা সৎ উপদেশ করি বিতরণ
ঘুচাতে নারেন যিনি সংসার-বন্ধন,
তিনি যেন কভু কারো নাহি হন পতি,
তা হ'লে দোঁহারি হবে অনন্ত দুর্গতি।

প্রার্থনা।

যঃ স্বোদরাভ্যন্ত-রনন্ত-কোটী-
র্জগন্তি বিভ্রৎ প্রলয়েঽপ্যনন্তঃ
অশেত দেবক্যুদয়ে, স শম্যাৎ
মমোদরাবাস-সমুত্থ-দুঃখম্ ॥

প্রলয়ে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড-ভুবন
আপন উদরে যিনি করেন ধারণ ;
দেবকী-উদরে তিনি করিয়া প্রবেশ,
জেনেছেন নিদারুণ গর্ভবাস-ক্লেশ।
এখন তাঁহার পদে এই নিবেদন—
মোর গর্ভবাস-ক্লেশ করুন খণ্ডন।

সংকীর্ত্তন

কে বুঝিবে তব লীলা হরি। (ও লীলাময় হে)
তুমি কত চক্র ধর চক্রধারি॥
আজি অষ্টমীর অন্ধকারে, আসি কংস-কারাগারে হে,
জন্ম নিলে নররূপ ধরি॥
সজল জলদ জিনি সুনীল বরণ।
তোমার পদতলে ভানু-আভা, নখরে শশাঙ্ক-শোভা,
মুনিগণের মনোলোভা নয়নরঞ্জন॥
কিবা সুন্দর বঙ্কিম ঠাম, রূপে বিমোহিত কাম,
কিরীট কুণ্ডল দাম, তায় কত আভরণ॥
তোমার কটিতটে পীতবাস, অধরে মধুর হাস,
ইন্দীবর-নিন্দি ভাস, চঞ্চল লোচন॥
কিবা শংখ চক্র গদা পদ্ম,—সুশোভিত করপদ্ম,
পদ্মযোনি শ্রীপাদপদ্ম, করেন বন্দন।
(তোমায়) বসুদেব দেবকী সতী, ডেকেছিলেন দিবারাতি,
(ব'লে) কোথায় হে অগতির গতি, শ্রীমধুসূদন॥

(ওহে) দয়াময় তাই দয়া করি, চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি,
(তাঁদের) পুত্ররূপে অবতরি দিলে দরশন ॥
আমি এ সংসার-কারাগারে, মহা-মোহ-অন্ধকারে,
ডাকি তোমায় কাতর পরাণে। (হরি ব'লে হে)
উদয় হ'য়ে হৃদয়-মাঝে, সাজি আজি তেম্নি সাজে,
(একবার) দাঁড়াও দেখি গোলোক-বিহারি। (বাঁকা হ'য়ে হে)
(তোমায়) সুযুম্ণা-যমুনা দিয়ে, সহস্রদল-নন্দালয়ে,
ল'য়ে যাব পরম যতনে। (ধ্যানযোগে হে)
(আমার) মহামায়া ছুটবে আগে, কুণ্ডলিনী অনুরাগে,
(তখন) পাছু পাছু যাবে ফণা ধরি ॥ (আহা মরি হে)
(যেমন) নাশিলে দনুজদলে, তেম্নি করি অবহেলে,
(আজি) বিনাশ হে মম রিপুগণে ॥ (নিজ গুণে হে)
তুমি ঘুচালে ধরার ভার, হবে তোমায় এই বার হে,
আমার পাপভার হরিতে মুরারি ॥ (কৃপা করি)

জীবের দুর্গতি।

দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি।

কালরূপী বিষ্ণুর বশে চরাচর জগৎ পরিচালিত হইতেছে। তাঁহাকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। জীবগণ সুখের জন্য, অতি কষ্ট স্বীকার করিয়া বিবিধ চেষ্টা করিতে থাকিলেও সেই কালের বশে তাহারা বিফলপ্রযত্ন হইয়া দুঃখভোগই করে। তাহার কারণ এই যে, তাহারা এতই অবোধ যে, এই অনিত্য দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিকে নিত্য বলিয়া মনে

করে। ঐ সকলের প্রতি তাহাদের এতই অনুরাগ যে, যে কোনও নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিলেও ঐ সকলকে পাইয়া তাহারা পরম সুখী হয়। এমন কি, বিষ্ঠা-কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।

যে জীব মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, সেও প্রায়ই সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়া এবং ঈশ্বরের আরাধনা না করিয়া, কেবল পরিজনপ্রতিপালনে আসক্ত হইয়া, বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।

এমন কি, সেই কার্য্যের অনুরোধে পাপকর্ম্ম করিতেও কুণ্ঠিত হয় না; স্ত্রীর কুহকে পড়িয়া ও শিশুর সুমিষ্ট কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। এই দুঃখময় গৃহধর্ম্মে যাবজ্জীবন দুঃখের প্রতিকার করিয়া দিন কাটাইতে থাকিলেও, তাহাতেই সে সুখ বোধ করে। নানা প্রকার হিংসা-কার্য্যে রত হইয়া নিজের ভোগের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বহু কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করে, সে অর্থে পরিজন প্রতিপালন করিয়া ক্রমশঃ অধোগতিই প্রাপ্ত হয়। স্বীয় চেষ্টায় উপার্জ্জনে অশক্ত হইলে পরধনে লোভ করে। দুর্ভাগ্য বশে যে দরিদ্র হইয়া পড়ে—যাহার পরিজন প্রতিপালনে সামর্থ্য নাই—যে পদে পদে বিফল প্রযত্নই হয়, সে শেষে হতবুদ্ধি হইয়া কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখে কাল যাপন করে। এরূপ অবস্থায় তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি তাহাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করে না। নির্দ্দয় কৃষকের নিকট বৃদ্ধ বলীবর্দ্দের যেমন আদর থাকে না, স্ত্রীপুত্রাদির নিকট সেও সেইরূপ হতাদর হয়। কিন্তু তথাপি তাহার চৈতন্য হয় না। তাহারই পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থে তাহার স্ত্রীপুত্র এখন তাহাকে প্রতিপালন করিলেও, তাহারা অবজ্ঞার সহিত তাহাকে ভক্ষ্যাদি প্রদান করিয়া থাকে। সেও কুক্কুরের ন্যায় সেই অশ্রদ্ধাদত্ত অন্নাদি ভোজন করিয়া কাল যাপন করে।

এইরূপে কালক্রমে যখন জরা আসিয়া আক্রমণ করে, তখন তাহাকে

নানাপ্রকার রোগ ভোগ করিতে হয়, তাহার পরিপাকশক্তির হ্রাস হয়, আহার কমিয়া যায়, কফে নাড়ী পরিপূর্ণ হয়, শ্বাসে কাসে গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকে, উত্থানশক্তি থাকে না, অনুক্ষণ শয়ন করিয়াই কালযাপন করে, কাহারও সহিত কথা কহিতে পারে না। তখন তাহার মৃত্যুচিহ্ন দেখিয়া আত্মীয়স্বজন আসিয়া চারিদিকে বসিয়া শোক করিতে থাকে, কেহ কেহ রোদনও করে। সেই সময় তাহাকে লইবার জন্য ভীষণাকৃতি যমদূতেরা আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা তাহাকে এই ভৌতিক দেহ ত্যাগ করাইয়া সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ করায় এবং কালপাশ দিয়া তাহার গলে বন্ধন করিয়া সুদীর্ঘ পথে লইয়া যায়। একে সে তাহাদের তর্জ্জনে কম্পান্বিত হয়, তাহাতে সেই পথের ভয়ঙ্কর কুক্কুর সকল আসিয়া তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিতে থাকে। তখন সে নিতান্ত কাতর হইয়া পূর্ব্বকৃত পাপাচরণ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হয়। সে সেই পথের মধ্যে—ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত, কোথাও দাবানলে তাপিত, কোথাও উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর পতিত, তাহার উপর যমদূতদিগের দারুণ কশাঘাতে তাড়িত হইয়া—শক্তি না থাকিলেও অগত্যা চলিতে বাধ্য হয়। এইরূপ বিবিধ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কখনও মূর্চ্ছিত, কখনও উত্থিত হইয়া, সেই ঘোর-অন্ধকারময় ৯৯ হাজার যোজন পথ ৬ দণ্ডে অথবা পাপের আধিক্য হইলে ৪ দণ্ডে অতিক্রম করিয়া যমালয়ে উপস্থিত হয়।

সেখানেও তাহার যাতনার অবধি নাই—যমদূতেরা চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া তাপ দিতে থাকে; নিজেরই দেহমাংস কাটিয়া ভক্ষণ করিতে দেয়; গৃধ্র ও কুক্কুরেরা উদর বিদীর্ণ করিয়া নাড়ী বাহির করে; সর্প-বৃশ্চিকাদি আসিয়া দংশিতে থাকে; এক একটি অঙ্গ ছেদন করিয়া দেয়; ভয়ঙ্কর হস্তী সকল আসিয়া পদদলিত করে; পর্ব্বতশিখর হইতে ফেলিয়া দেয়; জলে ডুবাইয়া ও গর্ত্তে পুতিয়া রাখে।

এইরূপে স্ত্রী বা পুরুষ সংসারাসক্তিবশতঃ আপন আপন কর্ম্মের ফলে

যমালয়ে নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। অতি উৎকট পাপপুণ্য হইলে এই পৃথিবীতেও তাহার ফলভোগ হয়; এই জন্যই কেহ কেহ বলেন —"স্বর্গ ও নরক এইখানেই আছে"।

যে জীব কেবল পরিজনপ্রতিপালনে ও স্বোদরপোষণে রত থাকে, তাহাকে অন্তকালে সেই সকল পরিজন ও স্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া যমালয়ে গিয়া উক্তরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়। তাহার পাপার্জ্জিত ধন অপর সকলে ভোগ করিলেও, নরক-যাতনা তাহাকে একাই ভোগ করিতে হয়।

মৃত্যুকালে জীব সকলই ছাড়িয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে পাপপুণ্য ছাড়িতে দেন না। সুতরাং যে পাপী, সে সেই পাপরূপ সম্বল লইয়া গমন করে। পরিজনপ্রতিপালন কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইলেও যে ব্যক্তি অধর্ম্ম দ্বারা সেই কার্য্যে রত হয়, তাহাকে নরকের চরম সীমা পর্য্যন্ত গমন করিতে হয়, এবং তাহাতে যতপ্রকার যাতনা আছে, সমস্তই ভোগ করিতে হয়।

তার পর সেই জীব আবার দেহ ধারণ করিবার জন্য পুরুষের রেতঃ-কণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে। প্রথম দিনে শুক্র ও শোণিতের সংমিশ্রণ, পাঁচ দিনে বুদ্বুদ, দশ দিনে কুলফলের ন্যায় আকার, তারপর মাংসপিণ্ডাকৃতি (পক্ষিপ্রভৃতি-যোনিতে অণ্ডাকৃতি) হয়। এক মাসে মস্তক; দুই মাসে হস্তপদাদি; তিন মাসে নখ, লোম, অস্থি, লিঙ্গ ও কর্ণাদির ছিদ্র উৎপন্ন হয়। ছয় মাসে জরায়ু-নামক গর্ভবেষ্টন-বায়ু দ্বারা গর্ভের দক্ষিণাংশে ঘূর্ণিত হইতে থাকে এবং মাতৃভুক্ত অন্নাদির রসে বর্দ্ধিত হইয়া অনভিমত বিষ্ঠামূত্রের গর্ত্তে পতিত থাকে। সেখানে কৃমি সকল উৎপন্ন হইয়া তাহার সুকোমল অঙ্গে অনুক্ষণ দংশন করে। সেই যাতনায় সে পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। এ দিকে মাতা কটু, উষ্ণ, লবণ ও অম্লাদি যে কোনও বস্তু ভক্ষণ করে, তাহার স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করে। জরায়ু-বায়ু গ্রীবা মস্তক মুড়িয়া তাহাকে বহুসংখ্যক নাড়ী দ্বারা বেষ্টিত করিয়া দেয়; সুতরাং পঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় তাহার আর নড়িবার শক্তি থাকে না।

সপ্তম মাসে ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহার জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সে শত জন্মের কর্ম্ম স্মরণ করিয়া নিতান্ত অনুতাপগ্রস্ত হয় ও অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করে, এবং তাদৃশ গর্ভবাস-যন্ত্রণায় একান্ত কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপে ভগবানের স্তব করিতে থাকে।—

(জীবের স্তুতি)

জগৎ-রক্ষার তরে আপন ইচ্ছায়,
নানারূপে অবতীর্ণ যিনি এ ধরায়;
যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে লইলে শরণ,
তখনি সকল ভয় হয় নিবারণ;
আমার যেমন পাপ তার সমুচিত,
ক'রেছেন যিনি হেন দুর্গতি বিহিত;
সেই শ্রীহরির আজি যুগল চরণ,
শরণ লইনু আমি অতি অভাজন।

স্বীয় কর্ম্মফলে এই মায়াবিরচিত
ভৌতিক শরীর ধরি গর্ভে অবস্থিত;
আমার হৃদয়ে যিনি শুদ্ধ পূর্ণ জ্ঞান,
আত্মা রূপে করিছেন এবে অবস্থান;
দেহমধ্যে থেকে যিনি লিপ্ত নন তায়,
শত শত প্রণিপাত করি তাঁর পায়।

যদিও তাঁহারি অংশ আমি, অন্য নয়;
তাঁহাতে আমাতে তবু ভেদ অতিশয়।
দেহেতে বিলিপ্ত আমি মায়ায় আবৃত,
দেহেতে নির্লিপ্ত তিনি মায়ার অতীত।

প্রকৃতি-অধীন আমি, তিনি তার পর ;
তাঁহারে বন্দনা আমি করি নিরন্তর।

জ্ঞানেতেই মুক্তি ঘটে যদিও নিশ্চয়।
কিন্তু তাঁর কৃপা বিনা জ্ঞান নাহি হয়।
তাঁহার মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে কর্ম্মপাশে,
সংসারে ভ্রময়ে জীব বিপুল আয়াসে।
নানা দুঃখভোগে তার স্মৃতি লোপ পায়,
তাঁর আরাধনা বিনা কি আছে উপায়।

স্থাবর জঙ্গমে যিনি করেন বসতি,
বিনা সেই সর্ব্ব-অন্তর্যামী বিশ্বপতি ;
জ্ঞান দিতে পারে বিশ্বে হেন শক্তি কার ?
তিনি বিনা জ্ঞানদাতা কেহ নাহি আর।
তাই আজি তাপত্রয়-শমনের তরে,
সতত ভজনা করি সেই দেববরে।

কর্ম্মফলে অপরের দেহের ভিতরে,
পড়িয়াছি বিষ্ঠা-মূত্র-শোণিত-বিবরে ;
জঠর-অনলে দগ্ধ হ'তেছি বিশেষ,
সহিতে না পারি আর নিদারুণ ক্লেশ ;
গণি শুধু—দশ মাস কবে পূর্ণ হবে,
এ নরক হ'তে হায় ! বাহিরিব কবে ?

হেন অজ্ঞানেরে যিনি দিয়াছেন জ্ঞান,
তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম করিবারে ধ্যান,

সেই দয়াময় দীনবন্ধু বিশ্বপতি
নিজ গুণে সুপ্রসন্ন হ'ন মোর প্রতি ;
কার শক্তি আছে তুষ্ট করিতে তাঁহায় ?
অঞ্জলি-বন্ধন বিনা কি আছে উপায়।

অন্য জীব শুধু নিজ-দেহ-সমুদ্ভব
সুখ দুঃখ যথাকালে করে অনুভব।
যাঁহার কৃপায় আমি লভি নরদেহ,
যে জ্ঞান পেয়েছি, তাহা নাহি পায় কেহ ;
সেই জ্ঞানবলে আমি করি নিরীক্ষণ—
অন্তরে বাহিরে সেই চিন্ময়ে এখন।

যদিও এ গর্ভবাসে কষ্ট অতিশয়,
বাহির হইতে তবু বাসনা না হয় ;
যখনি পড়িব গিয়া সেই ধরাতলে,
অমনি ত মায়া আসি লইবে কবলে।
তার বশে সংসার-চক্রের নিষ্পেষণে,
পড়িয়া ভুলিব সব—এই ভয় মনে।

তাই ভাবি—সব কষ্ট সহিয়া হেথায়,
বুদ্ধিরূপ সারথিরে করিয়া সহায়,
আত্মার উদ্ধারকার্য্য করিব সাধন,
যাতে নাহি হয় আর সংসারে পতন ;
এইরূপে হরিপাদপদ্ম করি সার
থাকিলে, না পাব সেই যাতনা অপার।

জীব গর্ভবাসে থাকিয়া এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে, যখন দশ মাস পরিপূর্ণ হয়, তখন সূতিবায়ু তাহাকে অধোমুখ করিয়া ফেলে। সেও সেই ভাবে অতিকষ্টে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়; তখন তাহার জ্ঞান ও স্মৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়; সে রক্তবিলিপ্ত হইয়া অঙ্গবিক্ষেপ ও রোদন করিতে থাকে। পরে জননীপ্রভৃতি তাহার পোষণ-কার্য্যে রত হয়। কিন্তু তাহারা তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া আপনাদের ইচ্ছামত আহারাদি তাহাকে প্রদান করে। সে সকল তাহার অভিমত না হইলেও, অগত্যা তাহাকে ভক্ষণ করিতে হয়। মূত্রঘর্ম্মাদি-দূষিত অপবিত্র শয্যায় শয়ন করাইলে, তাহাতেই শুইয়া থাকে। দংশ-মশকাদি অঙ্গে দংশন করিলেও তাহাদের নিবারণে বা অঙ্গকণ্ডূয়নে সমর্থ হয় না।

এইরূপে অতি কষ্টে শৈশব ও পৌগণ্ড কাল অতিক্রান্ত হইলে, দেহের সহিত কাম, ক্রোধ ও অভিমানেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। তখন দেহে অহং-বুদ্ধি ও গেহাদিতে মম-বুদ্ধি করিয়া তাহাদের ভরণপোষণেই রত হয়। যে দেহগেহাদিতে আসক্ত হইলে, কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, তাহাতেই তাহার আসক্তি জন্মে এবং সত্য-শৌচাদি সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। সকল সঙ্গ অপেক্ষা স্ত্রীসঙ্গ অতি ভয়ঙ্কর। স্ত্রীলোকের সংসর্গে লোকে যেমন মুগ্ধ হইয়া পড়ে, এমন আর কিছুতেই হয় না। অন্যের কথা কি, স্বয়ং ব্রহ্মা স্বীয় কন্যারই রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রহ্মারই যখন এই দশা, তখন তাঁহার সৃষ্ট যে সকল জীব, তাহাদের যে মোহ ঘটিবে, সে বিষয়ে আশ্চর্য্য কি !! অতএব যাহারা মুক্তিপদের প্রার্থী, তাহাদের যোষিৎসঙ্গ একেবারে পরিহার করাই কর্ত্তব্য। যে পুরুষ স্ত্রীর প্রতি একান্ত আসক্ত হয়, সে মৃত্যুকালেও সেই স্ত্রীকেই চিন্তা করিতে থাকে; এবং তজ্জন্য পুনর্ব্বার স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পুরুষাসক্ত স্ত্রীর পক্ষেও এইরূপ নিয়ম জানিবে। এইরূপে জীব পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। কস্মিন্ কালেও তাহার আর মুক্তিলাভ হয় না। অতএব এই

মায়ারচিত অনিত্য দেহগেহাদিতে আসক্তিশূন্য ও হরিভক্তি-পরায়ণ হইয়া জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। সেরূপ করিলে জীবকে আর দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। হরিভক্তির ফলে মুক্তি তাহার করতলগত হইয়া থাকে।

শ্লোক।

পতঙ্গ-মাতঙ্গ-কুরঙ্গ-ভৃঙ্গ-
মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন বধ্যো
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

অর্থ।—পতঙ্গ (পালকযুক্ত পোকা), মাতঙ্গ (হস্তী), কুরঙ্গ (হরিণ), ভৃঙ্গ (ভ্রমর) ও মীন (মৎস্য)—এই পাঁচটি প্রাণী পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটি দ্বারা (অর্থাৎ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া) যখন বিনষ্ট হয়, তখন যে ব্যক্তি অসাবধান হইয়া একাই পাঁচটি দ্বারা (অর্থাৎ চক্ষুরাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া) পাঁচটি (অর্থাৎ রূপাদি পাঁচটি বিষয়) উপভোগ করে, তাহাকে যে নষ্ট হইতে হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

বিশদার্থ—(১) পতঙ্গ কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বশে অগ্নির রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া মরিয়া যায়। (২) যাহারা বন্য হস্তী শিকার করে, তাহারা বনমধ্যে বিস্তীর্ণ গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া, লতাপাতা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া, শক্ত বেড়া দিয়া তাহা ঘেরিয়া থাকে। পরে ঐ গর্ত্তের এক পাড়ে একটা হস্তিনীকে বাঁধিয়া রাখে এবং তাহার বিপরীত পাড়ে ঐ বেড়ার মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার রাখিয়া দেয়। মাতঙ্গ

ত্বগিন্দ্রিয়ের বশে ঐ হস্তিনীর স্পর্শসুখ অনুভব করিবার জন্য ঐ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া, যেমন হস্তিনীর নিকট অগ্রসর হয়, অমনই সেই গর্ত্তে পতিত হইয়া যায়। (৩) ব্যাধেরা হরিণ শিকার করিবার জন্য বনে গিয়া সুমধুর স্বরে বাঁশী বাজাইতে থাকে, কুরঙ্গ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বশে সেই সুস্বরে মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকটে গমন করিলে, ব্যাধেরা তাহাকে বিনাশ করে। (৪) ভৃঙ্গ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বশে দূর হইতে পদ্মের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া মধুপানের জন্য পদ্মের গর্ভে উপবিষ্ট হয়; এবং সে এতই একাগ্রমনে মধুপানে আসক্ত থাকে যে, সায়ংকালে তাহার অজ্ঞাতসারে পদ্ম মুদ্রিত হইয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। সে সমস্ত রাত্রি পদ্মগর্ভে অবরুদ্ধ থাকিয়া, শ্বাসপ্রশ্বাস অভাবে প্রাণত্যাগ করে। (৫) মৎস্য রসনেন্দ্রিয়ের বশে "টোপ" গিলিয়া কাঁটায় বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়। অতএব এক একটি ইন্দ্রিয়ের বশ হইলেই যখন প্রাণ হারাইতে হয়, তখন যে ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বশে রমণী প্রভৃতির রূপে মুগ্ধ হয়, ত্বগিন্দ্রিয়ের বশে তাহাদের আলিঙ্গনসুখে চরিতার্থ হয়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বশে তাহাদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বশে তাহাদের বদনাদিসৌরভে আকৃষ্ট হয়, এবং রসনেন্দ্রিয়ের বশে তাহাদের অধরসুধাদিপানে প্রীতি অনুভব করে, তাহাকে যে অধঃপাতে যাইতে হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

ঐ রোগেই ঘোড়া ম'রেছে।

এক গোসাঁই-গুরুর নানা স্থানে অনেক শিষ্য-সেবক ছিল। তিনি তাহাদের নিকট হইতে বার্ষিকী বৃত্তি আদায় করিবার জন্য এক সময় বহির্গত হইলেন। কয়েক স্থানে যাইয়া দানের পাঁচটী ঘোড়া পাইলেন। ঘোড়াগুলি লইয়া অন্যান্য স্থানে যাইতে অসুবিধা বোধ করায়, এক শিষ্যের

বাটীতে ঐগুলিকে রাখিয়া গেলেন। তাহাকে বলিয়া গেলেন,—"এখন এই ঘোড়াগুলি তোমার বাটীতে রহিল, যথাসময়ে আমি স্বয়ং আসিলে অথবা লোক পাঠাইলে এগুলি প্রত্যর্পণ করিও। যেরূপ অবস্থায় রাখিয়া যাইতেছি, এইরূপ অবস্থায় ফিরিয়া পাইলে আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, তাহাতে তোমার পরম মঙ্গল হইবে। অতএব দেখিও, যেন যত্নের ত্রুটি না হয়।"

শিষ্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঘোড়াগুলি নিজ বাটীতে রাখিয়া দিল। গুরুও নিশ্চিন্ত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। ঐ শিষ্যের পৈতৃক সম্পত্তি বিশিষ্টরূপই ছিল; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সেই সমস্ত সম্পত্তি স্বয়ং হস্তগত করিয়া স্বীয় দুশ্চরিত্রতার বশে প্রায় সমস্তই নষ্ট করিয়াছে। তেমন সুন্দর বাড়ীখানিও বন্ধক দিয়াছে। তথাপি চৈতন্য নাই—অহোরাত্র উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মদ্যপানাদি বিবিধ কুক্রিয়ায় আসক্ত থাকিয়া আমোদে কাল যাপন করিতেছে।

এক দিন অর্থাভাবে আমোদ চালাইবার কোনও উপায় না দেখিয়া সকলেই বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছে। এমন সময় এক বুদ্ধিমান্ বন্ধু বলিল—"ভাবনা কি? গোসাঁই যে ঘোড়াগুলা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের একটা বিক্রয় করিলে ত আজকার দিন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে।" এই কথা শুনিয়া সকলেই তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। এক-জন দূরদর্শী বন্ধু কহিল—"যখন গোসাঁই আসিবেন তখন কি হইবে?" উপযুক্ত শিষ্য উত্তর করিল—"তখন যাহা হয় হইবে। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া বর্ত্তমানের আমোদ উপভোগে বিরত থাকা মূর্খতার পরিচয়।"

তৎক্ষণাৎ যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে একটি ঘোড়া বিক্রয় করা হইল। তৎপরে যে দিন যে দিন অর্থাভাব ঘটিত, সেই সেই দিন এক একটি ঘোড়া বিক্রয় করা হইত। এইরূপে পাঁচটি ঘোড়াই বিক্রয় করিয়া গুরুভক্তির পরা কাষ্ঠা

প্রদর্শন করা হইল। কালক্রমে গুরু লোক পাঠাইলেন। তাহারা গুরুর আদেশ জানাইয়া শিষ্যকে ঘোড়াগুলি প্রত্যর্পণ করিতে কহিল। তখন সকলেই নেশায় বিভোর হইয়া আছে। প্রত্যুৎপন্নমতি শিষ্য বলিল—"বাপু ঘোড়াগুলি দিব কি, সেগুলি কি আর আছে? সবগুলি মরিয়া গিয়াছে।" তাহারা কহিল—"এই কয় দিনে সমস্ত ঘোড়া মারিয়া গিয়াছে, এ কথা বলিলে প্রভু বিশ্বাস করিবেন কেন? হয় ত আমাদের উপরই দোষারোপ করিবেন। অতএব আমরা শুধু যাইতে পারিব না। তাহাদের কিছু নিদর্শন দিন।"

শিষ্য বলিল—"মরিয়া গেলে সেগুলাকে ভাগাড়ে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, শেয়াল কুকুরে খাইয়া ফেলিয়াছে; এখন আর নিদর্শন কি দিব?" তাহারা কহিল—"শেয়াল কুকুরে মাংসই খাইয়াছে, হাড়গুলা ত আছে। অতএব তাহাদের মুখগুলা আনাইয়া দিন, আমরা সেগুলা লইয়া যাইব।" তখন শিষ্য তাহাদিগকে কথায় আঁটিতে না পারিয়া, অগত্যা স্বীয় ভৃত্যদিগের উপর মুণ্ড আনিবার জন্য আদেশ করিল। তাহারাও উপযুক্ত ভৃত্য—সকলেই নেশায় ভোর। আদেশমাত্র ভাগাড়ে গিয়া পাঁচটা গোমুণ্ডের কঙ্কাল আনিয়া উপস্থিত করিল এবং গোসাঁয়ের ভৃত্য-দিগকে কহিল—"এই সেই ঘোড়াগুলার মুণ্ড আনিয়াছি; লইয়া যাও।"

তাহারা কহিল —"এ কি ঘোড়ার মুণ্ড? তবে শিং কেন?"

সিদ্ধির নেশায় বুদ্ধির প্রখরতা ঘটায় প্রত্যুৎপন্নমতি শিষ্য তখনই বলিয়া উঠিল—"বাপু হে! ঐ রোগেই ঘোড়া ম'রেছে। যেমন দুটা শিং বাহির হওয়া, অমনই পড়া আর মরা"।

তাহারা যখন প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া গুরুকে গিয়া জানাইল। গুরু শুনিয়া "অধঃপাতে যাউক" বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন।

এখন বুঝিয়া দেখুন—জগদ্গুরু শ্রীহরিও আমাদিগের নিকট পাঁচটি অশ্ব রাখিয়াছেন। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই সেই

পাঁচটি অশ্ব সেই অশ্বগুলিকে যত্নপূর্ব্বক রাখিতে এবং যে অবস্থায় দিয়াছেন, তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি সে গুলিকে সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন অবস্থায় আমাদিগকে দিয়াছিলেন। আমরা যদি বিশেষ যত্নসহকারে চক্ষুঃ দ্বারা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন, কর্ণ দ্বারা তাঁহার লীলা-কথা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা তাঁহার চরণার্পিত তুলসী আঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন এবং ত্বক্ দ্বারা তাঁহার ভক্তগণের পদধূলি সংস্পর্শ করিতে পারিতাম, তাহা হইলেই সেগুলিকে সেই অবস্থায় রাখা হইত; এবং যথাসময়ে অর্থাৎ আমাদের অন্তকালে তিনি তাঁহার দূতগণকে পাঠাইলে, আমরা তাদৃশ অবস্থায় সেগুলিকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিলে, তাঁহার আশীর্ব্বাদে পরমশ্রেয়ঃ—মুক্তি—লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু অযত্নবশে আমরা সেরূপ করি নাই; সুতরাং সেগুলি ক্রমশঃ রজঃ ও তমোগুণময় হইয়া অসার সংসারেই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিষয়-রূপ বণিকের নিকট আমরা কাচ-মূল্যে সেই সকল কাঞ্চন বিক্রয় করিয়া অনিত্য আমোদ উপভোগ করিতেছি। আমাদের অন্তকালে যখন বিষ্ণু-দূতগণ আসিয়া সেই সকল অশ্ব দেখিতে চাহিবেন, তখন অগত্যা আমা-দিগকে বলিতে হইবে যে, সেগুলি মরিয়া গিয়াছে। পরে তাঁহারা পুনঃ-পুনঃ নিদর্শন চাহিলে আমরা যখন, এই ইন্দ্রিয়গুলিকে দেখাইব, তখন তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন – "এ সব ত সে ইন্দ্রিয় নয়; সেগুলি সত্ত্বসম্পন্ন ছিল, এগুলিকে যে রজস্তমঃ-সম্পন্ন দেখিতেছি।" তখন আমরাও বলিব —"ঐ রোগেই ঘোড়া ম'রেছে—যেমন রজঃ ও তমোরূপ দুইটি শিং বাহির হওয়া, অমনই সংসারকূপে পড়া আর মরা।"

তাঁহারা তখন প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া ভগবান্‌কে জানাইবেন। ভগ-বান্‌ও "অধঃপাতে যাও" বলিয়া আমাদিগকে অভিসম্পাত করিবেন। আমাদিগকে তখন এই মানব-দেহের অন্তে কীটপতঙ্গাদি চতুরশীতি লক্ষ দেহ ধারণ করিয়া বেড়াইতে হইবে।

অতএব এখন হইতে আমাদের সেরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক, যাহাতে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সতত শ্রীহরির কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া অন্তকালে সত্ত্বগুণসম্পন্ন অবস্থায়ই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি। তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় আমরা আর দুর্গতিভোগ না করিয়া সদ্গতি লাভে সমর্থ হইব।

প্রার্থনা।

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে,
যদ্ ভাব্যং তদ্ ভবতু ভগবান্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি,
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

(মুকুন্দমালা)

ধর্ম্মে মোর আস্থা নাই, ধনরাশি নাহি চাই,
নাহি সাধ সুখ উপভোগে।
নাহি চাহি সেই সবে, যা হবার তাই হবে,
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফল-যোগে॥
এইমাত্র চাহি হরি,— যে দেহ ধারণ করি,
তাহাতেই যেন হে আমার,
অচলা ভকতি হয়, সদা মতিগতি রয়,
শ্রীচরণকমলে তোমার॥

পাশা-খেলা।

আজি কালি আমাদের দেশে পাশা-খেলার খুবই প্রচলন হইয়াছে। বালক, যুবক, বৃদ্ধ—সকলেই প্রায় পাশা-খেলার মত্ত। "মেয়ে মানুষের খেলা" বলিয়া "তাস" বড় কেহ আর ছোঁয় না। সতরঞ্চ খেলায় গালে হাত দিয়া অনেক ভাবিতে হয়, যেন কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, —এই দোষ ধরিয়া অনেকে তাহাতেও উপেক্ষা করেন। কিন্তু পাশা-খেলায় বড় আমোদ !! পাশা খেলিবার সময় অশীতিপর বৃদ্ধেরও আনন্দ-চীৎকারে গগনভেদ হয়, গর্ভিণীর গর্ভপাত ঘটে, ছেলের পীলে চম্‌কিয়া যায়। তিনি যখন "কচে বার" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, তখন পাশা যদি ঠিক "কচে বার"ই পড়ে, তাহা হইলে তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন; ও দিকেও যে তাঁহার কচে (কেশে) বার (যমের ধরিবার পালা] পড়িয়াছে, তাহা আর ভাবিয়া দেখেন না।

পাশা-খেলা এতাদৃশ আনন্দদায়ক হইলেও, প্রবাদ আছে—"পাশা-খেলায় লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়"। এ প্রবাদ শাস্ত্রমূলকও বটে। যেহেতু শাস্ত্রে আছে—

> দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
> ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥
> কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
> বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু॥
> মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
> তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ॥
> পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষাসূয়ার্থদূষণম্।
> বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ॥

পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমম্।
এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে॥
দণ্ডস্য পাতনঞ্চৈব বাক্‌পারুষ্যার্থদূষণে॥
ক্রোধজেঽপি গণে বিদ্যাৎ কষ্টমেতৎ ত্রিকং সদা।
সপ্তকস্যাস্য বর্গস্য সর্ব্বত্রৈবানুষঙ্গিণঃ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুতরং বিদ্যাদ্ ব্যসনমাত্মবান্॥
ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোধো ব্রজতি স্বর্যাত্যব্যসনী মৃতঃ॥

(মনুসংহিতা)

সুখভোগেচ্ছাজনিত ১০টি এবং ক্রোধজনিত ৮টি ব্যসন অর্থাৎ দূষণীয় কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু সেগুলি আপাত-সুখপ্রদ হইলেও পরিণামে দুঃখজনক। যে রাজা কামজ বাসনে আসক্ত হন, তাঁহার ধন ও ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; এবং ক্রোধজ ব্যসনে আসক্ত হইলে মৃত্যু ঘটে। মৃগয়া, পাশা-খেলা, দিবানিদ্রা, পরদোষকথন, স্ত্রীসমূহ অর্থাৎ বহুস্ত্রী-সম্ভোগ, মদ্যপান, তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত, বাদ্য, এবং বৃথাপর্য্যটন—এই ১০টি কামজ ব্যসন। পৈশুন্য অর্থাৎ অন্যের যে দোষ কেহ জানে না তাহা প্রকাশ করা, সাহস অর্থাৎ নির্দ্দোষের প্রতি বন্ধনাদি নিগ্রহ, দ্রোহ অর্থাৎ ছল করিয়া প্রাণ-সংহার, ঈর্ষা অর্থাৎ অন্যের প্রশংসা সহিতে না পারা, অসূয়া অর্থাৎ অন্যের গুণে দোষারোপ করা, অর্থদূষণ অর্থাৎ অর্থ অপহরণ করা এবং দেয় অর্থ না দেওয়া, বাক্‌পারুষ্য অর্থাৎ গালাগালি দেওয়া, এবং দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ প্রহার করা—এই ৮টি ক্রোধজ ব্যসন। কামজ-গণের মধ্যে মদ্যপান, পাশা-খেলা, স্ত্রীসমূহ ও মৃগয়া—এই ৪টি অধিক দুঃখ-জনক; এবং ক্রোধজগণের মধ্যে দণ্ডপারুষ্য, বাক্‌পারুষ্য ও অর্থদূষণ—এই ৩টি অধিক দুঃখজনক। আবার মদ্যপানাদি উক্ত ৭টি ব্যসনের মধ্যে

পূর্ব্বপূর্ব্ব ব্যসন গুরুতর বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ অর্থদূষণ অপেক্ষা বাক্‌পারুষ্য গুরুতর, বাক্‌পারুষ্য অপেক্ষা দণ্ডপারুষ্য গুরুতর, দণ্ডপারুষ্য অপেক্ষা মৃগয়া গুরুতর, মৃগয়া অপেক্ষা স্ত্রীসমূহ গুরুতর, স্ত্রীসমূহ অপেক্ষা পাশা-খেলা গুরুতর, এবং পাশা-খেলা অপেক্ষা মদ্যপান গুরুতর। ব্যসন ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যসনই অধিক কষ্টকর; যেহেতু ব্যসনাক্ত ব্যক্তিতে মরণান্তে যাবতীয় নরকে গমন করিতে হয় এবং ব্যসনে অনাসক্ত ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে।

ইহাতে বুঝা গেল যে, ১৮ প্রকার ব্যসনের মধ্যে মদ্যপান সর্ব্বাধিক দোষাবহ, এবং পাশা-খেলা তারই নীচে। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মহা-মহোপাধ্যায় কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন—"পাশা-খেলায় বৈরভাব জন্মে এবং বিষ্ঠামূত্রের বেগ ধারণে ব্যাধির উৎপত্তি হয়।" বাস্তবিক কথা; খেলিতে বসিয়া উপর্য্যুপরি পরাজিত হইলে বিপক্ষের প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষ ঘটিয়া থাকে। এবং খেলার অনুরোধে মলমূত্রের বেগ ধারণও করিতে হয়; বৈদ্যশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মলমূত্রের বেগধারণে ক্ষয়কাস জন্মে। এই জন্যই পাশা-খেলা এত দূষণীয়।

উল্লিখিত মনুবচনে পাশা-খেলা নিষিদ্ধকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও, লিঙ্গপুরাণে ও ব্রহ্মপুরাণে আবার পাশা-খেলার বিধিও আছে। যথা—

নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্ত্তীতিভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ॥

(লিঙ্গপুরাণ)

(আশ্বিন মাসের কোজাগর পূর্ণিমায়) মধ্যরাত্রে বরদাত্রী লক্ষ্মী বলিতে থাকেন—কে জাগিয়া আছে? যে অক্ষক্রীড়া করিতেছে, তাহাকে আমি ধন দিব।

শঙ্করশ্চ পুরা দ্যূতং সসর্জ্জ সুমনোহরম্।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেঽহনি ভূপতে॥
জিতশ্চ শঙ্করস্তত্র জয়ং লেভে চ পার্ব্বতী।
অতোঽর্থাচ্ছঙ্করো দুঃখী গৌরী নিত্যং সুখোষিতা॥
তস্মাদ্দ্যূতং প্রকর্ত্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ।
তস্মিন্ দ্যূতে জয়ো যস্য তস্য সংবৎসরঃ শুভঃ।
পরাজয়ো বিরুদ্ধস্তু লব্ধনাশকরো ভবেৎ॥
(ব্রহ্মপুরাণ)

কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদের (দ্যূতপ্রতিপদের) দিন মহাদেব দ্যূত-ক্রীড়ার (পাশা-খেলা প্রভৃতির) সৃষ্টি করেন। সেই খেলায় মহাদেব হারিয়াছিলেন এবং পার্ব্বতী জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য মহাদেব চিরদুঃখী, গৌরী চির-সুখিনী হইয়াছেন। অতএব সেই দিন প্রাতঃকালে মনুষ্য দ্যূতক্রীড়া করিবে। সেই দ্যূতে যাহার জয় হইবে, তাহার সংবৎসর সুখে যাইবে; এবং যাহার পরাজয় হইবে, তাহার বিপরীত ফল ও বিত্তনাশ ঘটিবে।

এখন ত পাশা-খেলার বিধি, নিষেধ—দুইই পাওয়া গেল। কোজাগরী পূর্ণিমায় ও দ্যূতপ্রতিপদে পাশা-খেলা বিহিত এবং তদ্ভিন্ন দিনে নিষিদ্ধ হইতেছে। এত দিন থাকিতে ঐ দুই দিনেই বিহিত কেন, তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে দ্যূতপ্রতিপদ্ পাশা-খেলার জন্মদিন বলিয়া ঐ পাশা-খেলা বিধেয়; এবং মহাদেব শঙ্কর অর্থাৎ জগতের হিতকারী বলিয়া লোকশিক্ষার্থে—পাশা-খেলার দোষ প্রদর্শনার্থে —স্বয়ং পাশা-খেলার সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও, পাশা-খেলার জন্য চিরদুঃখে জীবন যাপন করিতেছেন। দ্বিতীয় কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, কোজাগরী পূর্ণিমায় পাশা-খেলা বিহিত কেন, তৎপক্ষে লক্ষ্মী-বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ

করা আবশ্যক। লক্ষ্মী বলেন—"নিশীথকালে কে জাগিয়া পাশা খেলিতেছে, তাহাকে আমি বিত্ত প্রদান করিব।" এ কথার তাৎপর্য্য এই যে (নিশীথকালে সকলেই নিদ্রাভিভূত থাকে, অতএব) নিশীথকালে অর্থাৎ সাধারণের মোহাচ্ছন্ন-অবস্থায় যে ব্যক্তি জাগিয়া অর্থাৎ তত্ত্ব বুঝিয়া পাশা খেলে, তাহাকেই লক্ষ্মী ধন অর্থাৎ ঐহিক সম্পদ্ এবং পারত্রিক মোক্ষরূপ পরম ধন প্রদান করেন।

এতাবতা বুঝা গেল যে, তত্ত্ব বুঝিয়া পাশা খেলাই সর্ব্বকালে বিহিত এবং তত্ত্ব না বুঝিয়া পাশা খেলাই নিষিদ্ধ। তত্ত্ব বুঝিয়া পাশা খেলিলে লোকে ইহকাল ও পরকালে শ্রেয়োলাভ করে, এবং তত্ত্ব না বুঝিয়া পাশা খেলিলে বিপদ্গ্রস্ত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—তত্ত্ব না বুঝিয়া পাশা খেলিয়া যুধিষ্ঠির রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে কুরুকুলও নির্ম্মূল হইয়াছিল। আবার নল রাজাও প্রথমেও তত্ত্ব না বুঝিয়া পাশা খেলায় রাজ্যভ্রষ্ট হন, পরে কর্কোটক নাগের উপদেশে অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণের নিকট তাহার তত্ত্ব অবগত হইয়া পুনঃ রাজ্যাদি শ্রেয়ঃ লাভ করেন। তাই কুল্লূকভট্টও লিখিয়াছেন যে "ব্যসনের সেবা করা একবারে নিষিদ্ধ নহে, তবে তাহাতে অতিপ্রসক্তিই নিষিদ্ধ।" অতিপ্রসক্তি ঘটিলে তত্ত্ববোধ থাকে না; সেই জন্যই তিনি অতিপ্রসক্তির নিষেধ করিয়াছেন।

অতএব তত্ত্ব না বুঝিয়া পাশা-খেলায় যখন গুরুতর দোষ ও মহতী বিপদ্ ঘটে, তখন কাহারও সেরূপ পাশা খেলা কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা পাশা-খেলা ভাল বাসেন, তাঁহারা তত্ত্ব বুঝিয়া পাশা খেলুন; তাহা হইলে আরও অধিক আমোদ পাইবেন, এবং ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। পাশা-খেলার তত্ত্ব যে কি, তাহা এখন সবিস্তর বিবৃত করা যাইতেছে।

পাশা-খেলায় যে যে উপকরণ আবশ্যক, অগ্রে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি।—

১। ছক—ইহা বিভিন্ন রঙ্গের বনাতের টুকরা দিয়া নির্ম্মিত। ইহার চারি দিকে চারিটি পন্থা আছে। প্রত্যেক পন্থায় তিন শারিতে ৮টি করিয়া ২৪টি ঘর বা পদ আছে। মধ্যস্থলে একটি বড় ঘর বা উচ্চপদ আছে। সকল পন্থা দিয়াই ঐ বড় ঘরে ঘুটী উঠিতে পারে।

২। গুটী বা ঘুটী—১৬টি। গৌরবর্ণের ৪টি, লালবর্ণের ৪টি, সবুজ-বর্ণের ৪টি, এবং কৃষ্ণবর্ণের ৪টি।

৩। পাশা—৩টি। এগুলি অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত এবং এক-দুই-প্রভৃতি-সংখ্যা-বোধক বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত। পাশা যেরূপ পতিত হয়, তদনুসারে ঘুটী চলিতে থাকে।

সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠ মনুষ্য কিরূপে সংসারচক্রে পরিক্রমণ করিয়া মুক্তিপদ লাভ করিতে পারে, তাহা শিক্ষা দেওয়াই এ খেলার উদ্দেশ্য। যথা—

১। ঐ ছকটিই হইতেছে এই সংসারচক্র। সংসার-চক্রেও চারিটি পন্থা অর্থাৎ ধর্ম্ম-পথ আছে। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, বৈশ্যের ধর্ম্ম ও শূদ্রের ধর্ম্ম; এই চারি বর্ণের চারি ধর্ম্ম। প্রত্যেক পন্থায় তিনটি শারি আছে; অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম্মপথ বৈদিক, তান্ত্রিক ও পৌরাণিক—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণীতে ৮টি পদ আছে; অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম্ম-পদ্ধতি আটপ্রকার। তথাহি—

ইজ্যাধ্যয়ন-দানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা।
অলোভ ইতি মার্গোহয়ং ধর্ম্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ॥

(যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্য, সন্তোষ, ক্ষমা ও নির্লোভতা—ধর্ম্মের পথ এই আট প্রকার।)

প্রত্যেক ধর্ম্মপথ দিয়াই উচ্চপদে (অর্থাৎ মোক্ষপদে) যাওয়া যায়; অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ স্বস্ব ধর্ম্মপথে চলিয়াই মুক্তিপদ লাভ করিতে পারেন।

২। বিভিন্ন বর্ণের চারি প্রকার গুটীই ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ। (ক) গৌরবর্ণের গুটীগুলি ব্রাহ্মণ। কারণ, ব্রাহ্মণ সত্বগুণ হইতে উৎপন্ন। সত্বগুণের বর্ণ শুভ্র। ঐ গুটিগুলি শুভ্র বর্ণের হওয়া সঙ্গত হইলেও, সাদা রং শীঘ্র মলিন হইয়া যায় বলিয়া, লোকে হ'লদে রঙের ঘুটী ব্যবহার করিয়া থাকে। অভিধানে গৌর শব্দের অর্থ শুভ্র ও পীত দুইই আছে এবং কাব্যেও গৌর শব্দের ঐ দুই অর্থই ব্যবহার দেখা যায়। (খ) ক্ষত্রিয় রজোগুণে উৎপন্ন। রজোগুণের বর্ণ লাল। অতএব লাল-বর্ণের গুটীগুলি ক্ষত্রিয়। (গ) রজঃ ও তমগুণের অংশে বৈশ্যের উৎপত্তি। রজোগুণের বর্ণ রক্ত ও তমোগুণের বর্ণ কৃষ্ণ; রক্ত ও কৃষ্ণ উভয়ের সংমিশ্রণে শ্যামবর্ণ হয়। অতএব শ্যাম অর্থাৎ সবুজ বর্ণের গুটী-গুলি বৈশ্য। (ঘ) তমোগুণে শূদ্রের উৎপত্তি। তমোগুণের বর্ণ কৃষ্ণ। অতএব কৃষ্ণবর্ণের গুটীগুলি শূদ্র। (ঙ) বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও ও বৃদ্ধত্ব—এই চারি অবস্থা প্রকাশার্থে প্রত্যেক বর্ণের গুটীর সংখ্যা ৪ হইয়াছে।

৩। পাশাই দৈব অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে কর্ম্ম ত্রিবিধ বলিয়া উহার সংখ্যা তিন হইয়াছে। গুটী নিজের ইচ্ছায় চলিতে পারে না—পাশা বশেই চলে; অর্থাৎ মনুষ্য আপন ইচ্ছায় কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না—দৈবের বশেই সকল কাজ করিয়া থাকে।

ঐ গুটীগুলি প্রথমে আপন আপন পন্থায় বসিয়া থাকে। হ'লদে গুটীগুলি নিজ পথে বসিলে, তাহাদের ডা'ন দিকে লালগুটী, লালগুটীর ডা'ন দিকে সবুজগুটী, এবং তাহাদের ডা'ন দিকে কাল গুটীগুলি বসে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ প্রথমতঃ যথাক্রমে স্বস্ব ধর্ম্মপথই অবলম্বন করেন।

তার পর গুটীগুলি পাশার বশে চলিতে আরম্ভ করিয়া আপন পন্থা

ছাড়িয়া ক্রমশঃ অন্য সকলের পন্থায় প্রবেশ করে; অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ দৈবের বশে চলিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মও গ্রহণ করিয়া থাকেন। সংসারে সকলে সুখের জন্য লালায়িত; কিন্তু প্রকৃত সুখ কোথায়, বুদ্ধির দোষে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, অধীর হইয়া আটু-পাটু করিতে থাকে। ব্রাহ্মণ যজনযাজনাদি-স্বধর্ম্ম-প্রতিপালনে সুখ না পাইয়া, রাজ্যপালনাদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহাতেও সুখ না পাইয়া কৃষি-বাণিজ্যাদি বৈশ্য-বৃত্তি অবলম্বন করেন, এবং তাহাতেও সুখ না পাইয়া, শূদ্রবৃত্তি দাসত্ব পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকেন! এইরূপে ক্ষত্রিয় ক্রমশঃ বৈশ্যবৃত্তি, শূদ্রবৃত্তি ও ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করেন। বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি স্বীকার করেন। এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করেন।

তাঁহারা অন্যের স্থান অধিকার করিতে গিয়া গুটীর ন্যায় কখনও ফাঁকা ঘরে বসেন, কখনও কাহাকেও মারিয়া বসেন। আবার কখনও একা যান, কখনও দুই তিন জনে মিলিয়া যান। কিন্তু চারিদিক্ ঘুরিয়া কিছুতেই সুখ না পাইয়া, শেষে আবার স্বপথে অর্থাৎ স্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসেন।

সকল পন্থায় ঘুরিয়া ঘুটী যখন স্বপন্থায় ফিরিয়া আসে, তখন উচ্চ ঘরে উঠিতে থাকে এবং উঠিবার সময় মাথা হেঁট করে। অর্থাৎ মনুষ্য তখন বুঝিতে পারেন—সংসারে কিছুতেই সুখ নাই; মোক্ষপদেই প্রকৃত সুখ আছে। তাই এখন সেই পদ পাইবার জন্য প্রবৃত্ত হন। এতক্ষণ অভিমান-বশে উচ্চশিরে সংসার-চক্রে ঘুরিতেছিলেন; এক্ষণে অভিমান ত্যাগ করিয়া নতশিরে মোক্ষপদে অগ্রসর হইতে থাকেন। নতশির না হইলে মোক্ষপদে প্রবেশ করা যায় না। কারণ, নরকের অভ্যন্তর বড় সঙ্কীর্ণ হইলেও তাহার দ্বার খুব প্রসারিত অর্থাৎ অনায়াসে প্রবেশ করিবার যোগ্য; সেইজন্য উচ্চশিরে নরকের দ্বারে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু

মুক্তিপদের অভ্যন্তর প্রসারিত হইলেও তাহার দ্বার বড় সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ তপস্যাপ্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ স্বীকার না করিলে তাহাতে প্রবেশ করা যায় না। এইজন্য সেই সঙ্কীর্ণ দ্বারে প্রবেশ করিতে হইলে মাথা হেঁট করিতে হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঘুটী আপন ইচ্ছায় চলে না—পাশার বশে চলে। উঠিবার সময়ও যদি প্রতিকূল পাশা পড়ে, তাহা হইলে সে ঘুটীকে কাঁচিতে হয়—আবার নামিয়া আসিতে হয়—আবার সকল পন্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; অর্থাৎ মুক্তিপদে অগ্রসর হইবার সময় যদি দৈব প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে মনুষ্যকে সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আবার এই সংসার চক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ক্রীড়াচ্ছলে বুঝাইবার জন্যই পাশাখেলার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার সার মর্ম্ম এই বুঝিতে হইবে যে, সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, দুর্ল্লভ মানব-জন্ম পাইয়া,স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করাই সকলের কর্ত্তব্য। তুচ্ছ সংসারের লালসায় কদাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত নহে। স্বধর্ম্মে না থাকিলে কেহই মুক্তিপদ পাইবার অধিকারী হয় না; এই জন্যই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

পরধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ও আপন ধর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও পরধর্ম্ম অপেক্ষা স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে থাকিয়া মরণও মঙ্গল; কারণ, তাহাতে সদ্গতি হয়। পরধর্ম্ম অতি ভয়ানক; কারণ তাহাতে অধোগতিই হইয়া থাকে।

স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া হরিভক্তির অনুশীলন করিলে, দৈবও অনুকূল হয়, এবং তদ্দ্বারা অনায়াসেই মুক্তিপদ লাভ করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

———

প্রার্থনা।

অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিত-ধূলি-সদৃশং বিচিন্তয় ॥

(পদ্যাবলী)

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া,
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা।
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি-সম,
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সংকীর্ত্তন।

এ কি সাজ, হরি হেরি আজ,
(আমি) বুঝিতে নারি, নারী কি কারণ।
তেজিয়ে বাঁশী ও কাল-শশী,
(কেন) করেতে অসি ক'রেছ ধারণ ॥
কই হে তোমার পীতধড়া, কই সে তোমার মোহন চূড়া,
(কেন) এলোকেশে রণবেশে হয়েছ হে দিগম্বরী।
কি লাগিয়ে কাল-সোণা, হ'য়েছ হে ত্রিনয়না,
(কেন) লোল-জিভা শত-শিবা, সঙ্গে তব সহচরী ॥
(কেন) শবহৃদি'পরে দাঁড়ায়ে নারায়ণ।
তেজি বনমালা, পরি মুণ্ডমালা, মদেতে বিভলা কি কারণ।
(আজি) (নারায়ণ আজি)

(ওহে) কে দিয়েছে বল, জবা বিল্বদল,
সাজাতে রাতুল শ্রীচরণ। (আজি) (নারায়ণ আজি)
ফেলিয়ে তুলসীদল বিল্বদল কে দিয়েছে।
সচন্দন রক্তজবা (তোমার) রাঙ্গা পায় কে পরায়েছে ॥
সুধাই তোমায় বল বল হে ; (তাই) (নারায়ণ তাই)
সজল জলদে যেন প্রভাত-তপনের ছটা।
দশ নখে বিরাজিছে মরি কি চাঁদের ঘটা ॥
(এমন অপরূপ কভু হেরি নাই ;
মেঘের কোলে রবি শশী কভু হেরি নাই ;
ওহে নারায়ণ এমন অপরূপ কভু হেরি নাই)
দ্বিভুজে মুরলী ধরি বাজাতে নিকুঞ্জ বনে।
(আজি) চতুর্ভুজে বরাভয় অসিমুণ্ড কি কারণে ॥
(হেন ভাব, কেন কেন হে)
(নারায়ণ তোমার হেন ভাব কেন কেন হে)
কি ভাবে কবে যে থাক হরি। (তুমি)
তব ভাব ভাবি ভব, হ'য়েছেন শ্মশানচারী ॥ (সদা)
লুকায়েছ বেশ ভূষণ, ক'রেছ সে ভাব গোপন,
লুকাতে সে কাল বরণ, (তবু) পেরেছ কৈ কালবারি ॥
কি ভাবে দাঁড়ায়ে হেথা, বুঝেছি সে তত্ত্বকথা,
ঘুচাতে সন্তানের ব্যথা, (আজি) মা সেজেছ হে মুরারি ॥
ডাকি মা ব'লে, নিও মা কোলে,
যবে আসিবে শিবে, শিয়রে শমন ॥ (ও মা)

রাধাকৃষ্ণ একই।

এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া প্রথমেই আমার বাল্যকালের একটি ঘটনা মনে পড়িল। তাহা গ্রাহকগণের বিরক্তিকর হইবে, এরূপ আশঙ্কা হইলেও, তিনটি কারণে না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। ১ম কারণ—গ্রাহক মহোদয়গণকে আমি পরম আত্মীয়ই মনে করিয়া থাকি, তাহাতে সেই ঘটনা উপলক্ষে আমার হৃদয়ে একটি প্রবল অনুতাপানল আজি পর্য্যন্ত সমভাবেই প্রজ্বলিত রহিয়াছে; সুতরাং ("স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো বিবৃত দ্বারমিবোপজায়তে"—কুমারসম্ভব) আত্মীয় স্বজনের নিকট দুঃখের কপাট যেন একবারে খুলিয়া যায়; দুঃখের এই স্বধর্ম্ম।

২য় কারণ—("সিণিদ্ধজণ-সংবিভত্তং হি দুক্খং সজ্ঝ-বেঅণং হোই"—শকুন্তলা) বন্ধুজনদিগের নিকট দুঃখের কথা বলিয়া তাহা তাঁহাদিগকে ভাগ করিয়া দিলে, তাহার যাতনা অনেকটা কম পড়িয়া সহ্য হইবার যোগ্য হয়; এই বিশ্বাস।

৩য় কারণ—আমার সেই দুঃখের কথা শুনিয়া হরিভক্ত গ্রাহক মহোদয়-গণের মধ্যে যদি কাহারও হৃদয় কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়, তাহা হইলে ভক্ত-হৃদ্বিহারী হরিকেও বিচলিত হইতে হইবে; তখন সেই চাঞ্চল্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি দ্বেষভাবে এ অধমকে স্মরণ করিতে বাধ্য হইবেন; শিশুপালাদি নৃপতিগণ যাঁহাকে দ্বেষভাবে স্মরণ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে, তিনিই স্বয়ং দ্বেষভাবে যাহাকে স্মরণ করিবেন, তাহার ভববন্ধন মোচন অবশ্যই হইবে; এই আশা।

প্রার্থনা, উদারচেতা গ্রাহক মহোদয়গণ আমার তজ্জনিত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

আমি ৭ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে পিতৃহীন হইয়া তদবধি পরবাসে পর-প্রত্যাশে পঠদ্দশা অতিবাহিত করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ বহুশাস্ত্রবিশারদ

পূজ্যপাদ ৺জ্যেষ্ঠ মাতুল মহাশয়ের টোলে ৮ বৎসর হইতে ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, অমরকোষ, ধাতুপাঠ ও কয়েকখানি স্মার্ত্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। তিনি পুরাণব্যবসায়ীও ছিলেন, তজ্জন্য পাঠকতা-কার্য্যের অনুরোধে বৎসরের মধ্যে প্রায় ৩।৪ মাস স্থানান্তরে থাকিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে আমি বাঙ্গালা অনুবাদের সাহায্যে হিতোপদেশ, মহানাটক, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ নিজে নিজে আলোচনা করিতাম এবং তাঁহার এক প্রাতিবেশীর নিকট একটু একটু ইংরাজীও শিখিতাম। এ সব কিন্তু তাঁহাকে জানিতে দিতাম না। পরে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের প্রারম্ভে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইলাম। তৎকালে প্রথমে এক নিকট আত্মীয়ের বাটীতে ছিলাম। তিনি আমায় আহার দিতেন, কলেজের বেতন দিতেন এবং বই কিনিবার জন্যও কিয়দংশে অর্থসাহায্য করিতেন। কিছু দিন পরে সে বাটীতে থাকিবার অসুবিধা ঘটায়, অন্য এক পরিচিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটীতে থাকিতে হইয়াছিল। তিনি অকাতরে আহার দিতেন; কিন্তু কোনপ্রকার অর্থ-সাহায্য করিতেন না; তাঁহার সহিত তাদৃশ সম্বন্ধও ছিল না। সুতরাং সে সময় বেতন ও পুস্তকের মূল্য বা পুস্তক, সমস্তই ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইত। যে সকল গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠ্য হইত, তাঁহাদের অনেকের নিকট পুস্তক ভিক্ষা করিতে যাইতাম। সেই উপলক্ষে একবার হুগলী যাইতে হইয়াছিল। হাতে তখন ৪টি বই পয়সা ছিল না; সুতরাং হাঁটিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। তখন আমার বয়স ১৬ বৎসর। কখনও হুগলী যায় নাই, হুগলীর পথও চিনি নাই। ভুগোলে পড়িয়াছিলাম—হুগলী গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। অতএব গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিয়া যাইলে হুগলীতে পৌঁছিতে পারিব মনে করিয়া, সেই ৪টি মাত্র পয়সা সম্বল লইয়া, শনিবারে কলেজের ছুটির পর যাত্রা করিলাম। তখন গঙ্গার উপর পোল প্রস্তুত হইয়াছে; কিন্তু এক পয়সা করিয়া পারের মাশুল লাগিত।

আমি পোল পার হইয়া হাওড়ায় গিয়া "গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক্ রোড্" ধরিয়া হাঁটিতে লাগিলাম। আষাঢ় মাস; এ পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল; তজ্জন্য অনেকক্ষণ এক স্থানে বসিতে হইয়াছিল। যখন চন্দননগরে পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা হইল। শুনিলাম সেখান হইতে হুগলী ১॥ ক্রোশ। মনে ভাবিলাম, রাত্রে সেখানে থাকিবার স্থান মিলিবে কি না, তাহার ত স্থিরতা নাই; অতএব আজি এই খানেই বরং থাকা যাউক। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার বয়স, বোধ হইল, পঞ্চাশের উপর হইয়াছে। তাঁহাকে সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, কোথাও থাক্‌বার স্থান পাওয়া যাবে?" তিনি বলিলেন—"আমার বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পার। আমি বাজারে যাচ্চি, সেখানকার কাজ সেরেই বাড়ী যাব। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে এস।" শুনিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইল; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তিনি বাজারে প্রবেশ করিয়া এক পোদ্দারের দোকানে প্রায় ১ ঘণ্টা বসিয়া তামাক খাইলেন ও গল্প করিতে লাগিলেন। আমি বাহিরে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া রহিলাম। তার পর যখন তিনি উঠিলেন, তখন আমিও উঠিলাম। দেখিয়া তিনি বলিলেন—"এখনও আমার কাজ সারা হয় নাই; তুমি এই খানে বৈস, আমি এখনই আস্‌চি।" আমি অগত্যা পুনর্ব্বার বসিলাম; কিন্তু প্রায় ২ ঘণ্টা অতীত হইল, তথাপি তিনি ফিরিলেন না। ১০টা বাজিল, পোদ্দার উঠিয়া আমাকে কহিল—"ওঠ ত, বেঞ্চি খানা তুলে দোকান বন্ধ করি।"

আমি।—সে ব্রাহ্মণ ঠাকুর যে এখনও এলেন না!

পোদ্দার।—তিনি তোমার কে হন?

আমি।—কেহ হন না; আমি বিদেশী লোক; তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে থাক্‌তে দিবেন ব'লেছিলেন।

পোদ্দার।—তুমিও যেমন, সে ফোক্কড়ের কথায় বিশ্বাস ক'রেছ! সে এতক্ষণ ঘরে গিয়া ঘুমুচ্চে।

আমি।—তাঁর বাড়ীটা কোন্ খানে?

পোদ্দার।—সহরের বাইরে, মাঠ পার হ'য়ে প্রায় তিন পোয়া পথ যেতে হবে।

আমি।—তবে আমার উপায় কি হবে? আপনার বাড়ীতে দয়া ক'রে একটু স্থান দেবেন?

পোদ্দার।—আমার বাড়ীতে স্থান হবে না। ঐ দিকে "চটি" আছে দেখ।

এই বলিয়া পোদ্দার দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আমি তখন যে দিকে চাহিলাম, সেই দিক্ই অন্ধকার দেখিলাম। আর একটি জন-প্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না। চক্ষে জল আসিল। পোদ্দার "চটি" দেখিতে বলিয়া গেল, আমি তখন "চটি" কাহাকে বলে জানিতাম না; অনুমানে বুঝিলাম, কোনও থাকিবার স্থান হইবে। বাজার হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় গেলাম। দেখিলাম, একখানি দোকান-ঘরে একটি ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে। সেখানে গিয়া দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ গা! চটি কোন্ খানে?"

দোকানী।—এই চটি। কেন? তুমি থাক্‌বে?

আমি।—হাঁ।

দোকানী।—ক'জন?

আমি।—আমি একা।

দোকানী।—একার মতই জায়গা আছে।

আমি।—কি দিতে হবে?

দোকানী।—শুধু শোবার জন্য এক পয়সা। যদি খেতে চাও, তার খরচ আলাদা লাগবে।

আমি।—খেতে চাই না, কেবল শোব।

দোকানী।—তবে ভিতরে এস।

আমি ভিতরে প্রবেশ করিলে দোকানী দ্বার বন্ধ করিয়া আমার নিকট হইতে অগ্রে পয়সাটি চাহিয়া লইল, পরে বিছানা দেখাইয়া দিল। আমি সেই বিছানায় গিয়া বসিলাম। দেখিলাম তাহাতে আরও ৪।৫ জন অসভ্য ইতর লোক শুইয়া আছে। তাহাদের পার্শ্বে আমাকে শুইতে হইবে! বিছানাটা খেঁজুর পাতার "চেটা"—ধূলা বালিতে ভরা; বালিশটা চট-জড়ান এক আঁটি খড়—আলকাত্‌রার মত কাল ও চট্‌চট্যে। সে বিছানায় শুইতে প্রবৃত্তি হইল না। দোকানী একটা বাঁশের মাচার উপর শুইয়া আলো নিবাইয়া দিল। আমি বসিয়াই রহিলাম। কখনও ঘুমের ঘোরে ঢুলি, কখনও মশা তাড়াই, আর মাঝে মাঝে পার্শ্বস্থ একটা অসভ্য লোকের গুঁতা ও লাথি খাই। এইরূপে রাত্রি কাটাইলাম। প্রাতঃকালে সেখান হইতে হুগলিতে পৌঁছিলাম এবং অনুসন্ধান করিয়া গ্রন্থকারের বাটীতে গেলাম। কিন্তু পুস্তক পাইলাম না। "তোমার মত অনেক আছে, সকলকে দিতে গেলে আমায় এ ব্যবসা ছাড়্‌তে হয়" বলিয়া তিনি বিরক্তি-সহকারে অন্দরে প্রবেশ করিলেন; আর বাহিরে আসিলেন না। আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, বাহির হইলাম।

পূর্ব্ব রাত্রের বিছানা মনে পড়ায় ঘৃণা বোধ হইতেছিল, সুতরাং গঙ্গায় পড়িয়া স্নান করিলাম এবং জামা, চাদর, ছাতা, জুতা—সমস্তই ধুইয়া ফেলিলাম। তৎপরে সন্ধ্যা সারিয়া একটা দোকানে গিয়া বসিলাম। তখন সঙ্গে ২টি পয়সা ছিল; এক পয়সা গঙ্গাপারের জন্য রাখিয়া, এক পয়সার বাতাসা কিনিয়া জলযোগ করিলাম। চাদরখানি অগ্রে শুষ্ক করিয়া, সেখানি পরিয়া ধুতি ও জামাটা শুকাইতে দিলাম। ধুতিখানা শুষ্ক হইলে, সেখানা পরিয়া চাদরখানা আবার কাচিলাম, আবার শুষ্ক করিলাম। এইরূপ করিতে করিতে ১১টা বাজিয়া গেল; তখনও জামাটা শুকায় নাই। কিন্তু আর

অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। কলিকাতায় আসিবার জন্য বাহির হইলাম।

পূর্ব্ব দিন তত হাঁটা হইয়াছে, রাত্রে আহারনিদ্রা হয় নাই, সে দিনও তত বেলা পর্য্যন্ত খাওয়া নাই, সেজন্য শারীরিক কষ্ট; তাহার উপর যে আশায় এত কষ্ট করিয়া আসিলাম, তাহা বিফল হইল ভাবিয়া মানসিক কষ্ট; সুতরাং সে দিন বড়ই দুর্ব্বলতা বোধ হইতে লাগিল। গুটি গুটি সমস্ত মাটি মাড়াইয়া হাঁটিতে লাগিলাম। সেই সময় আবার খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কাজেই একটা দোকানে বসিলাম। প্রায় ২ ঘণ্টা পরে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমিলে, দোকান হইতে উঠিলাম। দোকানী আর একটা রাস্তা দেখাইয়া বলিল—"এই রাস্তায় কলিকাতা গেলে প্রায় ২ ক্রোশ হাঁটা কম পড়ে।" তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া পূর্ব্বপথ ছাড়িয়া সেই পথ ধরিলাম। কতক দূর একটা অপ্রসর পাকা রাস্তায় আসিয়া শেষে একটা কাঁচা রাস্তায় পড়িলাম। সে রাস্তাটা সেই নূতন প্রস্তুত হইয়াছে; তাহাতে বর্ষাকালে সর্ব্বদা বৃষ্টি পাইতেছে বলিয়া অত্যন্ত দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে এত কাদা যে, হাঁটু পর্য্যন্ত পুতিয়া যাইতে লাগিল; আবার এক এক স্থানে এত পিছল যে, প্রতি পদক্ষেপেই মাতালের ভঙ্গী ধারণ করিতে লাগিলাম, এবং মধ্যে মধ্যে দুর্গা-প্রতিমার মহিষাসুরের অবস্থার অনুকরণ করিতেও বাধ্য হইলাম। সেই পথে কতকদূর আসিতেই সন্ধ্যা হইল। তখনও টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ছিল; সুতরাং সন্ধ্যাকালেই প্রগাঢ় অন্ধকার হইয়া উঠিল। আবার রাস্তার দুই পার্শ্বে বহুদূরব্যাপী এমন বাঁশবন দেখা দিল যে, সেখানে আর পথ দেখিতে পাওয়া যায় না; কোথায় যাইতেছি, কিছুই বুঝিতে পারি না। মনে করিলাম—এ কি কলিকাতার পথ! না যমালয়ে যাবার রাস্তা!! কতকটা আসিয়া সেই বাঁশবনের মধ্যে একটা আলো দেখিতে পাইলাম এবং সেই বনের মধ্য দিয়া আলোর কাছে যাই-

বার একটা পথও দেখিলাম। ঐখানে লোকালয় আছে ভাবিয়া তখন সেই দিকে চলিলাম। গিয়া দেখিলাম, একখানি চণ্ডীমণ্ডপে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। মনে ভরসা হইল; চণ্ডীচণ্ডপে উঠিয়া বসিলাম। তখন একটি ১০।১২ বৎসরের বালক বাটীর ভিতর হইতে আসিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কে গা তুমি?"

আমি।—আমি ব্রাহ্মণ; কলিকাতায় যাইব; অজানা রাস্তায় এসে অন্ধকারে কিছু দেখ্‌তে পাই না; বড় বিপদে প'ড়েছি; আজ ভাই এইখানে থাক্‌ব।

এমন সময় ১৪।১৫ বৎসরের আর একটি বালক ও ৪।৫টি স্ত্রীলোক বাহিরে আসিয়া বলিল—"না না, এখানে থাকা হবে না।" আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম; কিন্তু "চোরা নাহি শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"; তাহারা কিছুতেই শুনিল না। শেষে একটা মাগী বলিল—"দেখ্‌ নোশে! ও যদি ভাল কথায় না ওঠে, মেরে তাড়্‌য়ে দে।" এই কথা বলিবা মাত্র সেই দুইটা ছোঁড়া আমার দুই হাতে ধরিয়া টানিয়া নীচে নামাইয়া দিল। সেই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকিল। সেইক্ষণে ক্ষণপ্রভার সেই ক্ষণ-প্রভায় পার্শ্বে আর একখানি চণ্ডীমণ্ডপ দেখিতে পাইলাম এবং তাহাতে গিয়াই বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটি বৌ আলো লইয়া আসিল, এবং আমাকে দেখিয়াই ঘোমটা টানিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনিতে পাইলাম, বৌটি গিয়া বলিতেছে—"দেখ গা ঠাক্‌রুণ! ওরা যাকে তাড়্‌য়ে দিলে, সে আমাদের সদরে এসে ব'সেচে।" ঠাক্‌রুণ বলিল—"ওমা বলিস্‌ কি গো! সদরে যে কাপড় শুকুচ্চে।" বৌ বলিল—"কাপড় খানা তুল্‌তেই ত গেছ্‌লাম; মিন্‌সেটাকে দেখে ফিরে এলাম।"

তখন শ্বাশুড়ী-বৌতে সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বাশুড়ী বলিল—"এখানে থাকৃতে পাবে না, ওঠ।"

আমি।—বাছা! আমি খেতে চাই না, শুতে চাই না, বিছানা

চাই না; যেমন ব'সে আছি, অম্‌নি ব'সে থাক্‌ব, তাতে তোমাদের আপত্তি কি?

শ্বা।—না না, তা হবে না। এখনও ভাল চাও ত ওঠ। পুরুষরা ঘরে এলে কেন মার খেয়ে ম'র্‌বে!

আমি।—বাছা! কোথায় যাব ব'লে দাও, কারো বাড়ী দেখ্‌য়ে দাও, সেইখানেই না হয় যাই।

শ্বা।—এখানে আর কারো বাড়ী নেই! আমরাই এই দু'ঘর বোষ্টম আছি। ওরা আমাদের দেয়েজি। আমাদের সঙ্গে ওদের ঝগড়া, মুখ দেখাদেখি নাই।

আমি।—বাছা! তোমরা বৈষ্ণব, আমি ব্রাহ্মণ। বড় বিপদে প'ড়েছি ব'লেই তোমাদের বাড়ী এসেছি। দয়া ক'রে রাত্রিটুকু থাকৃতে দাও, তাড়্‌ও না।

এত বলিলাম, তথাপি মাগী কিছুতেই আমাকে থাকিতে দিবে না। আমিও ভাবিলাম—এখান হইতে উঠিলে যখন আর উপায় নাই—আর থাকিবার স্থান নাই, তখন যতই বলুক, কিছুতেই উঠিব না। উহাদের সহিত যখন বিবাদ, তখন উহারা কেহ আসিবে না। মাগী মুখে যতই বলুক, আমার গায়ে হাত তুলিতে পারিবে না। পুরুষেরা আসিয়া মারিবে বলিতেছে; তা বিনয় করিয়া বলিলে তাহাদের কি দয়া হইবে না? যাহা হউক, তখন উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা হয় হইবে; এখন ত উঠিতেছি না।" এইরূপ স্থির করিয়া আমি আর কোনও কথাটি কহিলাম না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মাগী কতক্ষণ বকিয়া বকিয়া শেষে আর থাকিতে পারিল না; ক্রোধভরে আমার চাদরখানা ধরিয়া এমন টান দিল যে, তাহা খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। আমার চাদরখানা যদিও পুরাতন; তথাপি মাগীকে একটু অপ্রস্তুত ও নিরস্ত করিবার জন্য বলিলাম—"আহা ক'ল্লে কি! নূতন চাদরখানা ছিঁড়ে দিলে!"

মাগী তথাপি নিরস্ত হইল না; বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিল।

আমি।—বাছা! তোমার পায়ে ধরি, আমাকে তাড়্ও না।

এই বলিয়া পায়ে ধরিতে গেলাম। তখন মাগী তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া গজ্‌গজ্ করিতে করিতে সেই কাপড়খানা তুলিয়া ও এক কোণে একখানা ছেঁড়া মাদুর ছিল, সেইখানা লইয়া, বধূর সহিত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আমিও একটু নিষ্কণ্টক হইয়া বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে লণ্ঠন জ্বালিয়া, কথা কহিতে কহিতে দুই জন পুরুষ আসিল। তাহারা সেই সদরের পাশ দিয়া একবারে বাটীর মধ্যেই প্রবেশ করিল। আমি অন্ধকারে বসিয়াছিলাম, আমাকে দেখিতে পাইল না। তাহারা হাত পা ধুইয়া সুস্থির হলে, মাগী বলিল—"দেখ্ রাদু! একটা ছোঁড়া ওদের সদরে এসে ব'সেছিল। ওরা তাড়্য়ে দিতে আবার আমাদের সদরে এসে ব'সেছে। এত ব'ল্লাম, কিছুতেই উঠ্‌তে চায় না।" রাদুর কোনও কথা শুনিতে পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে দুইজন পুরুষ একটা প্রদীপ লইয়া সদরে আসিল। পরে জানিলাম, রাদুর ভাল নাম রাধানাথ, বয়স ৩০।৩২ বৎসর; সে সেই মাগীর পুত্র। অপর ব্যক্তি—বাবাজী—রাধানাথের গুরু; বয়স ৫০।৫২ বৎসর।

রাধানাথ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বাড়ী কোথা? আমি সংক্ষেপে সকল কথা বলিলাম, এবং শেষে একটু কাতরতা ও বিনয় প্রদর্শনও করিলাম। রাধানাথ আর দ্বিরুক্তি করিল না। তার এক হাতে প্রদীপ, অন্য হাতে একখানা কম্বল, ও এক বগলে একখানা বই এবং অন্য বগলে সেই মাদুরখানা ছিল। প্রদীপটা একটা কাঠের দেরকোর উপর রাখিয়া কম্বলখানা পাতিয়া বাবাজীকে বসিতে বলিল, এবং মাদুরখানা পাতিয়া নিজেও বসিল। আমি একটি ধারে খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া যেমন বসিয়াছিলাম, তেমনই বসিয়া রহিলাম।

তার পর রাধানাথ, বাবাজীর পদধূলি লইয়া, সেই বইখানি খুলিয়া,

বাবাজীর নিকট পাঠ লইতে লাগিল। বইখানির নাম "চৈতন্যচরিতামৃত,"—বটতলার ছাপা, সেইদিনমাত্র কেনা হইয়াছিল। রাধানাথ তাহার প্রথম শ্লোকটি এইরূপে আবৃত্তি করিল—

বন্দে গুরুনিশ্‌ভক্তা নিশ্‌মিশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাশ্চ তচ্ছক্তি কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং॥

বাবাজী আবৃত্তির দোষ সংশোধন না করিয়াই ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—

'বন্দে গুরু' কিনা হে গুরুদেব তোমাকে বন্দনা করি। 'নিশ্‌ভক্তা' কিনা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের যাঁরা ভক্ত, তাঁদিগে বন্দনা করি। 'নীশমীশাবতারকান্' কিনা চৈতন্যদেবের যে অবতারগণ, তাঁদিগে বন্দনা করি। 'তৎপ্রকাশাশ্চ তচ্ছক্তি কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং' কিনা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবকেও বন্দনা করি, যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপধামে শচীগর্ভে জন্ম ল'য়ে অসাধারণ শক্তিপ্রকাশ ক'রেছেন।

ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার হাসি আসিল, মনে মনে একবার হাসিলামও। তার পর দ্বিতীয় শ্লোকের আবৃত্তি—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ মহোদিতৌ।
গৌড়দয়ে পুষ্পবন্তো চিত্রৌ শন্দৌ তমোলুদৌ॥

বাবাজী বলিলেন—"মহোদিতৌ নয়, সহোদিতৌ পাঠ হবে।" কিন্তু রাধানাথ নিত্যানন্দৌ প্রভৃতি স্থলে যে নিত্যানন্দ প্রভৃতি পাঠ করিল, তাহার আর সংশোধন করিলেন না। শেষে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে বন্দনা করি। তাঁরা কিরূপ? 'সহোদিতৌ, কিনা সহোদরের স্বরূপ অর্থাৎ দ্বাপরে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব ছিলেন, কলিতে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ হ'য়েচেন। 'গৌড়দয়ে' কিনা গৌড়দেশে উদয় লাভ ক'রে তাকে ধন্য ক'রেচেন।

'পুষ্পবন্তো' কিনা তাঁদের গলদেশে বনফুলের মালা শোভা পাচ্চে। 'চিত্রৌ শন্দৌ' কিনা তাঁরা এমন সুপুরুষ ছিলেন যে, দেখ্‌লেই সন্দ (সন্দেহ) হ'ত যেন চিত্রপটে তূলী দিয়ে তাঁদের শ্রীঅঙ্গ নির্ম্মাণ করা হ'য়েচে। আর 'তমোনুদৌ' কিনা যাদের দেহে তমোগুণ আছে, তারা তাঁদের তত্ত্ব জান্‌তে পারে না।

আমি ইতঃপূর্ব্বে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম—এক শিষ্য, তার গুরু—কোনও বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রভু! চৈতন্যচরিতামৃতে ভাগবতের এই যে একটি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে—

'অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং॥' (১)

এর অর্থ কি?"

প্রভু বলিলেন—"ওর অর্থ শুন—শুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিৎকে ব'ল্‌চেন যে, হে মহারাজ! আপনি আজ আমাকে যে হরিকথা প্রশ্ন ক'চ্চেন, ইহা 'অহো ভাগ্য' কিনা আপনার পরম সৌভাগ্য। আর আমি যে, আপনার কাছে সেই হরিকথা বর্ণন ক'রব, ইহা 'মহো ভাগ্যং' কিনা আমারও পরম সৌভাগ্য। আর 'নন্দগোপ' কিনা নন্দ-গোপের, 'ব্রজৌ' কিনা ব্রজপুরীরও পরম সৌভাগ্য, কেননা 'পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং' কিনা পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ নন্দের পুত্র হয়ে সেই ব্রজপুরীতে 'যন্মিত্রং' কিনা জন্মগ্রহণ ক'রেছেন।"

এই বলিয়াই প্রভু ভাবে গদ্‌গদ হইলেন, শিষ্যেরও দু'নয়নে শতধারা

(১) শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ—(ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন) পরমানন্দবিগ্রহ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন (শ্রীকৃষ্ণ) যাঁহাদের মিত্র, সেই নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগের কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য!! [ব্রজ ওকস্ (বাসস্থান) যাহাদিগের তাহারা ব্রজৌকস্—ব্রজবাসী। ব্রজৌকসাং—ব্রজবাসীদিগের।]

বহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে শিষ্য নয়ন মার্জ্জনা করিয়া মনে মনে শ্লোকটির আলোচনা করিতে লাগিল এবং দেখিল যে, শ্লোকস্থ সকল পদগুলিরই অর্থ করা হইয়াছে, কেবল 'কসাং' পদটির অর্থ বাকি আছে। তখন বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভু! শ্লোকটির ত সকল পদেরই অর্থ ক'রেচেন; কিন্তু 'কসাং' পদের অর্থ ত কল্লেন না। ওটার অর্থ কি, কৃপা ক'রে ব'লতে হবে।"

প্রভু বলিলেন—"ওখানে 'কসাং' পদের কোনও অর্থ নাই, ওটা পাদপূরণে (১) ব'সেচে।"

উক্ত শ্লোকটিরও সেইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার মনে হইল যে, এই প্রভুই বুঝি সেই প্রভু। যাহা হউক, শ্লোকটি শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। মনে করিলাম, কি চমৎকার ভাব! কিন্তু বাবাজী যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে রাধানাথ প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে পারিল না ভাবিয়া বড় আক্ষেপ হইতে লাগিল। সুতরাং আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম—"শ্লোকটির ভাব বড় চমৎকার।"

বাবাজী।—এমন গ্রন্থ কি আর আছে ?

আমি।—আপনি যে ব্যাখ্যা ক'ল্লেন" তাতে বোধ হয়, উনি সে ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেন না।

---

(১) একটি শ্লোককে চারি ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে পাদ বা চরণ বলে। ছন্দোবিশেষে কোনও শ্লোকের প্রত্যেক পাদে ৮টি, কোনও শ্লোকের ১১টি, কোনও শ্লোকের ১২টি ইত্যাদি অক্ষর থাকে। প্রয়োজনমত পদ বসাইবার পর যদি কোনও পাদে একটি অক্ষর কম পড়ে, তাহা হইলে তু, হি, হ, স্ম, চ, বৈ—এই কয়টি অব্যয়ের মধ্যে যে কোনও একটি বসাইয়া সেই পাদ পূরণ করিয়া লইতে পারা যায়। তাহাকেই পাদপূরণ বলে। ঐ ছয়টি শব্দ ভিন্ন আর কোনও শব্দ দ্বারা পাদপূরণ হয় না; কিন্তু এখানে গোসাঁইজী "ব্রজৌকসাং" পদের অন্তর্গত 'কসাং' শব্দকেই পাদপূরণে বলিলেন !!

বাবাজী একটু চটিয়া বলিলেন—"কেন? এর চেয়ে আর কি ব্যাখ্যা হ'তে পারে?"

আমি।—আপনার ব্যাখ্যায় আমি দোষ দিচ্চি না; উনি ভাল বুঝ্‌তে পারেন নি ব'লে আমার বোধ হ'চ্চে।

বাবাজী।—তুমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পার?

আমি।—নিজে যেটুকু বুঝিছি, সেইটুকুই ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারি।

বাবাজী।—এ কি তোমার পড়া পুথি?

আমি।—আজ্ঞা না। আমি ও গ্রন্থের নামমাত্র শুনেছি, চক্ষে কখনও দেখিনি।

বাবাজী।—তবে কিরূপে অর্থ বুঝ্‌লে? কিরূপে ব্যাখ্যা ক'র্‌বে?

আমি আর উত্তর দিলাম না। কিন্তু রাধানাথ বলিল—"আপনি কই ব্যাখ্যা করুন দেখি!"

আমি বলিলাম—"শ্লোকটি তবে আর একবার পড়ুন।"

রাধানাথ শ্লোকটি পুনরাবৃত্তি করিলে, আমি একবার বিশুদ্ধরূপে আবৃত্তি করিলাম। যথা—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

পরে এইরূপ ব্যাখ্যা করিলাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ বন্দে' শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দকে প্রণাম করি। তাঁরা কিরূপ? 'পুষ্পবন্তৌ অমরকোষে আছে "একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকরনিশাকরৌ" সূর্য্য ও চন্দ্রকে এক কথায় পুষ্পবৎ বলে। তাঁহারা পুষ্পবৎ অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র। এই শ্লোকে অগ্রে চৈতন্যদেব, পরে নিত্যানন্দের উল্লেখ আছে; ওদিকে অভিধানেও পুষ্পবৎ শব্দের অর্থে অগ্রে সূর্য্য পরে চন্দ্রের উল্লেখ আছে;

অতএব ক্রমান্বয় অনুসারে চৈতন্যদেবকে সূর্য্য আর নিত্যানন্দকে চন্দ্র বলা হইল। কারণ, সূর্য্যই সকল তেজের আধার; চন্দ্রের নিজের তেজ নাই, সূর্য্যের তেজেই তিনি তেজস্বী হন; এতাবতা চৈতন্যদেবই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, এবং নিত্যানন্দ তাঁহার অংশ সঙ্কর্ষণ বুঝাইল। তাঁরা কিরূপ চন্দ্র-সূর্য্য? 'চিত্রৌ' অদ্ভুত। যেরূপ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই, তাকেই অদ্ভুত বলে; তাঁরা অদ্ভুত কিসে? 'সহোদিতৌ' এক সঙ্গে উদিত হ'য়েছেন ব'লে। চন্দ্র ও সূর্য্যকে এক সঙ্গে প্রকাশ পাইতে কখনও দেখা যায় নাই; কিন্তু তাঁরা এক সময়েই প্রকাশ পেয়েছিলেন! আর কিসে অদ্ভুত ও কোন্ গুণেই বা তাঁদিগে চন্দ্র-সূর্য্য বলা হ'ল? 'তমোনুদৌ' তমঃ শব্দের অর্থ অন্ধকার, অন্য অর্থ অজ্ঞান। চন্দ্র-সূর্য্য যেমন তমঃ অন্ধকার নষ্ট করেন, তাঁরাও সেইরূপ লোকের তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান দূর ক'রেছেন। চন্দ্র-সূর্য্য বাহিরের অন্ধকার নষ্ট ক'র্ত্তে পারেন; গুহাদির মধ্যে যে অন্ধকার থাকে তা নষ্ট ক'র্ত্তে পারেন না; কিন্তু তাঁরা মানবের হৃদয়গুহাস্থিত নিবিড় অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট ক'র্ত্তে পেরেছেন; তাই তাঁদিগে অদ্ভুত চন্দ্র-সূর্য্য বলা হ'য়েছে। অদ্ভুত ঘটনাকে উৎপাত বলে; উৎপাত হ'লে অমঙ্গল ঘটে; তাঁদের উদয়ে তবে কি জগতের অমঙ্গল ঘটেছিল? না; তাঁরা 'শন্দৌ' মঙ্গলদাতা; তাঁরা আবির্ভূত হ'য়ে জগতের অশেষবিধ মঙ্গল বিধান ক'রেছেন, চন্দ্র-সূর্য্য এক সঙ্গে উদিত হয়ে উৎপাতরূপে জগতের অমঙ্গল ঘটান, তাঁরা কিন্তু এক সঙ্গে উদিত হয়ে, জগতের মঙ্গল ঘটিয়েছেন, এজন্যও তাঁরা অদ্ভুত চন্দ্র-সূর্য্য ব'ল্‌তে হবে। চন্দ্র-সূর্য্য উদয়পর্ব্বতে উদিত হন, তাঁরা কোথায় উদিত হ'য়েছিলেন? 'গৌড়োদয়ে' গৌড়দেশরূপ উদয়-পর্ব্বতে।

ব্যাখ্যা শুনিয়া রাধানাথ সমধিক সন্তুষ্ট হইল। তখন "প্রথম শ্লোক-টিরও ব্যাখ্যা করুন" বলিয়া তাহাও পূর্ব্ববৎ আবৃত্তি করিল।

আমি।—'তৎপ্রকাশশ্চ' ওখানে 'শা'র পর কি অনুস্বার নাই?

রাধা।—হঁা আছে।

আমি।—তবে 'তৎপ্রকাশাংশ্চ' বলুন। রাধানাথ তাহাই বলিল।

আমি।—'তচ্ছক্তি'র পর অনুস্বার নাই ?

রাধা।—না, বিসর্গ আছে।

আমি।—কোন্ ইকার আছে ?

রাধা।—হ্রস্ব ইকার।

আমি।—যদি বিসর্গ থাকে, তবে দীর্ঘ ঈকার হবে। ছাপার ভুলে হ্রস্ব ইকার হয়েছে। 'তচ্ছক্তীঃ' প'ড়্তে হবে। উহার বিশুদ্ধ পাঠ এই—

বন্দে গুরূনীশভক্তা-নীশ-মীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥

এইরূপ আবৃত্তি করিয়া আমি এ শ্লোকটিরও বাখ্যা করিলাম। কিন্তু তখন চৈতন্যলীলায় অভিজ্ঞতা না থাকায় টীকানুযায়ী অর্থ করিতে পারিলাম না; নিজের তখন যেমন জ্ঞান, তদনুরূপই অর্থ করিলাম। অর্থাৎ 'ঈশভক্তান্' ইত্যাদির ব্যাখ্যায় চৈতন্যদেবের ভক্ত, চৈতন্যদেবের অবতার, চৈতন্যদেবের প্রকাশ ও চৈতন্যদেবের শক্তি বলিয়া টীকাকার যে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, আমি তাহা না জানায় বিষ্ণুর ভক্ত, বিষ্ণুর অবতার, বিষ্ণুর প্রকাশ ও বিষ্ণুর শক্তি বলিয়া নারদাদির উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে রাধানাথ ত সন্তুষ্ট হইলই; বাবাজীও কোনও আপত্তি করিলেন না।

তার পর রাধানাথ আমায় বলিল—"আপনি এইখানে আসুন না।"

আমি।—পায়ে কাদা, কাপড় ভিজে, ওখান যেতে পার্‌ব না। এইখানেই বেশ আছি।

রাধা।—আমি জল এনে দিচ্ছি, পা ধুন।

আমি।—তোলা জলের কর্ম্ম নয়, অনেক কাদা। তবে যদি পুকুর দেখ্‌য়ে দেন, তা হ'লে পা ধুয়ে আসি।

রাধানাথ তখনই উঠিয়া বাটীর ভিতর হইতে লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিল, এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া ঘাটে লইয়া গেল। আমি হাত পা ধুইয়া আসিলে একখানা "বাসি" করা কাপড় আনিয়া আমাকে পরিতে অনুরোধ করিল। আমি সেই কাপড়খানা পরিয়া ভিজা কাপড় শুকাইতে দিলাম।

এতটুকু আদর দেখিয়া বাবাজীর বুঝি আমার উপর ঈর্ষা হইল। যে সময় আমি কাপড় ছাড়িতে ও ভিজা কাপড় খাঁটাইয়া দিতে ব্যস্ত, সেই সময়েই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোন্ ব্যাকরণ প'ড়েছ ?"

আমি।—প্রথমে "সংক্ষিপ্তসার" প'ড়েছি, এখন "মুগ্ধবোধ" প'ড়্‌ছি।

বাবাজী।—কাব্য কিছু পড়া আছে ?

আমি।—ভট্টি, রঘু, কুমার, ভারবি, মাঘ, বেণীসংহার প'ড়েছি।

বাবাজী। কালিদাসের কোনও গ্রন্থ পড়া আছে ?

আমি।—ঐ যে ব'ল্লাম—রঘু, কুমার।

বাবাজী।—কালিদাস কার সভাপণ্ডিত ছিলেন ?

আমি।—বিক্রমাদিত্যের।

বাবাজী। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় কয়জন পণ্ডিত ছিলেন ?

আমি।—নয় জন। সেই জন্যই 'নবরত্ন' নাম।

বাবাজী।—কে কে বল দেখি ?

আমি।—"ধন্বন্তরি-ক্ষপণকা-মরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

বাবাজী।—ও শ্লোকে ত দশজনের নাম আছে।

আমি।—কি ক'রে ?

বাবাজী।—ধন্বন্তরি ১, ক্ষপণকা ২ (আমি বলিলাম, "ক্ষপণকা নয়, ক্ষপণক"। বাবাজী সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না), অমর সিংহ ৩ শঙ্কু ৪, বেতালভট্ট ৫, ঘটকর্প্পূর ৬ (আমি—ঘটকর্পর), কালিদাস ৭, বরাহ ৮, মিহির ৯, আর বররুচি ১০।

আমি।—বরাহ-মিহির দুই ব্যক্তির নাম নয়, এক ব্যক্তিরই নাম।

বাবাজী। কখনই নয়। দুই ব্যক্তির নাম।

আমি।—যদি দুই ব্যক্তির নাম হ'ত, তা হ'লে একবচনের বিভক্তি থাকৃত না; 'খ্যাতৌ বরাহমিহিরৌ' এইরূপ দ্বিবচনান্ত পাঠ থাকৃত। সুতরাং যখন উহা একবচনান্ত আছে এবং শেষ চরণে 'নব' সংখ্যার নির্দ্দেশ র'য়েচে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাচ্চে—বরাহ-মিহির দুইজন নহেন, একজন।

এই বলিয়া রাধানাথের অনুরোধে আমি বাবাজীর আসনের একাধারে বসিলাম, এবং সেই গ্রন্থের আরও তিনটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিলাম। তন্মধ্যে এই শ্লোকটি পাইলাম—

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি-হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট-মধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্লোকটিতে যে "হ্লাদিনী শক্তি" আছে, তাহা তখন নিজে ভাল বুঝিতাম না বলিয়া রাধানাথকে উহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে পারিলাম না; মোটামুটি একরূপ অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। এবং দৃষ্টান্তস্থলে বলিলাম—"যেমন ঐ বরাহ-মিহির এক ব্যক্তির নাম হইলেও, কেহ কেহ বুঝিবার ভ্রমে দুই ব্যক্তির নাম বলেন, সেইরূপ আমরা বুদ্ধির দোষে রাধা-কৃষ্ণ দুই ভাবি। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণ দুই নহেন, একই।"

এমন সময় রাধানাথের মাতা রাধানাথকে ডাকিল এবং বাবাজীকে লইয়া আহারের জন্য বাটীর মধ্যে যাইতে বলিল। রাধানাথ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার আহারের কি হবে?"

আমি।—কিছুই আহার ক'র্‌ব না।

রাধা।—তা হবে না। আহার ক'র্ত্তেই হবে। পাকের যোগাড় ক'রে দিই।

আমি।—আমি রাঁধ্‌তে জানি না। বিশেষ, আমার খেতে ইচ্ছা নাই। আমাকে ও অনুরোধটি ক'র্‌বেন না।

রাধানাথ বাবাজীকে লইয়া বাটীর মধ্যে গেল। রাধানাথের মাতা জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে রে রাদু?"

রাধা।—কে আর! একটি ব্রাহ্মণের ছেলে। ভারি বিদ্বান্। এই বয়সে খুব বিদ্যে শিখেছে। কি বলেন প্রভু?

প্রভু কিছুই বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে রাধানাথ একবাটী দুগ্ধ ও একখানা রেকাবে করিয়া খান-কতক বাতাসা লইয়া আসিল। রাধানাথের মাতাও একঘটী জল ও একখানা আসন লইয়া তাহার সঙ্গে আসিল এবং আসন পাতিয়া হস্তমার্জ্জনা করিয়া স্থান করিয়া দিল। রাধানাথ সেই স্থানে দুধের বাটী ও রেকাব রাখিয়া আমাকে জল খাইতে অনুরোধ করিল; আমিও রাধানাথের অনুরোধ রক্ষা করিলাম। সেই সময় তাহার মাতা আমাকে বলিল—"আপনি ত আমার বড্ড পাপ ক'রেছ! আপনি আমার পায়ে ধ'র্ত্তে এসেছিলে!!" এই বলিয়া গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি বলিলাম—"সাধ ক'রে কি বাছা পায়ে ধ'র্ত্তে গিয়েছিলাম! তুমি যে ক'র্ত্তে লাগ্‌লে!! যা হোক্, আমি সে জন্য তোমার কোনও অপরাধ নিইনি।"

রাধানাথ মাতাকে তিরস্কার করিয়া, পরে আমার জন্য বিছানা প্রস্তুত করিল, একটা মশারিও খাটাইয়া দিল। এবং তাহার পার্শ্বে বাবাজীর

জন্য বিছানা করিয়া আহার করিতে গেল। আমি সুখে শয়ন করিলাম। ভাবিলাম—চৈতন্য-চরিতামৃতের মাহাত্ম্যেই আজি এ ঘোর বিপদে উদ্ধার পাইলাম। হাতে পয়সা হইলে সর্ব্বাগ্রে একখানি চৈতন্যচরিতামৃত কিনিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। বাবাজী কখন আসিয়া শুইয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারি নাই। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে উঠিলাম। তখন আর কেহই উঠে নাই—এই একটা কারণ, আর দিবা-লোকে তাহাদিগকে মুখ দেখাইতে কেমন লজ্জা বোধ হইল—এই আর একটা কারণ, এই উভয় কারণে রাধানাথের সহিত সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা না করিয়াই কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ইতঃপূর্ব্বে যখন মাতুল মহাশয়ের টোলে পড়িতাম, তখন সংস্কৃত শ্লোকে ঋতুবর্ণনা করিয়া "পদ্যমুক্তাবলী" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলাম। মাতুল মহাশয় তাহা দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন, এবং আমার কলিকাতায় আসার পর তাঁহার শিষ্য-সেবক ও বন্ধুবান্ধব-গণের সাহায্যে সেখানি মুদ্রিত করাইয়া, আমার তৎকালীন অধ্যাপক ও সহাধ্যায়ীদিগকে বিতরণ করিবার জন্য কয়েক খণ্ড আমার নিকট পাঠাইয়া-ছিলেন। তাহারই একখণ্ড আমার পকেটে ছিল। আসিবার সময় সেই-খানি বিছানায় রাখিয়া আসিলাম। কোথা দিয়া কি করিয়া যে হাওড়ার পথে পড়িলাম, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সে সময় আমি যেন দিশাহারা হইয়া গিয়াছিলাম। যাহা হউক, গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতায় আসিয়া ত পৌঁছিলাম। কিন্তু যে আমায় সে বিপদে আশ্রয় দিল, তত যত্ন করিল, আসিবার সময় সেই রাধানাথকে সম্ভাষণ না করা আমার অকৃতজ্ঞের কার্য্য হইয়াছে ভাবিয়া মনে বড় কষ্ট হইল, বড়ই অনুতাপ হইতে লাগিল। সেই অবধি আজি পর্য্যন্ত সেই কথা প্রায়ই মনে হয়; মনে হইলেই অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। যদি সে পথ চিনি-তাম, সে গ্রামের নাম জানিতাম, তাহা হইলে এখনও যাইয়া রাধানাথের

সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ করিতাম। কিন্তু তাহার আর সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্র বলেন—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণ-মশেষাঘহরং বিদুঃ॥

(ভাগবত)

সঙ্কেতে অর্থাৎ অন্য কাহারও নামোচ্চারণস্থলে, পরিহাসচ্ছলে, স্তোভ অর্থাৎ গীতাদির পদপূরণচ্ছলে, অথবা অবজ্ঞাচ্ছলেও যদি শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে সকল পাপের শান্তি হয় জানিবে।

তাই মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে মমত্বাভিভূত-মনে একবারমাত্র নারায়ণ-নামে আপন পুত্রকে ডাকিয়াছিল বলিয়া, নারায়ণ স্বীয় দূত দ্বারা তাহাকে স্বভবনে লইয়া গিয়াছিলেন ও তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! আমি আমার আশ্রয়দাতা রাধানাথের ভবনে যাইবার জন্য, রাধানাথকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, কৃতজ্ঞচিত্তে, সে কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত, নিয়ত যে রাধানাথের ধ্যান করিতেছি, কাতরপ্রাণে অনুদিন যে রাধানাথের নাম উচ্চারণ করিতেছি, তথাপি রাধানাথ আমার প্রতি এখনও দয়া করিলেন না!! অজামিলের ন্যায় আমিও পবিত্র বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় সমল চরিত্রে তাহা কলঙ্কিত করিয়াছি, অজামিল অপেক্ষা আমি শতসহস্রগুণে পাপী, তা জানি; তথাপি পতিতপাবন রাধানাথের নামের গুণেও কি আমার সে পাপের খণ্ডন হইবে না?—রাধানাথের দর্শন পাইব না? এক্ষণে হরিভক্ত গ্রাহক-মহোদয়গণের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন স্বীয় সাধুত্বগণে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, আমার প্রতি দয়া করিয়া, সেই দয়ানিধান রাধানাথের নিকট আমার এই অনন্ত পাপের খণ্ডনের জন্য একবার সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করেন। সেরূপ করিলে, ভক্তাধীন ভগবান্ সেই ভক্তগণের প্রার্থনায়

অবশ্যই এ অধমকে চরণে শরণ দিয়া তাঁহার "অধমতারণ" নামের মহিমা প্রকাশ করিবেন।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতি-হ্লাদিনী শক্তি-রস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট-মধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্য-মাপ্তং
রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

(শ্রীরূপগোস্বামিকৃত কড়চা—
চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত পঞ্চম শ্লোক।)

শ্লোকার্থ।—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় অর্থাৎ আনন্দের বিকার যে হ্লাদিনী শক্তি, তাঁহার নাম রাধা। অতএব তাঁহারা (অনাদি কাল ব্যাপিয়া) একাত্মা অর্থাৎ একই। তথাপি পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বাপরযুগে এই ভূতলে (জীবকে আরাধনা-পদ্ধতি শিখাইবার জন্যই) দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে অর্থাৎ এই কলিযুগে সেই মূর্ত্তি আবার চৈতন্য নামে স্পষ্টতর একীভূত হইয়াছেন। (অনাদি কাল ব্যাপিয়া রাধাভাব কৃষ্ণে অন্তর্হিত থাকে। কিন্তু এখন রাধাভাবই প্রকটিত হইয়াছে; যেহেতু) সেই চৈতন্যদেব রাধার মহাভাব যে শুদ্ধা পরা ভক্তি ও রাধার অঙ্গকান্তি যে গৌরবর্ণ, তাহা বাহিরে ধারণ করিয়াছেন। ঈদৃশ সেই কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি প্রণাম করি।

উক্ত শ্লোকের অনুবাদে "শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের বিকার যে হ্লাদিনী শক্তি, তাঁহার নাম রাধা। অতএব তাঁহারা একই"—এই যে অংশটুকু আছে, তাহার বিবৃতি করা যাইতেছে।—

কৃষ্ণ শব্দে পরব্রহ্ম। তথাহি—"কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" কৃষ্ শব্দের অর্থ

সত্তা বা সৎ, ন শব্দের অর্থ আনন্দ, এবং উভয়ের যে সম্মিলন তাহাই চিৎ। অতএব কৃষ্ণ শব্দের অর্থ—সচ্চিদানন্দ, অর্থাৎ পরব্রহ্ম। সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিনটি পরব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ ঐ সৎ, চিৎ ও আনন্দও নির্ব্বিকার। কিন্তু যখন তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার ঐ ত্রিবিধ শুদ্ধ-স্বরূপ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন সুবর্ণের বিকারে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হয়; আকার-ভেদে তাহাদের হার-বলয়কুণ্ডলাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে; অথচ তাহারা আদিতেও সুবর্ণ, বর্ত্তমান অবস্থাতেও সুবর্ণ এবং ধ্বংসেও সেই সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেইরূপ ব্রহ্মের বিকারে এই স্থাবর জঙ্গম পদার্থের উৎপত্তি; আকারভেদে ইহাদের মনুষ্য-পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-লতাদি নাম হইয়াছে; এবং যাবতীয় পদার্থ আদিতেও সেই ব্রহ্ম, বর্ত্তমান অবস্থাতেও সেই ব্রহ্ম, এবং ধ্বংসেও সেই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তুই নাই; সেই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

ব্রহ্মের মধ্যে এক অসাধারণ অনন্ত মহাশক্তি নিহিত আছে। তাহাকেই ঐশী শক্তি বা চিচ্ছক্তি বলে। ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার ও নির্গুণ অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁহার সেই শক্তি প্রকাশ পায় না। পরে তিনি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সক্রিয় হইলে, তাঁহার স্বরূপের বিকারে বিভিন্নরূপে সেই মহাশক্তির প্রকাশ হইতে থাকে; এবং তখন সেই মহাশক্তির গুণে তাঁহারও সগুণ অবস্থা ঘটে।

ব্রহ্মের যে 'সৎ' স্বরূপ তাহার বিকারে যে শক্তির প্রকাশ, তাঁহাকে "সন্ধিনী" বলে; তাঁহার নামান্তর প্রকৃতি; এবং তদ্দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হয় ও তাহাতে ব্রহ্মের সত্তা অবস্থিত হয়; সেই সত্তাতেই জগতের সত্তা উপলব্ধ হইয়া থাকে। 'চিৎ' স্বরূপের বিকারকে "সংবিৎ" শক্তি বলে; তাঁহার নামান্তর মায়া; তদ্দ্বারা সৃষ্ট পদার্থে ন্যূনাধিক পরিমাণে চৈতন্যের

সঞ্চার হয়, ও দেহ-গেহাদিতে তাহাদের মমত্ব ভাব ঘটে; এবং সেই শক্তিপ্রভাবে ভগবত্তা জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার যে 'আনন্দ' স্বরূপ, তাহার বিকারকে "হ্লাদিনী" শক্তি বলে; তাঁহার নামান্তর রাধা; তদ্দ্বারা সৃষ্ট পদার্থ যথাসম্ভব আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে; এবং সেই শক্তিই ভগবান্‌কে ও ভক্তগণকে পরস্পর পরম আনন্দ আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

এই কথা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিশদরূপে বিবৃত আছে। যথা—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাস-রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁঞি॥
ইথি লাগি আগে কহি তার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ, যারে জ্ঞান করি মানি॥

* * * * *

সন্ধিনীর সার অংশ, শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥

মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ-সত্ত্বের বিকার॥

* * * * *

কৃষ্ণ-ভগবত্তা-জ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম, তার সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥

* * * * *

কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়-কায়।
কৃষ্ণ নিজ-শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥
কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার স্বভাব যৈছে শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করেন অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে গণের বিস্তার॥
বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ-বিভূতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর অংশ বিলাসাংশ রূপ।
মহিষীগণ বৈভব-বিলাস-স্বরূপ॥

আকার-স্বরূপভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়াব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥
বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রসভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা, গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥

* * * * *

রাধা পূর্ণা শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরিমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈলা অবতার।
এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ-পরচার ॥

এতাবতা বুঝা গেল যে, শ্রীরাধা পূর্ণশক্তি, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। যেমন মৃগমদ ও তাহার গন্ধে নিত্য সম্বন্ধ, যেমন অগ্নি ও অগ্নিশিখায় নিত্য সম্বন্ধ, যেমন সূর্য্য ও কিরণে নিত্য সম্বন্ধ, যেমন বাক্য ও অর্থে নিত্য সম্বন্ধ, সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানে নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং রাধাকৃষ্ণও নিত্য-সম্বন্ধে সম্বন্ধ।

"একটি বাক্য বল" বলিলে যেমন অর্থ পরিত্যাগ করিয়া বাক্য বলা

যায় না, আবার "একটি অর্থ বল" বলিলে যেমন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া অর্থ বলা যায় না, সেই রূপ রাধা-ছাড়া কৃষ্ণ থাকিতে পারেন না, এবং কৃষ্ণ-ছাড়া রাধারও থাকা অসম্ভব। রাধা বলিলে, তাহাতে কৃষ্ণও বলা হইবে এবং কৃষ্ণ বলিলে, তাহাতে রাধাও বলা হইবে। রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন রাধাকৃষ্ণ একই।

যেমন বরাহ-মিহির এক ব্যক্তিরই নাম, যেমন স্বরূপ-দামোদর এক ব্যক্তিরই নাম, তেমনই রাধাকৃষ্ণ একই বস্তুর নাম। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ একই।

সংকীর্ত্তন।

মন আমার, করিস কি বিচার,
কালী কালা আর ভিন্ন, কভু ব'লো না।
ব্রহ্ম একমেব, অদ্বিতীয় ভেবো, অভেদ জ্ঞানেতে সেবো,
প্রভেদ তুলো না॥ (ও মন)
(ও মন) যে তাঁরে যেমন ভাবে, আপন মনেতে ভাবে,
সেই ভাবে সে দেখ্‌তে পাবে, পুরুষ কিংবা ললনা।
তিনি ব্রহ্মা, তিনি বাণী, তিনি বিষ্ণু বিষ্ণুরাণী,
তিনিই আবার শূলপাণি, তিনিই দনুজদলনা॥
ভুবন-ভিতরে নাই সে রূপের তুলনা। (ও মন)
(ও তাঁর) করে কভু মোহন বাঁশী, কভু ভয়ঙ্কর অসি,
মুখে মৃদু হাসি কভু জিহ্বা ললনা। (ও তাঁর)
গলে কভু বনমালা, কভু দোলে মুণ্ডমালা,
শিরে কভু চূড়া হেলা, কভু চুল এলোনা॥ (ও তাঁর)

(তিনি) কভু পীতবাস-পরা, কখনো বা দিগম্বরা,
ভালে তিলক-ধরা কভু, দীপ্ত-জ্বলনা। (তিনি)
কি জানি কি প্রয়োজনে, ভুলাইতে জগ'জনে,
রূপ-ভেদ-দরশনে, করেন ছলনা॥ (হেন)
বেদের এই লেখা, যে দীপ সেই শিখা,
(তেম্নি) যে শ্যাম সেই শ্যামা, যেন ভুলো না॥
(ওরে ও মন) (শ্যামাচরণ বলে)

বিশ্বাসই মূলাধার।

এক স্থানে রামায়ণের কথা হইতেছিল। অনেক লোক শুনিতে গিয়াছিল। সে দিন সেতুবন্ধনের কথা পড়িয়াছিল। কথক মহাশয় অতি সুন্দররূপে সে কথাটি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। কথা ভাঙ্গিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। সকলে বাড়ী চলিল। এক বৃদ্ধাও কথা শুনিতে গিয়াছিল। তাহার বাড়ী যাইবার পথে একটা খাল ছিল। খালটা তখন জোয়ারের জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পল্লীগ্রামে সন্ধ্যার পর বড় কেহ পার হয় না এবং বিশেষ প্রয়োজনও ছিল বলিয়া পাটনি নৌকা লইয়া তখন চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং পার হইবার উপায় নাই।

বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া শেষে ভাবিল যে, রামনামের গুণে ত সমুদ্রে পাষাণ ভাসিয়াছিল, ডুবিয়া যায় নাই; তবে আমি রামনাম করিয়া এই সামান্য খাল পার হইতে পারিব না? অবশ্যই পারিব; কখনই ডুবিব না। এই ভাবিয়া সে "জয় রাম! শ্রীরাম!" বলিতে বলিতে খালে নামিল এবং হাঁটিয়া অনায়াসে খাল পার হইয়া গেল। তাহার একটু কাপড়ও ভিজিল না।

সে পরপারে পৌছিলে, আর একটি লোক পূর্ব্বপারে উপস্থিত হইল।

এবং পারের নৌকা নাই দেখিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ বাছা! তুমি কি প্রকারে খাল পার হ'লে?"

বৃদ্ধা বলিল—"তুমি কোথা হ'তে আস্‌ছ?" সে কহিল—"আমি কথা শুন্‌তে গেছ্‌লাম।"

বৃদ্ধা বলিল—"তবে পারের জন্য ভাব্‌ছ কেন? কথায় ত রামনামের মাহাত্ম্য শুনে এলে? রাম ব'লে পার হ'য়ে এস না। আমিও রাম ব'লেই পার হ'য়ে এসেছি।"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া লোকটা রাম বলিতে বলিতে খালে নামিল এবং যত অধিক জলে যাইতে লাগিল, ততই কাপড়ও গুটাইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ যখন আরও অধিক জলে পড়িল, তখন ডাকিয়া বলিল—"মাগি! রামনামে পার হ'তে পাচ্চি কই? ক্রমশই যে ডুবন-জলে প'ড়্‌লাম।"

বৃদ্ধা বলিল—"বাপু! আমি দেখ্‌ছি, তুমি রামও ব'ল্‌ছ, কাপড়ও তুল্‌ছ। রামনামে তোমার যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকৃত, তা হ'লে তুমি কখনই কাপড় তুল্‌তে না। আমি কেবল রামই ব'লেছি, কাপড় তুলিনি তাইতেই পার হয়ে এসেছি; আমার কাপড়ও ভেজোন। ভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'ত্তে পাল্লে, এ সামান্য খাল কি, দুস্তর ভবসাগরও অনায়াসে পার হ'তে পারা যায়। আর ওরূপ আধা বিশ্বাস ক'ল্লে গোষ্পদেও ডুবে ম'ত্তে হয়।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল। লোকটা অতল জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

বৃদ্ধার এই উপদেশ গ্রহণ করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমাদের যদি এই ভবসাগর পার হইবার অভিলাষ থাকে, তবে এস, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত হরি হরি বলিতে থাকি। হরিনামের গুণে আমরা অনায়াসেই পার হইতে পারিব। তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলে,

তিনিই আমাদিগকে পার করিয়া দিবেন। আমাদিগকে নিজস্ব ভাবিয়া তিনি অবশ্যই রক্ষা করিবেন—এ অতল জল হইতে উদ্ধার করিয়া লইবেন। কিন্তু আমরা যদি হরিও বলি, আর কাপড়ও তুলি—অর্থাৎ মুখে হরি বলিয়া প্রত্যেক কাজে আপন আপন পুরুষত্ব প্রকাশ করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই। অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিলে, দীনবন্ধুর নিকট নিজের দীনতা না দেখাইলে, তাঁহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিতে না পারিলে, তিনি আমাদিগের দিকে চাহিবেন কেন? প্রহ্লাদ অটল বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান্ তাঁহাকে পদে পদে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনলে, হস্তিপদতলে, অস্ত্রাঘাতে, গিরিপাতে, সর্পদংশনে বিষান্নভোজনে, শম্বরের মায়ায়, সাগরজলে, পর্ব্বতচাপে—কিছুতেই আত্মরক্ষার চেষ্টা পান নাই, কেবল সর্ব্বভয়হারী হরিতেই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়াছিলেন, তাই ভগবান্‌ও তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে সমর্থ হন নাই, তাঁহাকে উদ্ধার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

হায়! সে বিশ্বাস আমরা কোথায় পাইব? হে বিশ্বনাথ! আমরা বিষয়-বিষে বিমুগ্ধ, বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন, এ বিশাল বিষম-ভবার্ণবে পড়িয়া বিপন্ন; তুমি বিশেষ দয়া প্রকাশে সেইরূপ বিশ্বাস বিতরণ করিয়া এ অকৃতি অধম সন্তানদিগকে উদ্ধার কর।

আত্মা।

(শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ী ভগবদ্গীতার অনুবাদ)

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, মহাত্মা অর্জ্জুন যখন চতুর্দ্দিকে আত্মীয়স্বজনকে সন্দর্শন করিয়া, তাহাদের বধ সাধন করিতে হইবে বলিয়া বিষণ্ণ হইলেন, ভাবী শোক ভাবিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন, এবং যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথের উপর বসিয়া পড়িলেন, তখন অর্জ্জুন-সারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ;—

অর্জ্জুন ! এই সঙ্কট-সময়ে কিজন্য তোমার এরূপ অনার্য্যজনোচিত মোহ উপস্থিত হইল ? ইহা যে স্বর্গপথের কণ্টক ও ইহলোকে অকীর্ত্তিকর। পার্থ ! তুমি বিষণ্ণ হইও না, কাপুরুষতা-প্রকাশক হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর।

অর্জ্জুন বলিলেন —মধুসূদন ! আমি কিরূপে পূজনীয় পিতামহ ভীষ্মদেব ও গুরু দ্রোণাচার্য্যের অঙ্গে শরবর্ষণ করিব ? এই সকল মহানুভব গুরুগণকে বধ না করিয়া যদি ইহলোকে আমায় ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, তাহাও আমি শ্রেয়ঃ মনে করিব, কিন্তু ইঁহাদিগকে বধ করিলে, কেবল পরলোকে নয়, ইহলোকেও ইঁহাদের শোণিতসিক্ত বিষয় ভোগ করিয়া কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ; এই যুদ্ধে আমিই জয়লাভ করিব, কি উঁহারাই আমাকে জয় করিবেন, তাহারও স্থিরতা নাই। জয়ী হইলেও ত কোনও সুখ নাই দেখিতেছি ; যেহেতু যাহাদিগকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইব না, সেই পরমাত্মীয় জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণই আমার প্রতিপক্ষরূপে যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে ; কৃষ্ণ ! আমি

ভবিষ্যৎ শোকের আশঙ্কায় আকুল হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি; কর্ত্তব্যকর্ম্ম স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা আমার পক্ষে নিশ্চয় শ্রেয়স্কর, তাহা তুমি বলিয়া দাও; আমি তোমার শিষ্য হইয়া শরণাগত হইতেছি, আমাকে সদুপদেশ প্রদান কর। আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া যদিও আমি পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধিশালি সাম্রাজ্য লাভ করি অথবা ইন্দ্রত্ব-লাভেও অধিকারী হই, তথাপি আমার সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়-সংশোষক শোকা-নল কিরূপে নির্ব্বাণ হইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এরূপ বিষণ্ণ দেখিয়া উপহাস-সহকারে বলিতে লাগিলেন—সখে! তুমি বুদ্ধিমান্ লোকের ন্যায় অনেক কথা বলিলে, আবার যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্যও করিলে!! যাঁহারা বাস্তবিক বুদ্ধি-মান্, তাঁহারা জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিমিত্ত কোনরূপ অনুশোচনা করেন না। তুমি যাঁহাদের মৃত্যু অর্থাৎ অভাব ভাবিয়া দুঃখ করিতেছ, বাস্তবিক তাঁহাদের অভাব হইতে পারে না; যেহেতু তাঁহারা সকলেই (তাঁহাদের আত্মা) নিত্যপদার্থ। আমি, তুমি ও এই সকল নৃপতিগণ পূর্ব্বে ছিলাম না, তাহা নহে; এবং এই দেহের অবসানেও যে আমরা থাকিব না, তাহাও নহে। আমরা এই দেহধারণের পূর্ব্বেও ছিলাম, এবং ইহার বিনাশ হইলে, পরেও থাকিব। আত্মার এই দেহেতেই যেমন বাল্যাবস্থা, তৎপরে যৌবনাবস্থা ও তদনন্তর বার্দ্ধক্যাবস্থা উপস্থিত হয়, এবং ঐ সকল অবস্থায় কেবল দেহেরই পরিবর্ত্তন ঘটে, আত্মার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না, সেইরূপ মৃত্যুও একটা অবস্থান্তরমাত্র, মৃত্যুতেও কেবল দেহেরই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, আত্মার কোনও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। বাল্য ও যৌবনে যে ভীষ্ম ছিলেন, বার্দ্ধক্য অবস্থাতেও যেমন সেই ভীষ্মই আছেন, মৃত্যু অবস্থা ঘটিলেও সেইরূপ সেই ভীষ্মই থাকিবেন। বাল্য-যৌবনাদি অবস্থায় যেমন আত্মার বিনাশ হয় না, মৃত্যু অবস্থাতেও সেইরূপ

আত্মার বিনাশ ঘটে না। অতএব জ্ঞানিগণ কাহারও মৃত্যুতে শোকাভিভূত হন না।

যদি বল যে,—মানিলাম মৃত্যুতে দেহেরই বিনাশ হয়, আত্মার বিনাশ হয় না; কিন্তু বাল্যযৌবনাদিতে পরস্পরের দেহের সহিত ত বিরহ ঘটে না; মৃত্যুতে যে বিরহ উপস্থিত হইবে, তজ্জন্য দুঃখভোগ ত অনিবার্য্য। ইহা তোমার বুঝিবার ভ্রান্তি। কারণ সুখ দুঃখ আত্মাতে থাকে না; মন ও তৎপরিচালিত ইন্দ্রিয়গণের সহিত নানাপ্রকার বিষয়ের যে সম্বন্ধ, তাহাতেই নানাপ্রকার সুখ-দুঃখ ও শীতোষ্ণাদির অনুভব হয়। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা উৎপন্ন হয়,—যাহাদিগকে পণ্ডিতেরা মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করেন,—তাহাদেরই কোনটির নাম সুখ ও কোনটির নাম দুঃখ। সুতরাং সুখ দুঃখ মনেরই অবস্থা বা ধর্ম্মবিশেষমাত্র। উহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে—আত্মাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। তোমার নিজের নয় বলিয়া যেমন অন্যের সুখ দুঃখ তুমি আপনাতে গ্রাহ্য কর না, সেইরূপ মানসিক-ধর্ম্মস্বরূপ সুখ দুঃখকে তোমার আপনাতে অর্থাৎ আত্মাতে গ্রহণ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ, সুখ দুঃখ যখন উৎপন্ন পদার্থ, উৎপন্ন হইয়া যখন পুনর্ব্বার অভাবপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐ অনিত্য সুখ দুঃখের নিমিত্ত হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট না হইয়া, ঐ সমস্ত সহ্য করাই কর্ত্তব্য। যে মহাপুরুষ এই অনিত্য সুখ দুঃখে বিচলিত না হন, তিনিই মুক্তিলাভের উপযুক্ত পাত্র।

যদি স্থিরমনে সুখদুঃখের তত্ত্ব আলোচনা কর, তাহা হইলেও বুঝিতে পারিবে যে, সুখদুঃখে বিচলিত হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। সুখদুঃখ যখন উৎপত্তি ও বিনাশশীল, তখন উহাদের বাস্তবিক সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই, ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সূর্য্যকিরণে প্রতীয়মান জল যেমন মিথ্যা পদার্থ রাত্রিকালে পথিপতিত রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন মিথ্যাপদার্থ, সুখ-

দুঃখও সেইরূপ মিথ্যাপদার্থ। সূর্য্যকিরণে জলভ্রমে, রজ্জুতে সর্পভ্রমে ও বৃক্ষাদিতে ভূতভ্রমে বিচলিত হওয়া যেরূপ বুদ্ধিমানের অকর্ত্তব্য, সেইরূপ আত্মাতে সুখ-দুঃখভ্রমে বিচলিত হওয়াও কর্ত্তব্য নহে।

সুখদুঃখাদি সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও উহাকে মিথ্যা পদার্থ বলা হইল কেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছি শুন।—যে যে পদার্থ বিকার দ্বারা উৎপন্ন তৎসমুদয়েই মিথ্যা বলিয়া গণ্য; আর ঐ সকল পদার্থ যাহার বিকারে উৎপন্ন হয়, তাহাই সত্য পদার্থ। সেই সত্য পদার্থটিকে নানা-প্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য নানা নামে অভিহিত করা যায়, এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন নামের অনুসারে কেবল মুখের কথায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া কল্পনা করা যায় মাত্র।

অতএব তৎসমুদায়ই কাল্পনিক পদার্থ, বস্তুতঃ কিছুই নহে। মনে কর, সকলে ঘট বলিয়া একটা পদার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং উহা যে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, তাহাও সকলে জানে। তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখিলে, উহা কি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া বোধ হয়? কখনই নহে। মৃত্তিকারই একপ্রকার বিকার অর্থাৎ অবস্থা হইলে, তাহাকেই ঘট নামে ব্যবহার করা যায়। আর অন্যপ্রকার অবস্থা ঘটিলে তাহা ইষ্টক নামে অভিহিত হয়, আবার অবস্থান্তর ঘটিলে তাহাকে শরাব বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মৃত্তিকাও যে পদার্থ, আর ঐ ঘট, ইষ্টক ও শরাবও সেই পদার্থ মাত্র, পৃথক্ পদার্থ নহে। কিন্তু যদি ঘট, ইষ্টক, শরাব প্রভৃতি নামগুলি ব্যবহৃত না হইত, তাহা হইলে সাধারণ মৃত্তিকাপদার্থ মনে করিয়া যেরূপ "মৃত্তিকা" শব্দ ব্যবহার করা যায়, সেই-রূপ ঘটাদি পদার্থ মনে করিয়াও "মৃত্তিকা" শব্দেরই ব্যবহার করা হইত। কিন্তু তাহাতে ব্যবহারক্ষেত্রে বিষম গোলযোগ ঘটিয়া উঠিত। কারণ, যদি ঘট আনাইবার মানসেও "মৃত্তিকা আন" বলে, আর ইষ্টক আনাইবার মানসেও সেই "মৃত্তিকা আন" বলে, তাহা হইলে যে ব্যক্তিকে উহা

আনিতে বলা হয়, সে বিষম বিপদে পড়ে; কি আনিবে, কিছুই স্থির করিতে পারে না। যদিও ঘটাকার ও ইষ্টকাকার মৃত্তিকার আকৃতি বর্ণনা করিয়া পরে "এইরূপ মৃত্তিকা আন" এ কথা বলা যায়, তাহাতেও বহু সময় ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই জন্যই একই মৃত্তিকা-পদার্থকে ঘটাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া ঘটাদির স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা ব্যাবহারিক মাত্র, বাস্তবিক নহে। আবার, আরও একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, মৃত্তিকাও ঘটাদির ন্যায় একটা মুখের কথা মাত্র, উহাও মিথ্যাপদার্থ, উহারও বাস্তবিক সত্তা নাই। কারণ কতকগুলি পরমাণুর একপ্রকার সমাবেশকেই মৃত্তিকা বলে, অন্যান্যপ্রকার সমাবেশ হইলে, সেই পরমাণু-সমষ্টিকেই কাষ্ঠাদি বলিয়া থাকে। সুতরাং মৃত্তিকা ও কাষ্ঠাদি পদার্থগুলি পরমাণু-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, মৃৎকাষ্ঠাদিও বৈকারিক, সুতরাং মিথ্যাপদার্থ; পরমাণু-সমূহের বিকারেই উহারা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া পরমাণুই সত্য পদার্থ। আবার পরমাণু-সমূহও যখন উৎপন্ন পদার্থ, তখন তাহারাও সত্য নহে; যে বস্তু হইতে পরমাণু উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই সত্য পদার্থ। এইরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা করিতে করিতে জানিতে পারা যায় যে, সংসারে যতপ্রকার বৈকারিক পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই অসৎ অর্থাৎ তাহাদের বাস্তবিক সত্তা নাই; কেবল ব্যবহারের জন্যই তাহাদের সত্তা কল্পনা করা যায় মাত্র।

যদি বৈকারিক পদার্থমাত্রেরই সত্তা না থাকে, যদি ঘটপটাদি পরিদৃশ্যমান পদার্থমাত্রই বৈকারিক হয়, আর যদি বৈকারিক পদার্থ লইয়াই এই জগৎ হইয়া থাকে, তবে জগতে কি কোনও বস্তুরই প্রকৃত অস্তিত্ব নাই? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, জগৎ একেবারে অস্তিত্বশূন্য নহে; এই জগতে একটিমাত্র বস্তু আছে, তাহা বৈকারিক নহে, তাহা অবিকৃত, সুতরাং তাহাই সত্য। সেই বস্তুটির নাম "সত্তা"। সত্তার কোনরূপ উৎপত্তি-

বিনাশ ও হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না; সুতরাং উহাই সৎ বা সত্য পদার্থ। যাহার উৎপত্তি-বিনাশ ও হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয়, যাহার অস্তিত্ব কখনও থাকে আবার কখনও থাকে না, তাহাই অসৎ, অসত্য, বা অনিত্য পদার্থ; আর যাহার উৎপত্তি-বিনাশ ও হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয় না, যাহার অস্তিত্ব সর্ব্বদাই অনুভূত হয়, তাহাই সৎ, সত্য বা নিত্য পদার্থ। ঘটপটাদি দ্রব্যগুলি উৎপন্ন হয়, হ্রাস-বৃদ্ধি পায়, কখনও থাকে, আবার কখনও থাকে না; অতএব উহারা অসৎ পদার্থ; আর সত্তা পদার্থটির উৎপত্তি নাই, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, কখনই উহার অভাব অনুভূত হয় না, সুতরাং উহাই সৎ পদার্থ।

কথাটা আর একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি—লোকে যখন কোনও বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তখন তৎসম্বন্ধে দুইটি বিষয়ে তাহার দুইটি জ্ঞান জন্মে; একটি জ্ঞান সৎ-বস্তু বিষয়ে, আর একটি জ্ঞান অসৎ-বস্তু বিষয়ে। মনে কর, তুমি একটি ঘট দেখিলে; ঘটটি দেখিবামাত্রেই যেমন তোমার ঘট বলিয়া একটা পদার্থের জ্ঞান হইল, তেমনি তৎসঙ্গে তাহার অস্তিত্বেরও জ্ঞান জন্মিল। ঘটটি যেমন বুঝিলে, তেমনি ঘটটি যে আছে, তাহাও বুঝিতে পারিলে। এই দুইপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে ঘটবিষয়ক জ্ঞানটি অসৎ-বিষয়ক জ্ঞান, এবং অস্তিত্ববিষয়ক জ্ঞানটি সৎ-বিষয়ক জ্ঞান। কারণ, ঘটটি সর্ব্বদা থাকে না, ঘটটি যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তাহাকে দেখাও যায় না; অতএব ঘট অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা। কিন্তু ঘটের সঙ্গে যে একটা অস্তিত্বের জ্ঞান হয়, ঐ ঘটটা ভাঙ্গিয়া গেলেও, ঘটটাকে দেখিতে না পাইলেও, সে অস্তিত্ব জ্ঞানের বিলোপ হয় না—সে জ্ঞান তখনও থাকিয়া যায়! অর্থাৎ ঘট যে "ছিল" এ জ্ঞান ঘটের নাশেও বিদ্যমান থাকে, আবার দৃশ্যমান পটাদিতেও "আছে" বলিয়া তখন সে জ্ঞান অবস্থান করে। এইরূপ যখন যে কোনও পদার্থের জ্ঞান হয়, তখনই তাহার সঙ্গে একটা অস্তিত্ব জ্ঞানও হইয়া থাকে। অস্তিত্ব বাদ দিয়া কোনও পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না।

ঐ সকল বস্তু নানা হইলেও, তাহাদের অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্তা নানা নহে—সত্তা একই। একই সত্তা নানা বস্তুতে অনুভূত হইয়া থাকে। এই হেতু সত্তাটি সৎ, বা সত্য, বা নিত্য এবং অদ্বিতীয় পদার্থ। অতএব ঘটপটাদি বৈকারিক পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও, সত্তার যখন অস্তিত্ব রহিল, তখন সমস্ত জগৎ যে একেবারে অস্তিত্বশূন্য, তাহা নহে।

ঘটপটাদি যেমন মিথ্যা পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলে, তেমন তোমার, আমার ও এই সকল ভীষ্মদ্রোণাদি প্রাণীর দেহের উপাদান, ও দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি যাহা কিছু আছে তাহা এবং সেই মনের ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তিস্বরূপ সুখদুঃখাদি—সমস্তই মিথ্যা পদার্থ, উহাদের কোনওটিরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। এই দেহ যদিও অস্থি, মাংস, মজ্জা, মেদ প্রভৃতি সমষ্টিস্বরূপ, তথাপি ইহা বাস্তব পক্ষে অন্ন, ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি কতকগুলি ভুক্ত বস্তুর রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোকে যে সকল বস্তু আহার করে, সেই সকল বস্তুই নানা প্রক্রিয়ায় অস্থিমাংসাদি আকারে পরিণত হয়। অতএব দেহের সম্বন্ধে অন্নব্যঞ্জনাদি পদার্থই সত্য, অন্নব্যঞ্জনাদির বিকারে সমুৎপন্ন দেহ অসত্য। তবে ব্যবহারের সুবিধার জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি পদার্থের "দেহ" এই নাম রাখা হইয়াছে মাত্র। আবার সেই অন্নব্যঞ্জনাদির তত্ত্বান্বেষণ করিলেও বুঝা যাইবে যে, উহাদের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। যেহেতু কতকগুলি পার্থিব পরমাণু রূপান্তরিত হইয়া অন্নব্যঞ্জনাদি হইয়াছে; সুতরাং অন্নব্যঞ্জনাদিগুলি পার্থিব পরমাণুর সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবার পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরমাণুগণও উৎপন্ন পদার্থ বলিয়া উহাদেরও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই; উহারাও অসৎ পদার্থ। জগতের যাবতীয় পদার্থই যখন সেই অসৎ পরমাণু হইতে উৎপন্ন, তখন সকলই অসৎ। কেবল যে বস্তু হইতে পরমাণু সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বস্তুটিই সৎ।

সেই সৎ বা সত্তা পদার্থটিকেই আত্মা বলে। সৎ বা সত্তার কখনও

অসত্তা বা অভাব ঘটিতে পারে না, এবং অসতের ও প্রকৃত সত্তা নাই, ইহা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সৎ ও অসৎ এতদুভয়ের এইরূপ তত্ত্ব অবগত আছেন।

আকাশ দ্বারা যেমন ঘটপটাদি পদার্থ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, ঘটপটাদির বিনাশে যেমন আকাশের বিনাশ হয় না, সেইরূপ আত্মা দ্বারা দেহাদি পদার্থ পরিব্যাপ্ত আছে, দেহাদির বিনাশে আত্মার বিনাশ ঘটে না; এই জন্য আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। অবয়বের ক্ষয় ও বৃদ্ধি দ্বারাই প্রত্যেক বস্তুর বিনাশ ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, আত্মার কোনপ্রকার অবয়ব নাই, সুতরাং তাঁহার ক্ষয়বৃদ্ধিও নাই; অতএব তিনি অব্যয়। যে পদার্থ অব্যয়, তাহার বিনাশ কেহই করিতে পারে না।

এখন বুঝা গেল যে, আত্মা অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, এবং আত্মা অবিনাশী। আবার সেই আত্মা বাক্যমনের অগোচর বলিয়া, তাহা অপ্রমেয়। যে দেহের মধ্যে সেই আত্মা অবস্থান করিতেছেন, সেই দেহ মরীচিকার ন্যায় অন্তবান্, অর্থাৎ যতক্ষণ ভ্রম থাকে, ততক্ষণই যেমন মরীচিকা থাকে—ভ্রম ঘুচিয়া গেলে আর যেমন মরীচিকা থাকে না, সেইরূপ যত দিন অজ্ঞান থাকে, ততদিনই দেহ বলিয়া একটা পদার্থ দেখা যায়, অজ্ঞান দূর হইলে আর দেহ দৃষ্ট হয় না; কেবল আত্মারই দর্শন হইয়া থাকে। অতএব এই অনিত্য সান্ত দেহের জন্য অকারণ শোকে অভিভূত না হইয়া তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। * * * ঘটপটাদি পদার্থ যেমন উৎপন্ন হয়, আত্মা সেরূপ উৎপন্ন হন না; অর্থাৎ ঘটপটাদির ন্যায় পূর্ব্বে না থাকিয়া পরে অস্তিত্ব গ্রহণ করেন না। আত্মা মরেন না অর্থাৎ ঘটপটাদির ন্যায় একবার অস্তিত্ব গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার অস্তিত্ববিহীন হন না। এই জন্যই আত্মাকে অজ ও ও নিত্য বলা হয়। ঘটপটাদির ন্যায় আত্মার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, এইজন্য তিনি শাশ্বত। ঘটপটাদির উপাদান মৃত্তিকাদি, মৃত্তিকাদির উপাদান পরমাণু, পরমাণুর কারণ সেই আত্মা। আত্মার কোনও কারণ নাই—আত্মা কাহা

হইতেও উৎপন্ন হন না, এ জন্য তিনি পুরাণ। অতএব শরীরের বিনাশ হইলে আত্মার বিনাশ হইতে পারে না।

* * মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বসন পরিধান করে, আত্মাও সেইপ্রকার জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ বর্ত্তমান-দেহ-নাশে আত্মা লিঙ্গ-দেহ (অতিসূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহ) ধারণ করিয়া কিছুকাল স্বর্গনরকাদি ভোগ করেন, তৎপরে ব্রাহ্মণ রাজা প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট দেহ অথবা চণ্ডাল পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট দেহ ধারণ করেন। দেহাদিতে তাঁহার অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত যে অহংবুদ্ধি ঘটে, দেহাদিকৃত কার্য্যে তাঁহার যে কর্ত্তৃত্বাভিমান উপস্থিত হয়, তাহার ফলেই তিনি উক্ত লিঙ্গদেহাদি ধারণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু পুরাতন দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নববস্ত্র পরিধান করিলে মনুষ্যের যেমন অস্তিত্ব নষ্ট হয় না, সেইরূপ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ ধারণ করায় আত্মার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না।

আত্মা অবিনাশী ও অবিকারী বলিয়া শাস্ত্রে ছিন্ন হন না, অনলে দগ্ধ হন না, জলে দ্রব হন না এবং বায়ুতে শুষ্ক হন না; অতএব ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। সুতরাং আত্মা নিত্য বলিয়া সর্ব্বব্যাপী; সর্ব্ব-ব্যাপী বলিয়া স্থিতিশীল; স্থিতিশীল বলিয়া অচল; এবং তজ্জন্যই তিনি সনাতন।

আত্মাকে কেহ যে এ প্রকার অনুমান করিতে পারে না, তাহার কারণ এই—আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর; যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহার অনুমান হইতে পারে না। মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ গুলিও ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও তাহাদের কার্য্য দেখিয়া অনুমান করা চলে; কিন্তু আত্মা নিষ্ক্রিয়—আত্মার কোনও কার্য্য নাই, সুতরাং কার্য্য দ্বারাও তাঁহার অনুমান করা অসম্ভব।

আত্মার এতাদৃশ তত্ত্ব অবগত হইয়া কাহারও জন্য শোক করা তোমার

উচিত নহে; এবং ভীষ্মাদিকে আমি নিহত করিব, এইরূপ বিবেচনা করাও যুক্তিসঙ্গত নহে।

আর এক কথা—যদি তুমি আত্মার এ তত্ত্ব ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া দেহের সহিত ইহার উৎপত্তি ও দেহের সহিত বিনাশ হয়, এরূপই স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমার শোক করিবার কারণ দেখিতেছি না। কেননা, এ জগতে যখন জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এবং মৃত্যু হইলে জন্মও অবশ্যম্ভাবি, তখন তাদৃশ অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করা উচিত হয় না।

আর যদি আত্মার ভৌতিক দেহের বিয়োগ মনে করিয়া কাতর হও, তাহাতেও আমার বক্তব্য এই যে, ভৌতিক পদার্থ মাত্রেই বিকারী—ভূত-গণের বিকারে উৎপন্ন, সুতরাং অনিত্য। এই পুত্রকলত্রাদি যে কোনও ব্যক্তির দেহ দর্শন করিতেছ, তাহাদের এ সকল দেহ পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না; কেবল বর্ত্তমান সময়েই কিছুদিনের জন্য ইহাদের প্রকাশ থাকে মাত্র। তবে এরূপ অস্থায়ী পদার্থের নিমিত্ত আবার শোক কি?

হায়! সংসারী ব্যক্তিগণ এরূপ মায়ামুগ্ধ যে, আত্মার এই তত্ত্ব তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। কেহ ইহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু মনে করিয়া দর্শন করে, কেহ বা ইহাকে সেইরূপই বর্ণনা করে, কেহ বা সেইরূপ শ্রবণ করিয়া থাকে; আর কেহ বা দেখিয়া, বলিয়া ও শুনিয়াও ইহাকে বুঝিতে সমর্থ হয় না।

ফল কথা—কাহারও দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মার বিনাশ হয় না; আত্মাকে কেহ বধ করিতে পারে না। অতএব হে ভারত! কাহারও মৃত্যুতে শোক করা কোনও মতেই উচিত নয়।

শ্লোক।

যদচ্যুত-কথালাপ-রস-পীযূষ-বর্জ্জিতম্ ।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্ ।

লোকে বলে বিপদের দিনকে দুর্দ্দিন ;
অভিধান বলে—তা না, মেঘাচ্ছন্ন দিন।
ফলতঃ, যে দিন হরিকথা-আলাপনে
সুধারস-সুসঞ্চার না হয় বদনে,
সেই ত দুর্দ্দিন, ইহা আমি মনে করি ;
অতএব প্রতিদিন বল হরি হরি ॥

প্রার্থনা।

ক্ষীর সার-মপহৃত্য শঙ্কয়া
স্বীকৃতং যদি পলায়নং ত্বয়া।
মানসে মম নিতান্ত-তামসে
নন্দনন্দন চিরং নিলীয়তাম্

শুন হে হরি, ননী চুরি করি,
পেয়ে থাক যদি ভয় ;—
পাছে যশোমতি হয়ে ক্রুদ্ধ অতি,
প্রহারেন নিরদয়।

তাই লুকাইতে আশা করি চিতে,
করিতেছ পলায়ন ;
এস মোর কাছে, ভাল স্থান আছে,
করাইব দরশন ।
হৃদয় কন্দর মম নিরন্তর
অজ্ঞান-আঁধারে ভরা ;
ধর মোর কথা, লুকাও হে তথা,
কভু না পড়িবে ধরা।

সংকীর্ত্তন ।

ও কি শোভা মরি, হেরি নিকুঞ্জে কুঞ্জবিহারী।
দোলে দোলে হে, লয়ে ঐ বামে রাধা কিশোরী ॥
বসন্তের আগমন, মলয়-সমীরণ, অনুক্ষণ—
প্রবাহিত মৃদু হিল্লোলে ; ডাকে পিকগণ কুহু কুহু রব করি ॥
গগনে পূর্ণিমা-শশী, পূর্ণ রূপে পরকাশি,
ঢালিতেছে সুধারাশি, মিশি তারাগণ সনে ।
চৌদিকে কুসুমরাশি, ফুটিতেছে হাসি হাসি,
সুখে পান করে আসি—মধু মধুকর-গণে ॥
(কিবা) হরি সনে খেলে হোরি যত গোপীগণ ।
(কিবা) দিতেছে আবির শ্যামের অঙ্গে,
নাচিছে গাইছে কতই রঙ্গে, (মাতিয়ে হে গোপীগণ)
সুখ-সাগর-তরঙ্গে হ'তেছে হে মগন ॥ (যত গোপীগণ)
এই বাসনা করি মনে হরি। (আমি)
মম হৃদয়-মঞ্চোপরি, (তোমায়) দোলাব হে এম্নি করি ॥

সহস্রারে লাগ্‌য়ে কড়া, তাহাতে তিন গাছা দড়া,
সুষুম্ণা পিঙ্গলা ইড়া, খাঁটায়েছি শক্ত করি ॥
বেঁধেছি তায় সাবধানে, ক্রমে ছটি পদ্মাসনে,
অনাহত অধিষ্ঠানে, (ব'সে) দুলিবে হে বংশীধারি ॥
প্রেমে ভক্তি-আবির গুলে, তোমার চরণতলে, ছিটাব হে ;
কিবা লালে লাল হইবে বলিহারি ॥ (ওহে) (মরি) (আহা)

কম্বল্‌ হাম্‌কো ছোড়্‌তা নহি।

কোনও নদীর তীরে দুই জন সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেন। তন্মধ্যে প্রথম সন্ন্যাসী সিদ্ধ ও দ্বিতীয় অসিদ্ধ ছিলেন। বর্ষাকাল, নদী জলে পরিপূর্ণ, বেগও অত্যন্ত প্রখর। স্থানান্তরে তীরস্থিত জম্বুবৃক্ষে একটা ভল্লুক ফলভক্ষণার্থে আরোহণ করিয়া স্খলিতপদ হইয়া জলে পতিত হইয়াছিল, এবং অবশভাবে সন্ন্যাসীদিগের নিকট দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। দ্বিতীয় সন্ন্যাসী কম্বলভ্রমে শীতত্রাণের উপায় ভাবিয়া লোভের বশে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তীর হইতে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক তদুপরি পতিত হইল। ভল্লুক তাদৃশ অসহায় অবস্থায় একটা অবলম্বন পাইয়া সন্ন্যাসীকে সাপটিয়া ধরিল। তখন উভয়েই ভাসিতে ভাসিতে বহুদূরে গিয়া পড়িল এবং শেষে ভল্লুকের ভারে আক্রান্ত হওয়ায় সন্ন্যাসীর জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল। তাহা দেখিয়া প্রথম সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"এ ভেইয়া! কম্বল্‌ ছোড়্‌ দেও, কম্বল্‌ ছোড়্‌ দেও।" দ্বিতীয় সন্ন্যাসী কহিল —"হাম্‌ তো ছোড়্‌নে চাহিয়ে, কম্বল হাম্‌কো ছোড়্‌তা নহি।"

জীবেরও ঠিক সেই দশা ঘটিয়াছে। এই সংসারই বৈতরণী নদী। ইহার তীরে পরমাত্মা ও জীবাত্মা দুই সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তন্মধ্যে

পরমাত্মা সিদ্ধ অর্থাৎ মায়াতীত, এবং জীবাত্মা অসিদ্ধ অর্থাৎ মায়াবদ্ধ। এক সময়ে জীবাত্মা স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনাদির সমষ্টিরূপ ভল্লূককে এই ভবনদীতে ভাসমান দেখিয়া সুখলাভের উপায় ভাবিয়া মোহবশে গ্রহণ করিবার জন্য তদুপরি পতিত হইলেন। তাহারাও তখন নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় পাইয়া তাঁহাকে বেশ সাপটিয়া ধরিল। তিনি তাহাদের সহিত ভাসিতে ভাসিতে দূরে গিয়া পড়িলেন, শেষে তাহাদের প্রতিপালনভারে আক্রান্ত হইয়া ভবনদীর অতল জলে মগ্ন হইতে চলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া পরমাত্মা বিবেক-বচনে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"ও কম্বল ছাড়িয়া দাও—স্ত্রীপুত্রাদির মমতা পরিত্যাগ কর; নচেৎ তলাইয়া যাইবে, আর উঠিতে পারিবে না।" তাহা শুনিয়া জীবাত্মা বলিলেন—"আমি ত ছাড়িতে চাহিতেছি, কিন্তু ইহারা আমাকে ছাড়ে কই!!—ইহাদের ভরণপোষণের ভারবহনে আক্রান্ত হইয়া ইহাদের রোগে শোকে অভিভূত হইয়া, এখন ইহাদিগকে ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছি; কিন্তু ইহারা কিছুতেই আমাকে ছাড়িতেছে না। স্ত্রী বলে তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছ, আমাকে পালন করিবে স্বীকার করিয়া আমার পতি হইয়াছ, ভরণ করিবে বলিয়া ভর্ত্তা উপাধি গ্রহণ করিয়াছ, এখন আমাকে পরিত্যাগ করিলে আমি কোথায় যাইব? কে আমার ভরণ পোষণ করিবে? তুমি কষ্টই পাও, মর আর বাঁচ; যত দিন বাঁচিবে, আমাকে পালন করিতে হইবে; মোট বহিয়া হউক, চুরি করিয়া হউক, ডাকাতি করিয়াই হউক, আমার গ্রাসাচ্ছাদন জোগাইতেই হইবে। পুত্র কন্যারা বলে—আমাদিগকে জন্ম দিয়া আমাদের পিতা হইয়াছ, এখন পারি না বলিলে ছাড়িব কেন? যেরূপে পার আমাদের ভরণপোষণ করিতেই চাও; তাহা করিতে তুমি বাধ্য। আত্মীয় স্বজনেরাও বলে—আমরা অকৃতী, অক্ষম; তোমার গলগ্রহ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি; চিরকাল আমাদের পুষিয়া আসিয়াছ, তোমার উপর আমাদের দাবি দাঁড়াইয়াছে; এখন তুমি আমা-

দিগকে কোনও মতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এই ত অবস্থা; এখন কি উপায় করি! কিরূপে এ বিপদ্‌ হইতে মুক্ত হই?

বস্তুতই জীবের এখন মহাবিপদ্‌। কিরূপে সে উদ্ধার পাইবে? না বুঝিয়া—অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া,—যে কার্য্য করিয়া বসিয়াছে—যে বিপদে পড়িয়াছে, তাহা হইতে তাহার কি উদ্ধারের কোনও উপায় নাই? আছে—একটি উপায় আছে। যিনি নদীর পারে অবস্থান করিতেছেন, সেই পরমাত্মার শরণাগত হইতে পারিলে—বিনয়সহকারে তাঁহাকে আত্মদুঃখ জানাইতে পারিলে, এ বিপদে উদ্ধার পাইতে পারা যায়। অতএব জীব! তুমি কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরবচনে প্রহ্লাদের কথায় উঁহাকে বল—

এবং স্বকর্ম্ম-পতিতং ভব-বৈতরণ্যাম্‌
অন্যোন্য-জন্ম-মরণাশন-ভীতভীতম্‌।
পশ্যন্‌ জনং স্বপর-বিগ্রহ-বৈর-মৈত্রং
হন্তেতি পারচর পীপৃহি মূঢ়মদ্য॥

হে নাথ, আমি মূঢ়; স্বীয় কর্ম্মফলে এইরূপে এই ভব-বৈতরণীতে পতিত হইয়াছি; এখানে পড়িয়া পরস্পর পরস্পরের জন্ম-মৃত্যুর কারণ ও খাদ্য-খাদক হইয়া অতিশয় ভীত হইতেছি, এবং আপন পর ভাবিয়া পরস্পরের দেহের উপর মিত্রভাব ও শত্রুভাব সংস্থাপন করিতেছি। তুমি এ সমস্ত স্বীকার না করিয়া নিশ্চিন্তমনে এই নদীর পারে বিচরণ করিতেছ; অতএব হে পারচর! আমাকে তুমি এ ঘোর বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার কর।

এরূপ বলিলে, তিনিই তোমার উদ্ধারের উপায় করিবেন। তোমার হৃৎপদ্মে আপন পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া তোমার সকল সন্তাপ বিদূরিত করিবেন। সেই আনন্দময়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তুমি সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া পরমানন্দে বিভোর হইবে এবং তাঁহার শান্তিরসাস্পদ পদকমলে মানস-মধুপকে আসক্ত রাখিয়া পরম শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

সর্ব্বব্যাধির মহৌষধ

বিখ্যাতনামা কোনও কবিরাজ এমন এক মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সেবন করিলে, সাক্ষাৎ কালস্বরূপ প্লেগ, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি অসাধ্য ব্যাধিরও উপশম হয়; অন্য রোগের ত কথাই নাই। তদ্ভিন্ন, সেই মহৌষধ সেবন করিলে দেহ ও মন প্রফুল্ল থাকে; সকল ভয় বিদুরিত হয়; ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না; শীত-গ্রীষ্মে কষ্ট হয় না, এবং অকাল-মৃত্যুও ঘটে না; অধিক কি, তাহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গও লাভ করা যায়।

সে ঔষধ বড় আশ্চর্য্য,—তাহা আরক নয়, অথচ রসময়; তাহা গুঁড়া নয়, বড়িও নয়, অথচ খলেও মাড়িতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে ঔষধ মর্দ্দিত হয় না, খলই মর্দ্দিত হইয়া যায়—খলের পাষাণময় অভ্যন্তর কোমল হইয়া উঠে। তাহা উদ্ভিজ্জ নহে, অথচ "মূল"। সে মূল কোনও দেশেই জন্মে না, অথচ ব্রহ্মদেশে আছে। তাহার কোনও বর্ণ নাই, অথচ দুইটি বর্ণ দেখা যায়। তাহা স্বর্ণ-রৌপ্যাদি কোনও ধাতুঘটিত নহে, অথচ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আমাদের কথায় যাঁহাদের প্রত্যয় না হয়, তাঁহারা তাহাতেই প্রত্যয় দেখিতে পাইবেন।

সেই মহৌষধ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেবন করিতে পারে। সেবনে কোনও কষ্ট নাই; কোনও অনুপানের প্রয়োজন নাই; কোনও আয়োজনের আড়ম্বর নাই; কেবল মুখে ফেলিয়া রাখিতে হয়। অহোরাত্র মুখে ফেলিয়া রাখিলেও তাহার ক্ষয় হয় না; কেবল নানাপ্রকার রস নির্গত হইতে থাকে। তাহা খাইয়া মিছ্‌রি প্রভৃতি আর কিছুই খাইতে হয় না; তাহা স্বতই সুমধুর।

সে ঔষধ অমূল্য; অথচ তাহা বিনা মূল্যেই সকলে পাইতে পারেন। তাহার একখানি ব্যবস্থাপত্র আছে। ঐ ব্যবস্থা-পত্রের মূল্য ।৶৹ মাত্র।

পরিচয়—সেই ঔষধের নাম—"হরি" নাম। তাহা এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূল। তাহা অনাদিনিধন—সুতরাং তাহার জন্ম নাই। তাহা ব্রহ্মদেশে (সত্যলোকে) অবস্থান করে। তাহা খলেও (খল জনেও) মাড়িতে পারা যায়। এবং তাহাতে তাহার পাষাণবৎ কঠিন হৃদয়ও কোমল হইয়া উঠে। তাহাতে দুইটি বর্ণ (অক্ষর) আছে। তাহা হৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং তাহাতে 'ই' প্রত্যয় যুক্ত আছে। উহার আবিষ্কর্ত্তার নাম শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। এই ধরাতলে বাল্মীকি প্রথম কবি, তিনি দ্বিতীয় কবি; সেই জন্য তিনি কবিরাজ। ব্যবস্থাপত্রের নাম—"হরিভক্তি"।

গবু-বাবু-সংবাদ।

গবু আমাদের একজন কর্ম্মচারী। তিনি একদিন এক বাবুর কটাক্ষে পড়িয়াছিলেন। বাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার পরণে গৈরিক বসন, গায়ে নামাবলী, কণ্ঠে তুলসীমালা দেখিতেছি; তুমি কে?"

গবু।—আমি শ্রীগোবিন্দবল্লভ দাস।

বাবু।—কোথা হইতে আসিতেছ?

গবু।—হরিভক্তি-কার্য্যালয় হইতে।

বাবু।—তোমার হাতে কি?

গবু।—হরিভক্তি—মাসিক পত্রিকা।

বাবু।—উহাতে কি আছে?

গবু।—ইহাতে হরিকথা আছে, হরিনামের মাহাত্ম্য আছে, কৃষ্ণলীলা আছে।

বাবু।—কোম্পানির কাগজের দর আছে?

গবু।—আজ্ঞা, না।

বাবু।—তখন মুখ-নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"তবে উহা

কাগজের মধ্যেই গণ্য নহে। উহা পড়িলে কোনও উপকার নাই। ঐরূপ কাগজ কি ভদ্রলোকে পড়ে? না, পয়সা দিয়া কেনে?

গবুর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া আমাদের এক কবিতাটি মনে হইল—

কস্ত্বং লোহিত-লোচনাস্য-চরণো হংসঃ কুতো মানসাৎ,
কিং তত্রাস্তি সুবর্ণপঙ্কজবনং পীযূষতুল্যং পয়ঃ।
নানারত্ননিবদ্ধ-বেদিবলয়াস্তীরেষু ভূমীরুহাঃ,
শম্বুকাঃ কিমু সন্তি নেতি হি বকৈরাকর্ণ্য হীহীকৃতম্॥

কোনও পঙ্কিল জলাশয়ের তীরে কতকগুলি বক বসিয়াছিল। সেই স্থান দিয়া এক রাজহংস যাইতেছিল। একটা বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"তোমার চোক, মুখ ও পা রক্তবর্ণ দেখিতেছি, তুমি কে?"

হংস।—আমি হংস।

বক।—কোথা হইতে আসিতেছ?

হংস।—মানস সরোবর হইতে।

বক।—তাহাতে কি আছে?

হংস।—তাহাতে সোণার পদ্মবন আছে, অমৃততুল্য জল আছে, চারিধারে রত্নবেদীতে গোড়া বাঁধান বৃক্ষশ্রেণী আছে।

বক।—তাহাতে শামুক আছে?

হংস।—না।

ইহা শুনিয়া বকেরা হী হী করিয়া হাসিয়া উঠিল। (তাহাদের অভিপ্রায় এই যে, যাহাতে শামুক নাই, তাহা সরোবরের মধ্যেই গণ্য নহে, তাহা বাসের নিতান্ত অযোগ্য।)

সম্পূর্ণ।